হ্যারল্ড রবিনস

নেভার লাভ আ স্ট্রেঞ্জার

অনুবাদ

সাঈদ চৌধুরী

এতিমখানার নিষ্ঠুর কঠিন পরিবেশে জীবন কাটিয়ে লাথির বদলে লাথি মারতে শিখে গেল নাম-পরিচয়হীন কিশোর বালক ফ্র্যাঙ্ক কেইন। ওর বন্ধুরা যখন খেলে বেড়ায়, ও তখন কাজে ব্যস্ত রাখে নিজেকে। জুতো পালিশ থেকে শুরু করে জুয়ার দালালী, পতিতালয়ের চাকরি, কোন কিছুই বাদ দিল না। ধীরে ধীরে শিখল জীবনযুদ্ধে একলা পথ চলার নিয়ম। মাত্র তেরো বছর বয়েসেই পেয়ে গেল নারীসঙ্গ-সুখ। একের পর এক নারী এল তার জীবনে...

'নেভার লাভ আ স্ট্রেঞ্জার' বইতে বিখ্যাত লেখক হ্যারল্ড রবিনস তাঁর শক্তিশালী কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন অপক্ক রূঢ় আবেগে ভরা একজন মানুষের জীবনের অন্ধকার দিকগুলো...

এ বই অপ্রতিরোধ্য সেই ঘরহারা মানুষটির ভয়ঙ্কর পথ চলার রুদ্ধশ্বাস কাহিনী।

নেভার লাভ আ স্ট্রেঞ্জার

হ্যারল্ড রবিনস

অনুবাদ

সাঈদ চৌধুরী

তাম্রলিপি

নেভার লাভ আ স্ট্রেঞ্জার
হ্যারল্ড রবিনস
অনুবাদক : সাঈদ চৌধুরী

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮

তাম্রলিপি : ৩৯
SUVOM
প্রকাশক
এ,কে,এম তারিকুল ইসলাম
তাম্রলিপি
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
কলি কম্পিউটারর্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
ঢাকা প্রিন্টার্স
২৪ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা - ১১০০

মূল্য : ২২৫.০০ টাকা

NEVER LOVE A STRANGER
by: Harrold Robbins
Translation by: Shayed Chowdhury
First published: February 2008, by A.K.M. Tariqul Islam
Tamralipi, 38/2ka, Banglabazar, Dhaka-1100

Price Tk. 225.00

ISBN-984-70096-0039-5

পূর্বকথা

সুপের স্বাদ চেখে দেখলেন মিসেস কজোলিনা। টমেটো, রসুন সব ঠিকঠাকমত দেয়া হয়েছে। ঠোঁট চাটলেন তিনি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়ালেন টেবিলের দিকে যেখানে রেখেছেন ডিম মিশিয়ে মাখানো ময়দার ছোট ছোট লেচি ও ফালি করে কাটা মুরগীর মাংস। বাইরে আকাশটা অন্ধকার হয়ে গেছে, রান্নাঘরের আলো জ্বেলে দিতে বাধ্য হলেন তিনি।

'এখনকার মেয়েগুলো যেন কেমন!' ভাবছেন তিনি। লুচির মাঝখানে মাংস রেখে খাটো মোটা আঙুল দিয়ে টিপে ধারগুলো বন্ধ করে দিচ্ছেন। ঘামে ভিজে গেছে কপাল। ঠোঁটের ওপর হালকা গোঁফের রেখা, তার ওপরেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। 'প-্যান করে বাচ্চা নেয় ওরা যাতে গরম এলেই পেট থেকে খালাস করে দিতে পারে। কী কাণ্ড! সেই পুরানো আমলে,' নিজের অল্পবয়েসের কথা ভেবে আপনমনেই হাসলেন: 'আমরা স্রেফ নিয়ে ফেলতাম। অত ভাবাভাবি ছিল না।' এখনকার আমেরিকান মেয়েগুলোকে বোকা না ভেবে পারছেন না তিনি। মিসেস কজোলিনা একজন ধাত্রী। সারা গ্রীষ্মকাল ধরেই চলে তাঁর ব্যবসা। নিজেরও সাত-সাতটা ছেলেমেয়ে আছে, স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে ওদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাঁকেই।

কলিংবেল বাজল। মাথা উঁচু করে কান পাতলেন তিনি। মুরগীর মত ঘাড় বাঁকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন কোনখান থেকে এল শব্দটা। তাঁর মক্কেলদের কারোরই আগামী মাসের আগে আসার সম্ভাবনা নেই, ধরেই নিলেন সামনের দরজার ঘণ্টা বাজিয়েছে কোনও ফেরিওয়ালা। 'মারিয়া,' চিৎকার করে মেয়েকে ডাকলেন তিনি, তাঁর ডাক প্রতিধ্বনি তুলে বয়ে গেল আবছা আলোকিত হলওয়ের দেয়ালে: 'দেখো তো কে এল।' বছরের পর বছর ধরে ফেরিওয়ালা–যাদের কাছ থেকে বেশির ভাগ খাবার কেনেন তিনি তাদের সঙ্গে ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চিৎকার করতে করতে কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে গেছে তাঁর।

তাঁর ডাকের জবাব এল না। আবার বাজল দরজার ঘণ্টা। কর্কশ শব্দে বাজতে থাকল অনেকক্ষণ ধরে, যে বাজাচ্ছে তার অস্থিরতা প্রকাশ করে দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরনের অ্যাপ্রনে হাত মুছে লম্বা সরু করিডর ধরে এগিয়ে গেলেন সামনের দরজার দিকে। জানালার রঙিন কাঁচের ভিতর দিয়ে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল। দরজাটা খুলে দিলেন তিনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। সুটকেসটা ফেলে রেখেছে তার পায়ের কাছে সিঁড়ির ওপর। হালকা-পাতলা আকর্ষণীয় চেহারা মেয়েটার, এক ধরনের আভা বেরোচ্ছে চোখ থেকে, অনেকটা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা ভীত জানোয়ারের মত। মেয়েটা অন্তঃসত্ত্বা। শেষ মাস চলছে ওর, এক নজর দেখেই বুঝে ফেলল মিস কজোলিনার

অভিজ্ঞ চোখ। 'আপনি কি দাই?' মৃদুস্বরে ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, ম্যাডাম,' জবাব দিলেন মিসেস কজোলিনা। অভিজাত কাউকে দেখলে চিনতে পারেন। এদের মধ্যে এমন কিছু থাকে, মহাবিপাকে পড়ে গেলেও সেই আভিজাত্যটা যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে থাকে।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত কিন্তু আমি নিউ ইয়র্কে এসে...' মিনিটখানেক চুপ করে থাকল মেয়েটা, মনে হলো ভীষণ কাঁপুনি শুরু হয়েছে শরীরে। আবার যখন কথা বলল জরুরি ভাবটা প্রকাশ পেল কণ্ঠস্বরে। 'আমার সময় এসে গেছে,' বলল সে: 'আর যাওয়ার কোন জায়গা নেই আমার।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন মিসেস কজোলিনা। এই মেয়েটাকে জায়গা দিতে হলে মারিয়াকে ওর ঘর থেকে বের করে দিতে হবে, আর মারিয়া সেটা মানতে চাইবে না। বোনেদের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে না ও। মেয়েটার কাছে নিশ্চয় টাকাপয়সা কিছুই নেই; হয়তো বিয়েও হয়নি। তাঁর নজর চলে গেল মেয়েটার হাতের দিকে। আঙুলের ছোট সোনার আংটিটা চোখে পড়ল।

'আমার কাছে কিছু টাকা আছে,' মেয়েটা বলল, মিসেস কজোলিনার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছে।

'কিন্তু আমার তো ঘর নেই,' মিসেস কজোলিনা বললেন।

'ঘর আমার দরকার,' জোর দিয়ে বলল মেয়েটা। 'অন্য কোথাও যাবার সময় পাব না আমি। আপনার "মিডওয়াইফ" লেখা সাইনবোর্ডটা দেখেই তো এলাম।'

হাল ছেড়ে দিলেন মিসেস কজোলিনা। মারিয়াকে ওর বোনেদের সঙ্গেই ঘুমোতে হবে ও পছন্দ করুক বা না করুক। 'এসো,' বলে মেয়েটার ব্যাগটা তুলে নিলেন তিনি।

মিসেস কজোলিনাকে অনুসরণ করে মৃদু আলোকিত হলওয়ে ধরে এসে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে মারিয়ার রুমে ঢুকল মেয়েটা। ঘরের আলোয় দেখল একসারি তিনতলা বিছানা। একটা ছোট ছেলে মাথায় দড়ির ফাঁস পরানো লম্বা দণ্ড দিয়ে ঝাঁক থেকে বেছে বেছে কবুতর নামাচ্ছে।

'জ্যাকেট খোলো,' মেয়েটাকে বললেন কজোলিনা: 'আরাম করে শোও।' তারপর মেয়েটাকে কাপড় খুলতে সাহায্য করলেন। 'কতক্ষণ আগে ব্যথা আরম্ভ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'এক ঘণ্টা,' মেয়েটা বলল। 'আমি বুঝেছি আর এগোতে পারব না। থামতে বাধ্য হয়েছি।'

ওকে পরীক্ষা করলেন মিসেস কজোলিনা। অস্বস্তি বোধ করছে মেয়েটা। এভাবে বাচ্চা হোক চায়নি ও। চেয়েছিল হয়তো কোন হাসপাতালে ওর বাচ্চা হবে, পাশে থাকবে জর্জ, ওকে সাহস দেবে, কোন সমস্যা যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে; কিংবা হয়তো বাড়িতে বাচ্চা হবে, পাশে থাকবে আপনজনেরা যারা ওকে ভরসা দেবে। কিন্তু কী হয়ে গেল। ভয় লাগছে ওর।

সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিসেস কজোলিনা। মেয়েটা ছোটখাট, দেহের গঠনই

এরকম; তাতে প্রচুর ভুগতে হবে ওকে। বাচ্চা বেরোনোর পথটা এত সরু, সহজে বেরোতে চাইবে না। অবশ্য এখনও ছয়-সাত ঘণ্টা বাকি আছে, ততক্ষণে হয়তো আরেকটু প্রশস্থ হতে পারে পথ। একটা মেয়ে দ্রুত কীভাবে মহিলায় রূপান্তরিত হয়, কীভাবে বিস্ময়করভাবে বেরিয়ে আসে বাচ্চাটা, বহু দেখেছেন তিনি, দেখে চমৎকৃত হয়েছেন। তবে এই মেয়েটার বেলায় সেটা ঘটবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছেন না। চিন্তিত হলেন তিনি, তবে মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ পেতে দিলেন না। 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তোমাকে,' মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। 'চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি, নিজেরও সাতখান আছে।'

মলিন হাসি হাসল মেয়েটা। 'ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' কেঁপে উঠল কণ্ঠস্বর।

'এখন একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো,' বলে দরজার দিকে এগোলেন মিসেস কজোলিনা। 'কয়েক ঘণ্টা পর আসব আবার, দেখে যাব কেমন আছো। এসব সময়ে ঘুম খুব কাজে লাগে।' দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন তিনি। রাতের রান্না প্রায় শেষ হওয়ার আগে মনেই পড়ল না মেয়েটার নাম জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছেন। 'ঠিক আছে,' ভাবলেন তিনি: 'ওপরতলায় ফিরে গিয়ে পরেও জেনে নেয়া যাবে।' রান্না শেষ করার দিকে মনোযোগ দিলেন আবার।

*

চোখ মুদল মেয়েটা। ঘুমানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম এল না। চিন্তা ভারাক্রান্ত মন। বাড়ির কথা ভাবছে। ভাবছে জর্জের কথা। ইদানীং এই দুটো জিনিসই ওর বেশি মনে পড়ে। বাড়ির লোকেরা ওর কথা কী ভাবছে এখন? আর জর্জই বা গেল কোথায়? ওর সঙ্গে যেদিন দেখা করার কথা ছিল ওর, সেটা এখন অনেক দূরে মনে হচ্ছে।

বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে মোড়ের রেস্টুরেন্টটার কাছে জর্জের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ঝোড়ো বাতাস বইছিল। কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে দুটো ঘণ্টা কাটিয়ে বিফল হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। পরদিন সকালে জর্জের অফিসে ফোন করেছিল ও। অফিসের লোকেরা জানিয়েছিল আগের রাতে যথাসময়েই অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল জর্জ, কিন্তু আর ফিরে আসেনি। তারপর জর্জের আর কোন খোঁজ পায়নি ও। কারণটা বুঝতে পারেনি। জর্জ ওরকম মানুষ নয়। নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে ওর।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মেয়েটা। ক'টা বাজল? অন্ধকার হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে বজ্রের গর্জন। তবে বৃষ্টি শুরু হয়নি এখনও। রান্নাঘর থেকে বাসন-পেয়ালা নাড়াচাড়ার শব্দ আসছে। মৃদু কথাও শোনা যাচ্ছে। আর আসছে খাবারের সুগন্ধ। মেয়েটা যে ঘরে রয়েছে রান্নাঘরটা তার ঠিক নীচে।

*

রাতের খাওয়ার জন্য রান্নাঘরে ঢুকতে লাগল ছেলেমেয়েরা। হই-চই শুরু করল। ওদেরকে হট্টগোল করতে নিষেধ করলেন মিসেস কজোলিনা। ওপরে মেয়েটার কষ্ট

হবে। ওর ঘরটা আরেকজনকে দিয়ে দেয়াটা মেনে নিতে পারছে না মারিয়া। ওকে একটা উপহার দেয়ার লোভ দেখিয়ে চুপ করালেন ওর মা। খাওয়া শেষ হলো। আইসবক্সের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালেন মিসেস কজোলিনা। আটটা বাজে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে ওপরতলায় পড়ে আছে বেচারি মেয়েটা। একটিবারের জন্য টুঁ শব্দ করেনি। মনে মনে মেয়েটার সাহস ও ধৈর্যের পরীক্ষা করলেন তিনি। অনেকেই সহ্য করতে পারে না। যতটা না কষ্ট তারচেয়ে অনেক বেশি চেঁচায়।

মেয়েদেরকে বাসন-পেয়ালাগুলো ধুতে বলে ওপরতলায় চলে এলেন তিনি। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলেন: 'কেমন লাগছে এখন?'

'ভাল,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল মেয়েটা।

'কতক্ষণ পর পর ব্যথা ওঠে?' মেয়েটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আবার ওকে পরীক্ষা করলেন মিসেস কজোলিনা।

'আধ ঘণ্টা পর পর।'

'ভাল।' বললেন বটে, তবে পরীক্ষা করে বিশেষ ভাল মনে হলো না মিসেস কজোলিনার। নীচে নেমে মেয়েদেরকে গরম পানি আর পরিষ্কার তোয়ালে তৈরি রাখতে বললেন।

মাঝরাতে শুরু হলো ঝড়বৃষ্টি। আকাশটা যেন ভেঙে পড়ার অবস্থা হলো। আর ওই সময় বেরোতে শুরু করল বাচ্চাটা। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে আছে মেয়েটা। খাটের মশারির খুঁটিতে বাঁধা তোয়ালে ধরে রেখেছে শক্ত করে। ব্যথায় শরীর মোচড়াচ্ছে। সাদা হয়ে গেছে মুখ। চোখ বড় বড়। ভয় দেখা যাচ্ছে সে-চোখে।

রাত দুটোর দিকে তাঁর বড় ছেলেকে ডাক্তার আনতে পাঠালেন মিসেস কজোলিনা। পথের মোড়েই ডাক্তার বুনাভেন্টার বাসা। ফেরার পথে গির্জার যাজককেও খবর দিয়ে আসতে বললেন।

ডাক্তার এসে পেট কেটে বাচ্চাটাকে বের করলেন। তারস্বরে চেঁচানো শুরু করল বাচ্চাটা। তারপর ওর মাকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করলেন ডাক্তার। মেয়েটার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে নীরবে দোয়া পড়ছেন যাজক। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছেন মিসেস কজোলিনা। মেয়েটার জন্য খুব খারাপ লাগছে তাঁর।

মেয়েটা সুন্দরী। বয়েস কম। আরেকবার ওর সাহসের প্রশংসা করলেন তিনি মনে মনে।

নিজের স্বামীকে হারিয়েছেন মিসেস কজোলিনা। বুঝতে পারলেন এই মেয়েটাও হারিয়েছে।

তাঁর দিকে তাকিয়ে মলিন হাসি হাসল মেয়েটা। বাচ্চাটাকে ওর কোলের কাছে নামিয়ে রাখলেন মিসেস কজোলিনা। বাচ্চাটাকে দেখল মেয়েটা। পরম আদরে নিজের গালটা চেপে ধরল বাচ্চার মাথায়। তারপর চোখ বুজল।

এতক্ষণে মনে পড়ল মিসেস কজোলিনার, মেয়েটার নাম জিজ্ঞেস করা হয়নি।

মেয়েটার মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমার নাম কী?' আশঙ্কা হচ্ছে, মেয়েটা যদি নাম বলতে না পারে চিরকাল নামহারাই থেকে যাবে বাচ্চাটা।

ধীরে ধীরে চোখ মেলল মেয়েটা। মনে হলো যেন বহুদূর থেকে তাকিয়ে আছে। 'ফ্র্যান্সেস কেইন।' এতই মৃদুস্বরে বলল, শোনার জন্য ওর মুখের কাছে কান নিয়ে যেতে হলো মিসেস কজোলিনাকে। আবার চোখ মুদল মেয়েটা। হঠাৎ করেই খুলে গেল আবার। নিষ্প্রাণ চোখ। আস্তে করে একপাশের চোয়াল কাত হয়ে পড়ে গেল বালিশে।

বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মিসেস কজোলিনা। চাদর দিয়ে মেয়েটার মাথা ঢেকে দিলেন ডাক্তার। ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে ইটালিয়ান ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন: 'আগে বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট লিখি, কি বলেন?'

মাথা ঝাঁকালেন মিসেস কজোলিনা। 'যে বেঁচে আছে তার সার্টিফিকেটই আগে লেখা উচিত।'

'নাম কী ওর?' বাচ্চাটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'ফ্রান্সিস কেইন,' মিসেস কজোলিনা বললেন। 'বাবার নাম জানা নেই, তাই সারা জীবন হয়তো মায়ের নামের এই পরিচয়টাই বয়ে বেড়াতে হবে ওকে।'

প্রথম পর্ব

এক

রাস্তার ওপাশে সেইন্ট টেরেসি গির্জায় সকাল আটটার ঘন্টা বাজল। সারি দিয়ে ক্লাসের ঢোকার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। সিস্টাররা বেরিয়ে এসেছেন চত্বরে। কয়েক সেকেন্ড আগেও খেলাধূলা হই-চই করছিলাম আমরা। এখন সব নীরব। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে ক্লাসে ঢুকলাম আমরা। মেয়েদের জন্য একপাশে বসার ব্যবস্থা, ছেলেদের জন্য আরেক পাশে।

'এখন প্রার্থনা,' সিস্টার অ্যানি বললেন। যার যার ডেস্কের সামনে বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে মাথা নুইয়ে দাঁড়ালাম।

সিস্টারের অলক্ষে থুতু ছুঁড়লাম জেরি কাউয়ানকে লক্ষ্য করে। ওর ঘাড়ের পিছনে আটকে রইল থুতুর দলা। মজা পেয়ে হাসতে শুরু করলাম প্রার্থনার মাঝখানেই। প্রার্থনা শেষে কে থুতু মেরেছে ঘুরে দেখার চেষ্টা করল জেরি। আমি বইয়ের দিকে তাকিয়ে পড়ার ভান করলাম।

সিস্টার অ্যানি আমার দিকে তাকালেন। 'ফ্র্যান্সিস?'

অপরাধীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, জেরিকে থুতু মারতে দেখে ফেলেছেন। কিন্তু না, আমাকে ব-্যাকবোর্ডের কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন তিনি। বাক্স থেকে বড় একটা চক তুলে নিয়ে বোর্ডে লিখলাম: শুক্রবার, জুন ৫, ১৯২৫।

টিচারের দিকে তাকালাম।

'হয়েছে, ফ্র্যান্সিস। যাও, সিটে গিয়ে বসো।'

ফিরে এলাম নিজের সিটে।

অলসভাবে কেটে যাচ্ছে সকালটা। বাতাসে গুমোট ভাব। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ছুটি হয়ে যাবে স্কুল। স্কুলের পড়ালেখা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই আমার, আমি আছি টাকা কামানোর ধান্দায়। তেরো বছর বয়েস হয়েছে আমার, বয়েসের তুলনায় বড় হয়ে গেছে শরীর। জিমি কেওয়াফ আমাকে কথা দিয়েছে ছুটিতে ওর বাজির টাকা আদায়ের কাজগুলো আমাকে দিয়ে করাবে, আশেপাশের গ্যারেজগুলোতে বসে যারা ব্যবসা চালায় তাদের কাছ থেকে আধা ডলার, সিকি ডলারের বাজির টাকা আনতে যাওয়ার কোন আগ্রহ নেই ওর–সেগুলো আমাকে দিয়ে আনাবে। যা কমিশন পাব তাতে সপ্তাহে কম করে হলেও দশ ডলার আয় হবে আমার। সুতরাং স্কুল নিয়ে কেন মাথা ঘামাতে যাব।

লাঞ্চের সময় ছেলেমেয়েরা লাঞ্চ খেতে বাড়ি চলে যায়। আমার বাড়ি নেই। তাই স্কুলের পিছনের ডরমিটরি বিল্ডিঙে যাই ওখানকার ডাইনিং রুমে অন্য এতিমদের সঙ্গে বসে খাবার জন্য। এক গ-াস দুধ, একটা স্যান্ডউইচ আর একটা ছোট কেক দিয়ে লাঞ্চ খাই। খাবারটাকে কোনমতেই খারাপ বলা যাবে না, কারণ যারা বাড়ি যায় তাদের

অনেকেই এরচেয়ে খারাপ খাবার খায়। তারপর আবার স্কুলে ফেরার পালা। বিকেলটা অসহ্য লাগে আমার। এরচেয়ে ফিফটি ফোর্থ স্ট্রিটে কিংবা হাডসনের ডকে সাঁতার কাটতে পারলে অনেক ভাল লাগত। আগেরবার সাঁতার কাটতে গিয়ে কী ঘটিয়েছিলাম মনে পড়ল।

আমার ধারণা হুকি খেলায় কোনও একদিন আমি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ে ফেলব। কিছুদিন আগে সিস্টারদের ফাঁকি দিয়ে গিয়ে গিয়ে একটানা ছয় সপ্তাহ হুকি খেলেছি। অসুস্থতার দোহাই দিয়ে বেরিয়ে যেতাম। এখানে বলে রাখি, রোজ ঘুমানোর জন্য স্কুলে ফিরতে হয় আমাকে। কাজেই খেলতে যাওয়াটা সহজ ছিল না। আমাকে বিছানায় না দেখলে সিস্টাররা আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠাবেন আমাদের ডরমিটরির ইনচার্জ ব্রাদার বার্নহার্ডের কাছে। একদিন ঠিকই দেখে ফেললেন একজন সিস্টার। তবে সেরাতে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম আমি। ফিরে এসে হলরুমে পড়লাম একেবারে বাঘের মুখে, ব্রাদার বার্নহার্ড ও সিস্টার অ্যানি সেখানে অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য।

'ওই যে, পাজিটা!' চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রাদার বার্নহার্ড। 'এমন শিক্ষা দেব আজ, জীবনে ভুলবে না!' আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। 'এই ডেঁপো ছেলে কোথায় গিয়েছিলে?'

'কাজ করতে,' জবাব দিলাম।

'মিথ্যে বলার আর জায়গা পাও না!' ঠাস করে আমার গালে চড় মারলেন তিনি।

আমার জন্য মায়া হচ্ছে সিস্টার অ্যানির, মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। বললেন: 'ফ্র্যান্সিস, এমন একটা কাজ কী করে করতে পারলে তুমি! তোমার সম্পর্কে আমার কী ধারণা, কতটা ভালবাসি তোমাকে, জানো না?'

জবাব দিলাম না। আবার চড় মারলেন ব্রাদার বার্নহার্ড। 'চুপ করে আছো কেন? টিচারের কথার জবাব দাও।'

মুখোমুখি হলাম ওঁদের। রাগে তোড়ে বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে: 'আমার ভাল লাগছে না। এই স্কুল, এই এতিমখানা আর আমার ভাল লাগছে না। এটা একটা জেলখানা ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু জেলে থাকার মত কোনও অপরাধ আমি করিনি। রাতের বেলা কেন আটকে থাকব আমি? লর্ডকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন আপনারা। আমার সঙ্গে যা করছেন, এটা কি সেই ভালবাসার নমুনা?'

সিস্টার অ্যানির চোখের কোণে পানি চিকচিক করতে দেখলাম। এমনকী ব্রাদার বার্নহার্ডও চুপ করে গেছেন। কাছে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন সিস্টার অ্যানি। আদর করে বললেন: 'আমরা কি তোমাকে ভালবাসি না, ফ্র্যান্সিস? তুমি অন্যায় করেছ, খুব অন্যায়, সেটার জন্যই শাস্তি পাচ্ছ।' হাত তুলে আমার চোখের পানি মুছতে চাইলাম। তাঁর গাউনের বুকের কাছে আটকে গেল আমার হাত। দম আটকে গেল যেন আমার। হাতটা ওখানেই রেখে দিলাম। খামচে ধরলাম নরম বুক। ব্রাদার বার্নহার্ডের দিকে সিস্টার পিছন করে থাকাতে আমি কী করছি তিনি দেখতে পেলেন না। 'বলো, এ রকম অন্যায় আর কখনও করবে না তুমি,' সিস্টার অ্যানি বললেন।

কোন অপরাধাটা তিনি করতে নিষেধ করছেন–এখন যা করছি সেটা, না আগেরটা–বুঝলাম না। জবাব দিলাম: 'করব না।'

ব্রাদার বার্নহার্ডের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। সাদা হয়ে গেছে মুখ। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বললেন: 'অনেক শাস্তি হয়েছে ওর, ব্রাদার। এখন থেকে ভাল হয়ে চলবে ও, প্রতিজ্ঞা করেছে। এখন আমাকে যেতে হবে, ঈশ্বর যাতে ওর ভাল করেন, সেজন্য প্রার্থনা করতে হবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

ব্রাদার বার্নহার্ডের দিকে তাকালাম। 'সাপার খাবে চলো।' আমাকে ডাইনিং রুমে নিয়ে চললেন তিনি।

খাওয়ার পর ক্লাসে ফিরে গেলাম। আমার দিকে সহজ ভঙ্গিতে তাকাতে পারছেন না আর টিচার অ্যানি। কেন, আমি জানি। যে ভাবে আমি তাঁর বুকে হাত দিয়েছি, তাতে নিশ্চয় তিনি আর আমাকে এখন ছোট ভাবছেন না। বুঝে ফেলেছেন, তেরো বছর বয়েসের তুলনায় আমি অনেক বড় হয়ে গেছি।

ছুটির পর স্কুলচত্বরে যখন বেরিয়ে এলাম, খেলার আয়োজন শেষ করে এনেছে তখন ছেলেরা। হট্টগোল, চেঁচামেচি চলছে। ওদের দিকে তাকিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ উল্টে পড়ে গেলাম মাটিতে। তাকিয়ে দেখি জেরি কাউয়ান আর আরেকটা ছেলে হাসছে। ল্যাঙ মেরে ওরা আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। রেগে উঠে জেরিকে বললাম: 'এটা কী হলো?'

'কী আবার, থুতু মারার প্রতিশোধ,' হাসতে হাসতে জেরি বলল। 'তুই ভেবেছিলি আমি বুঝতে পারিনি?'

উঠে দাঁড়ালাম। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম: 'যাক, শোধবাদ হয়ে গেল।'

এরপর পাশাপাশি বসে আমরা খেলা দেখতে লাগলাম। একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ি আমরা, দুজনে বন্ধু, অথচ সামাজিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে সাংঘাতিক দূরত্ব। আমি একজন জারজ সন্তান, সেইন্ট টেরেসির এতিমখানায় ঠাঁই পেয়েছি। আর জেরি কাউয়ান নিউ ইয়র্কের মেয়রের ছেলে।

দুই

কবে থেকে এতিমখানায় আছি আমি মনে পড়ে না। জীবন এখানে খুব একটা খারাপ নয় অনেকেই যা ভাবে। ভাল খাওয়ায়, ভাল পরায়, ভাল স্কুলে লেখাপড়া শেখায়। পারিবারিক জীবন কাকে বলে বুঝিও না, মাথাও ঘামাই না। বরং আপনজন না থাকাতে একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে, বুঝতে পারছি নিজের জীবন নিজেকেই গড়তে হবে আমাকে।

সুযোগ পেলেই কাজ করে টাকা উপার্জনের চেষ্টা করি। অন্যের কাছে টাকা ধার চাই না, বরং আমার চেয়ে অনেক সৌভাগ্যবান ছেলেদের ধার দিই। আদায় করতে গিয়ে অনেক সময়ই ঝামেলা পোহাতে হয়, তাই বলে নিজের পাওনা আদায় না করে ছাড়ি না। দুই সপ্তা আগে পিটার স্যানপেরো বিশ সেন্ট ধার নিয়েছিল আমার কাছ থেকে। পরের সপ্তা থেকেই পালিয়ে বেড়াতে লাগল ও। কোনমতেই ধরতে পারি না। তবে এ সপ্তায় ঠিক করেছি, টাকাটা আমি আদায় করেই ছাড়ব।

স্কুল ছুটির পর বিকেলবেলা মাঠে দেখা পেলাম ওর। ওর দুজন বন্ধুর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে।

'এই পিট,' বললাম ওকে: 'আমার বিশ সেন্টের কী হলো?'

নিজেকে বেশ শক্তিমান ভাবে ও। আমার চেয়ে সামান্য খাটো, তবে চওড়া কাঁধ, ওজনও বেশি। 'কীসের কী হলো?' না বোঝার ভান করল ও।

'আমি ওটা ফেরত চাই,' জবাব দিলাম। 'আমার টাকা। যেটা ধার দিয়েছিলাম তোমাকে।'

'জাহান্নামে যাও তুমি আর তোমার বিশ সেন্ট!' নাকি গলায় ঝাঁজিয়ে উঠল ও। বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকাল। 'এতিমখানার এই জারজগুলোর এটাই হলো সমস্যা। আমাদের দান করা টাকায় খায় ওরা, লেখাপড়া করে, আর ভাব করে যেন জায়গাটার মালিক ওরা। এই যাও যাও, যখন পারব দেব।'

প্রচণ্ড রাগ লাগল। জারজ বললে গায়ে মাখি না আমি। শুনতে শুনতে গা সওয়া হয়ে গেছে। তা ছাড়া ব্রাদার বার্নহার্ড জারজ নিয়ে প্রায়ই জ্ঞান দেন আমাদের: 'শোনো, ছেলেরা, তোমরা হলে সবচেয়ে ভাগ্যবান। কারণ ঈশ্বরই তোমাদের বাবা-মা।' না, জারজ বললে আমার গায়ে লাগে না, কিন্তু কেউ আমাকে ঠকিয়ে আমার পয়সা হজম করে ফেলবে এ আমি হতে দেব না।

ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। পাশে সরে গিয়ে আমার চোয়ালে ঘুসি মারল ও। পড়ে গেলাম। গালি দিলাম: 'শয়তান কোথাকার!' আমার গায়ে চেপে বসল ও। আমার মুখের যেখানে সেখানে ঘুসি মারতে লাগল। নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল আমার। ওর ঘাড়ে ঘুসি মারলাম। নড়ে গেল ও। কোনমতে পা দুটো ওর নীচ দিয়ে ভাঁজ করে এনে

তলপেটে লাথি মারলাম। ওকে গায়ের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে ওর ওপর চেপে বসলাম। এরপর পেটানোর পালা আমার। গোঙাতে শুরু করল ও।

খানিকক্ষণ পিটিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। আমার নাক থেকে রক্ত ঝরছে। ঝুঁকে ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এক মুঠো ভাঙতি পয়সা বের করে আনলাম। আমার বিশ সেন্ট গুনে নিয়ে বাকি পয়সা রেখে দিলাম আবার ওর পকেটে। ওর বন্ধুদের পয়সাগুলো দেখিয়ে বললাম: 'এই দেখো, শুধু আমার বিশ সেন্টই নিলাম। কী ব্যাপার? তোমরাও মারামারি করতে আসবে নাকি? ভাল হবে না বুঝতেই পারছ।'

ওরা মারামারি করতে এল না, বাধাও দিল না, বন্ধুকে তোলার জন্য নিচু হলো। নাক মুছতে মুছতে রাস্তা ধরে হেঁটে চললাম আমি।

হাঁটতে হাঁটতে জিমি কেওয়াফের জুয়ার আড্ডায় চলে এলাম। সিগার স্ট্যান্ডের ওপাশে বসে আছে জিমি। হেসে জিজ্ঞেস করল: 'কী মিয়া, কী হয়েছে তোমার?'

'তেমন কিছু না, মিস্টার কেওয়াফ,' গর্বের সঙ্গে জানালাম: 'এক ব্যাটা ভেবেছিল আমাকে ঠকিয়ে পার পেয়ে যাবে। পারেনি।'

'এই তো চাই, ফ্র্যাঙ্কি,' মিস্টার কেওয়াফ বলল। 'কাউকে ঠকাতে দেবে না। দিলে তো ধরা খেলে। যাও এখন, ঝাড়ুটাড়ুগুলো সেরে ফেলো।' ওখান থেকে সরে আসছি, কেওয়াফকে তার একজন লোকের কাছে বলতে শুনলাম: 'ওই ছেলেটা একদিন কিছু একটা হবে। মাত্র তেরো বছর বয়েস, এখনই আমার অনেক কাজ আমার চেয়ে ভাল পারে।'

ওয়াশরুমে ঢুকলাম। কড়া তামাক আর প্রস্রাবের গন্ধ। পেসাব করা হয় যে বোলটাতে তাতে চড়ে প্রায় ছাদের কাছের জানালাটা খুলে দিলাম। হাতমুখ ধুয়ে আমার শার্টের ঝুলে মুছে নিলাম। জুয়াখেলা হয় যে ঘরে সেখানে ফিরে এসে আমার কাজ শুরু করলাম।

কেওয়াফের এখানে বিকেলবেলাটায় কাজ করতে খুব ভাল লাগে আমার। প্রথমে ঝাড়ু দিই। আটটা জুয়ার টেবিল আছে এখানে। টেবিলের নীচে থেকে শুরু করে পুরো ঘরটায় ঝাড়ু দিই। তারপর টেবিল মুছি। টেবিলের পাগুলো মোছাও বাদ দিই না। তারপর সোডা আর বিয়ারের বাক্সগুলোতে ঠিকঠাকমত বরফ আছে কিনা দেখি। যে সময়ের কথা বলছি, মদ খাওয়া তখন নিষিদ্ধ, তাই মাটির নীচের ঘরে অর্থাৎ সেলারে লুকিয়ে রাখা হয় বোতলগুলো। মক্কেলদের কারও খেতে ইচ্ছে করলে কেওয়াফকে বলে, ওর কাজে ব্যস্ত থাকলে আমাকে এনে দিতে বলে। দৌড়ে গিয়ে নীচে থেকে এনে দিই। কখনও কখনও গোটা দুই বোতল কাউন্টারের নীচে পায়ের কাছে রেখে দেয় কেওয়াফ।

চারটে নাগাদ ফোন বাজতে আরম্ভ করল। রেসের ফলাফল আসতে আরম্ভ করল। ঘরের প্রান্তের এককোণে মোটামুটি লোকচক্ষুর অন্তরালে একটা ব্ল্যাকবোর্ড আছে, তাতে ফলাফল লিখে রাখি আমি। জুয়াড়িদের ফাইফরমাশও খাটি। রাস্তার ওপাশের দোকান থেকে স্যান্ডউইচ এনে দিই। সব সময় আমার জুতো পালিশের বাক্সটা সঙ্গে রাখি। কেউ চাইলে তার জুতো পালিশ করে দিই।

এ কাজের জন্য সপ্তায় তিন ডলারমত রোজগার করি। এ ছাড়া অন্যান্য কাজ মিলিয়ে গড়ে ছয় থেকে আট ডলার আয় হয়। স্কুল ছুটি থাকলে বাজির টাকা আদায় করে আনতে আমাকে গ্যারেজে পাঠাবে বলেছে কেওয়াফ। তাতে দশ-পনেরো ডলার আয় হবে বলেছে। সাড়ে ছটা সময় হিসেবের স্লি-পগুলো আমার হাতে দিয়ে যোগ করে দিতে বলল কেওয়াফ। বাজির টাকা কত আদায় হয়েছে সেটা লেখা রয়েছে ওগুলোতে। সন্ধ্যা সাতটায় জুয়ার আড্ডা থেকে বেরিয়ে নৈশভোজের জন্য এতিমখানায় ফিরে চললাম। খাওয়ার পর আরও ঘণ্টা দুয়েক কাজ করতে পারি, কিন্তু রাতে কোনমতেই আড্ডায় থাকতে দেয় না কেওয়াফ। কেন, জানি না।

পরদিন স্কুলে এল না পিটার স্যানপেরো। তবে ওর মা এলেন। ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে সিস্টার অ্যানির সঙ্গে কথা বলতে বলতে জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন। সিস্টার সুপিরিয়রের কাছে পাঠালেন ওঁকে সিস্টার অ্যানি। কিছুক্ষণ পর একটা মেয়ে একটা মেসেজ এনে সিস্টার অ্যানির হাতে দিল।

'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত মেরি পিটার তোমাদের ক্লাস নেবেন,' সিস্টার অ্যানি বললেন। 'ফ্র্যান্সিস, এসো আমার সঙ্গে।'

তাঁর সঙ্গে সিস্টার সুপিরিয়রের অফিসে ঢুকলাম। ব্রাদার বার্নহার্ড, সিস্টার সুপিরিয়র ও মিসেস স্যানপেরো রয়েছেন সেখানে। মিসেস স্যানপেরো বলছেন: 'এর একটা বিহিত যদি না করেন, ওই পিচ্চি শয়তানটাকে শাস্তি না দেন...' আমার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেলেন তিনি।

সিস্টার সুপিরিয়র আমাকে ডাকলেন: 'এখানে এসো, ফ্র্যান্সিস।'

ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

'এসব কী শুনছি? পিটারকে নাকি খুব মেরেছে তুমি? কেন?' শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমার কাছ থেকে বিশ সেন্ট ধার নিয়ে দিতে চাচ্ছিল না,' আমি বললাম। 'তার ওপর আমাকে জারজ বলে গালি দিয়েছে।' আমি জানি এটা বলে ওদের সহানুভূতি জাগাতে পারব।

'ফ্র্যান্সিস, রাগ দমন করতে শেখো। কেউ গালি দিলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া যিশু বলেছেন কেউ এক গালে চড় মারলে আরেক গাল বাড়িয়ে দাও। মিসেস স্যানপেরোর কাছে ক্ষমা চাও, সরি বলো।'

মাপ চাইলে আমার কোন ক্ষতি নেই। কাছে গিয়ে বললাম: 'আমি দুঃখিত, মিসেস স্যানপেরো। পিটারকে আমি মারতে চাইনি।' জবাব দিলেন না তিনি।

সিস্টার সুপিরিয়রের সামনে ফিরে এলাম। 'এখন শোনো, ফ্র্যান্সিস, মারামারির জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। আগামী দুই সপ্তা স্কুল ছুটির পর ঘর থেকে কোথাও বেরোতে পারবে না তুমি, ব্রাদার বার্নহার্ডকে আমি বলেছি।'

'দুই সপ্তা,' আঁতকে উঠলাম। 'না না, এতবড় শাস্তি আমাকে দেবেন না।'

'থামো!' ফেটে পড়ল ব্রাদার বার্নহার্ডের কণ্ঠ। 'কেন দেব না?'

'তাহলে জিমি কেওয়াফের ওখানে আমার কাজটা হারাব, অন্য কেউ নিয়ে নেবে।'

'ও, কাজও জোগাড় করে নিয়েছ?' ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি: 'কী কাজ?'

'আমি ওখানে ঝাড়ু দিই, ফাইফরমাশ খাটি।'

'ঝাড়ু দাও? ঘর পরিষ্কার করো, তাই না? বেশ, ওরকম কাজ আমিও তোমাকে প্রচুর দিতে পারি,' তিনি বললেন।

'ক্লাসে যাও এখন, ফ্র্যান্সিস,' সিস্টার সুপিরিয়র বললেন।

'এসো, ফ্র্যান্সিস,' সিস্টার অ্যানি বললেন। নীরবে তাঁর পিছু পিছু হলে বেরিয়ে এলাম। ক্লাসে যাওয়ার সিঁড়িতে থেমে আমার দিকে ঘুরলেন তিনি। আমার দুই ধাপ নীচে রয়েছেন, তাঁর মুখ আমার মুখের সামনে।

'মন খারাপ কোরো না, ফ্র্যান্সিস,' আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কী করছি বুঝে ওঠার আগেই তাঁর হাতটা নিয়ে চুমু খেলাম। 'আমি আপনাকে ভালবাসি। একমাত্র আপনিই আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন, আমাকে বুঝতে পারেন। আমি আপনাকে ভালোবাসি।'

আমার হাতটা শক্ত করে ধরে আমার দিকে ঝুঁকলেন তিনি। চোখে পানি টলমল করছে। 'তোমার জন্যে সত্যিই আমার মায়া হয়,' বলে আমার ঠোঁটে চুমু খেলেন তিনি। আমি তাঁর চুমুর সাড়া দিলাম। হঠাৎ ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে গেলেন তিনি। এই ঘটনার পর নিশ্চয় আর কোন সন্দেহ রইল না তার, আমার শিশুকাল অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। একটা সেকেন্ড তাঁর চোখ আমার চোখে আটকে রইল। পরক্ষণে ঘুরে দাঁড়ালেন। দুজনেই মাথা নিচু করে চুপচাপ ক্লাসের দিকে এগিয়ে চললাম আমরা।

তিন

ব্রাদার বার্নহার্ডকে ফাঁকি দেয়া কোন ব্যাপারই না। মাত্র একটা কী দুটো দিন ঘরে আটকে থেকে শাস্তি ভোগ করলাম। ডরমিটরিতে তাঁর কাছে হাজিরা দিয়ে এসেই জানালা দিয়ে বেরিয়ে একটা থাম বেয়ে নামি, চলে যাই আমার কাজে। সন্ধ্যায় ফিরে এসে একই পথে ঘরে ঢুকি। কেউ কিছু জানতে পারে না।

এই সময়টাতেই একদিন পরিচয় হলো সিল্ক ফেনেলির সঙ্গে।

এ এলাকার 'বড় ভাই' সিল্ক ফেনেলি। সবকিছু চালায়: মদের আড্ডা, জুয়ার আড্ডা, চাঁদাবাজি, আরও কতরকম ধান্দা। এলাকার সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে, ভয় পায়। আমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেও দেখেছি তাকে। ব্যবসার কাছে মাঝে মাঝে কেওয়াফের আড্ডায় আসে। সঙ্গে থাকে বডিগার্ড। খুব কঠিন লোক সে, ভীষণ ধূর্ত। কোন কিছুকে, কাউকে ভয় পায় না। ও আমার হিরো।

মাঝে মাঝে যেদিন কেওয়াফের কাজ আগেই শেষ করে ফেলি আমি, আমার জুতো পালিশের বাক্সটা নিয়ে বাড়তি উপার্জনের জন্য বেরিয়ে পড়ি। যে বিকেলে ফেনেলির সঙ্গে পরিচয় হলো, সেদিন ব্রডওয়ে ও সিক্সটি-ফিফ্থ রোডের মোড়ের একটা বারে চলে এলাম। জুতো পালিশ করে সবচেয়ে বেশি টাকা আয় হয় এই জায়গাটায়।

বারে ঢুকে কাস্টোমারদের কাছে ঘুরে ঘুরে বলতে থাকলাম: 'বুটপালিশ, চাই বুটপালিশ?'

মোটাসোটা বারকিপার, টেকো মাথায় ঘাম জমছে, ধমকে উঠল আমাকে: 'এই যা, ভাগ! কতবার মানা করেছি বারে ঢুকে কাস্টোমারদের জ্বালাবি না। জলদি ভাগ, নইলে লাথি মেরে তাড়াব!'

জবাব না দিয়ে ঘুরে দরজার দিকে রওনা হলাম। শয়তানি করে হঠাৎ পা বাড়িয়ে দিল একজন কাস্টোমার। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। কাঁধ থেকে পড়ে গেল জুতো পালিশের বাক্সটা। মেঝেতে কাত হয়ে পড়ল কালির বোতল। কালো ও বাদামী রঙের ঘন কালি গড়িয়ে গিয়ে পরিষ্কার মেঝেটা নোংরা করছে। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে বিমূঢ় হয়ে দেখছি।

হঠাৎ ভালুকের থাবার মত থাবা পড়ল আমার ঘাড়ে। হ্যাঁচকা টানে তুলে নেয়া হলো আমাকে। মোটা বারকিপার রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল: 'আয়, আজ তোর একদিন কী আমার! এমন শিক্ষা দেব আজ...' এতটাই রেগেছে কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে, তোতলাচ্ছে।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছে ঘোর কাটল আমার। ঝটকা দিয়ে ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম: 'আমার জুতো পালিশের বাক্স। ওটা নিতে

হবে।'

'বেরো, হারামজাদা! রোজ রোজ এসে বিরক্ত করার মজা দেখাব আজ!'

'বাক্সটা না নিয়ে আমি যাব না!' আবার চেঁচালাম। ঝট করে মাথা নামিয়ে, ওর পাশ কাটিয়ে স্যালুনে ফিরে এলাম। মাটিতে পড়ে থাকা ব্রাশ, নেকড়া, কালির বোতল ও টিনগুলো বাক্সে ভরতে শুরু করলাম।

সোজা হয়ে দাঁড়াতে যাওয়ার আগেই আবার আমাকে ধরল বারকিপার। ঠাস করে থাপ্পড় মারল কানের ওপর। ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল কান। 'এখানে আসতে বহুবার মানা করেছি, শুনিসনি,' বলে আবার থাপ্পড় মারল। ঘাড় চেপে ধরে রাখল যাতে নড়তে না পারি। শরীর মুচড়ে, ছটফট করে ছাড়া পেতে চাইলাম। কিন্তু এত শক্ত করে ধরেছে, পারলাম না। লাথি মারার চেষ্টা করলাম ওর হাঁটুতে, ছুঁতে পারলাম না, নাগালের বাইরে রেখেছে।

'ছেড়ে দাও ওকে, টনি,' দেয়ালের পাশের একটা বুথ থেকে বলে উঠল একটা শান্ত কর্তৃত্বভরা কণ্ঠ। 'আমি জুতো পালিশ করাব।'

বারকিপার ও আমি দুজনেই ঘুরে তাকালাম। একটা হাত উঁচু করে রেখেছে চড় মারার ভঙ্গিতে যেন বাতাসে আটকে গেছে ওটা। আরেকটা হাত আমার ঘাড় চেপে ধরে রেখেছে। কে বেশি অবাক হয়েছে, আমি না ও, বুঝতে পারছি না। পঁয়ত্রিশ-চলি-শ বছরের একজন হালকা-পাতলা সুদর্শন মানুষ একটা বুথে বসে আছে, একটা হাত টেবিলে রাখা, আঙুলগুলো অর্ধেক মুঠোবদ্ধ; আরেকটা হাত ভেস্টে পকেটে রাখা পকেটনাইফের চেনটা নাড়াচাড়া করছে। পরনে গাঢ়-ধূসর রঙের সুট, মাথায় কালো হ্যাট, পায়ে চকচকে কালো জুতো। ধূসর চোখজোড়া আধবোজা। সুন্দর ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ। ঝকঝকে সাদা দাঁত। এই হলো সিল্ক ফেনেলি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দুজনের দিকে।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল বারকিপার। 'ঠিক আছে, মিস্টার ফেনেলি।' আমাকে ছেড়ে দিয়ে বারের অন্যপাশে চলে গেল সে।

শার্টের হাতা দিয়ে মুখ মুছে বারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাথে জুতো পালিশের বাক্সটা নিয়েছি। ফেনেলির সঙ্গে আরও দুজন রয়েছে বুথে: একজন ধোপদুরস্ত পোশাক পরা জোয়ান পুরুষ, অন্যজন সুন্দরী মেয়ে।

'আপনার জুতো তো পালিশ করতে পারব না আমি, সাহেব,' বললাম।

'কেন?' জানতে চাইল ফেনেলি।

'কালো কালি সব পড়ে গেছে।'

পকেট থেকে টাকার তোড়া বের করল সে। একটা পাঁচ ডলারের নোট নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'নাও। কিনে নিয়ে এসো।'

নোটটার দিকে তাকালাম আমি, তারপর ফেনেলির দিকে। কোন কথা না বলে নোটটা নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। মেঝে মুছতে শুরু করেছে একজন পরিচারক। দরজার দিকে এগোনোর সময় কানে এল জোয়ান লোকটা ফেনেলিকে বলছে: 'ওই ছেলে আর

ফিরবে না, সিল্ক, পঞ্চাশ ডলার বাজি।'

হেসে উঠল ফেনেলি। 'ঠিক আছে। ধরলাম বাজি।'

'এত টাকা একসঙ্গে জীবনে দেখেনি ও,' মেয়েটা বলল।

'তা ঠিকই বলেছ,' ফেনেলি বলল: 'ওর বয়েসে আমিও দেখিনি।'

এরপর আর কী বলল ওরা শুনলাম না কারণ বেরিয়ে চলে এসেছি। ফিরে এসে দেখলাম ওরা খাচ্ছে। টেবিলে ভাঙতি টাকাগুলো রেখে বললাম: 'আসতে দেরি হয়ে গেল। দোকানি ভাঙতি দিতে পারছিল না। টাকা ভাঙাতে বহুত ঘুরতে হয়েছে আমাকে।'

মেঝেতে ওর পায়ের কাছে বসে জুতো পালিশ শুরু করলাম।

জোয়ান লোকটা টাকার ব্যাগ থেকে কয়েকটা নোট বের করে ফেনেলিকে দিল। গোনার প্রয়োজন মনে করল না ফেনেলি, পকেটে রেখে দিল। 'এটা হলো তোমার শিক্ষা, বিশেষজ্ঞর সঙ্গে বাজি ধরার খেসারত।'

একটা জুতো পালিশ করে তাতে টোকা দিলাম। পা সরিয়ে অন্য পা'টা বাক্সে তুলে দিল ও। জিজ্ঞেস করল: 'তোমার নাম কী, খোকা?'

'ফ্র্যান্সিস কেইন,' বললাম। 'তবে আপনি আমাকে ফ্র্যাঙ্কি ডাকবেন। আমার সব বন্ধুরাই ফ্র্যাঙ্কি ডাকে।'

'ও, তারমানে আমি তোমার বন্ধু, অ্যাঁ? সাবধান, খোকা, বন্ধু বলা সহজ, কিন্তু টিকিয়ে রাখা কিন্তু খুব কঠিন। মনে রেখো,' ও বলল।

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না,' দ্বিধায় পড়ে গিয়ে বললাম। 'আপনাকে তো ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে আমার।' দ্বিতীয় জুতোটাও পালিশ করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

জোয়ান লোকটা আর মেয়েটাও উঠে দাঁড়াল। লোকটা বলল: 'আমাদের এখন যেতে হবে, সিল্ক। দেখা হবে।'

ফেনেলিও উঠে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ, হবে।'

মেয়েটাকে নিয়ে লোকটা চলে গেলে জিজ্ঞেস করলাম: 'টাকাটা কীজন্যে নিলেন, মিস্টার ফেনেলি?'

'মানে?'

'বাজির টাকা। বাজির টাকাই তো পরিশোধ করল ওই ভদ্রলোক, তাই না? আপনাদেরকে বাজি ধরতে শুনেছি আমি।'

হেসে উঠল ফেনেলি: 'ও, শুনেছ। আমাকে বাজির টাকা দিল বুঝলে কী করে?'

'বুঝেছি,' জবাব দিলাম: 'বোকা তো আর নই। আমি ওসব বুঝি।'

আবার হেসে উঠল ফেনেলি। 'বসো। নাও, একটা স্যান্ডউইচ খাও। কোথায় থাকো?'

'সেইন্ট টেরেসি এতিমখানায়।'

'হুঁ, তারমানে বোঝো তুমি,' এমন ভঙ্গিতে কথাটা বলল ও, যেন আমি তার

সমকক্ষ। 'তোমাকে চেনা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি বলো তো? আমার কোনও পে-শপে কাজ করো নাকি?'

তার কিছু কিছু দোকানকে খেলার জায়গা বানিয়েছেন, জানি। সবাই বলে ছোটদের জন্য, ওদেরকে রাস্তা থেকে সরিয়ে রাখার জন্য এটা তার বিরাট অবদান। কেওয়াফ বলে, খেলাধূলার মাধ্যমে বাচ্চাদের শিক্ষা দিতে চায় ফেনেলি। বাচ্চারা পছন্দ করে এমন সমস্ত ধরনের খেলার ব্যবস্থা রয়েছে ওখানে। একটা বিশেষ বয়েস পেরিয়ে গেলে আর ওখানে ঢুকতে দেয়া হয় না ওদের। শুধু তাই না, স্কুলে যাবার সুযোগ নেই যাদের, তাদেরকে স্কুলে পাঠানোরও ব্যবস্থা করে এই মহান লোকটা।

'না,' জবাব দিলাম। 'আমি জিমি কেওয়াফের ওখানে কাজ করি।'

ফেনেলি ইশারা করতে কাছে এসে দাঁড়াল একজন ওয়েইটার। একটা বিফ-স্যান্ডইইচ আর এক গ-াস বিয়ার আনতে বললাম ওকে।

'না, ছোটরা বিয়ার খায় না,' ফেনেলি বলল। বিয়ারের বদলে আমার জন্য ক্রিম সোডা আনতে বলল।

আমাকে খেতে দেখছে ও। তাড়াহুড়া করে কয়েক মিনিটেই শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। 'থ্যাংকস, মিস্টার ফেনেলি।'

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। 'শোনো, তোমার মত আমিও এককালে জুতো পালিশ করতাম।' পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে গুঁজে দিল আমার হাতের তালুতে। 'নাও। যাও এখন।'

'যাচ্ছি, সার,' তাকিয়ে দেখলাম পাঁচ ডলার দিয়েছে আমাকে। 'আবারও ধন্যবাদ।' এ ধরনের মানুষেরা ধন্যবাদ দিলে খুশি হয়। ধন্যবাদ দিতে পয়সা লাগে না। আর এই লোকটা সত্যিই আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছে। আরও একবার ধন্যবাদ দিয়ে স্যালুন থেকে বেরিয়ে এলাম।

রে ক্যালহানকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম মোড়ের কাছে। ওর জুতো পালিশের বাক্সটা পায়ের কাছে রাখা। এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। ওর বাপটা জুয়াড়ি। ঘরে কোন শান্তি নেই ওর। যা টাকা আয় করে মাকে দিয়ে দেয়, আর বুড়ি সেই টাকা মদ খেয়ে ওড়ায়।

'হাই, ফ্র্যাঙ্কি,' রে বলল।

'হাই,' জবাব দিলাম। 'কেমন আয় হলো আজ?'

'ভাল না,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'সারা বিকেলে খেটে মাত্র চলি-শ সেন্ট।'

আমার পাঁচ ডলার ওকে দেখালাম। ছিটকে বেরিয়ে আসার জোগাড় হলো ওর চোখ। 'এত টাকা!' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল: 'কোত্থেকে চুরি করলি?'

হেসে উঠলাম। 'চুরি করিনি। যদি ঠিক লোকটাকে চিনতে পারিস, তুইও কামাতে পারবি।' তারপর সমস্ত ঘটনা ওকে খুলে বললাম।

'সত্যিই তুই ভাগ্যবানরে,' ও বলল।

রাস্তা ধরে হেঁটে চললাম দুজনে। অন্ধকার হয়ে আসছে। একটা দুটো করে আলো

জ্বলতে শুরু করেছে জানালায়।

'আমার সঙ্গে যাবি ওপরে?' রে জিজ্ঞেস করল। 'যদি তোর কোন কাজ না থাকে।'

আমি জানি, এত কম কামানোর জন্য ওকে ধরে পিটাবে ওর বাবা। আমি সঙ্গে থাকলে হয়তো মারবে না, সেজন্যই নিয়ে যেতে চাইছে আমাকে। বললাম: 'ঠিক আছে, চল।'

হলওয়েতে ঢুকতেই ওর মা-বাবার ঝগড়া শোনা গেল। অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে একে অন্যকে।

'খোদা!' বলে উঠে আমার দিকে ফিরল রে। 'কখনও থামে না ওরা। আজ আমার আর রক্ষা নেই।'

জবাব না দিয়ে সিঁড়িতে পা রাখলাম। আমরা প্রথম ল্যান্ডিঙে উঠতেই একটা লোক একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে তাড়াহুড়া করে আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে নেমে গেল। দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। সেখান দিয়ে একজন মহিলার ডাক শোনা গেল: 'রে, একটু শুনবে?'

দাঁড়িয়ে গেল রে। 'হ্যাঁ।' আমার দিকে তাকাল: 'ও মেরি ক্যাসিডি। আমি ওর বাজার করে দিই।'

দরজায় এসে দাঁড়াল মহিলা। 'চট করে গিয়ে আমাকে কয়েক বোতল বিয়ার এনে দেবে?'

'নিশ্চয়, মেরি,' রে বলল। জুতো পালিশের বাক্সটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে মহিলার বাড়ানো হাতের তালু থেকে টাকা নিল। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে দৌড়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

মিস ক্যাসিডি আমাকে বলল: 'বাইরে থাকার দরকার নেই, ঘরে চলে এসো। জুতো পালিশের বাক্সটা নিয়েই এসো।'

নিঃশব্দে বাক্সটা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকলাম। দরজা লাগিয়ে দিল মহিলা। একটা চেয়ার দেখাল। 'রে না আসা পর্যন্ত বসে থাকো।'

বসলাম। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে একটা এনিমা ক্যান নিয়ে ফিরে এল। ডাক্তাররা এর সাহায্যে মলদ্বারে পানি ঢুকিয়ে নালি পরিষ্কার করে, জানি। সিংক থেকে ক্যানে পানি ভরে নিয়ে আবার পাশের ঘরে চলে গেল ও। কয়েক মিনিট পর ফিরে এল।

'ও আসেনি এখনও?' আমাকে জিজ্ঞেস করল।

'না, ম্যা'ম,' জবাব দিলাম। ভাল করে তাকালাম এখন ওর দিকে। দেখতে খারাপ বলা যাবে না, বরং সুন্দরীই বলা চলে, মুখে আর ঠোঁটে রঙ মেখেছে। হালকা সোনালি রঙের কোঁকড়া চুল। এমন করে তাকিয়ে রইলাম বিব্রত বোধ করল ও। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। গাঢ় নীলচে সবুজ চোখ। আর বেশ লম্বা। ভাবলাম, মহিলা যে পতিতা, রে কি জানে? আমার সঙ্গে শুতে রাজি হবে কিনা ভাবছি। পকেটের

পাঁচটা ডলার সাহসী করে তুলল আমাকে।

'আমি দুই ডলার খরচ করতে পারব,' বলে ফেললাম।

'তাতে কী!' কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছে মহিলা। কথায় সামান্য আঞ্চলিক টান।

জবাব খুঁজে পেলাম না। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর চোখে চোখে। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থাকার পর মহিলা বলল: 'তোমার বয়েস তো অনেকই কম, তাই না?'

'পনেরো,' মিথ্যে বলাটা আমার কাছে কোন ব্যাপারই না, সব সময়ই বলি। তা ছাড়া বাড়বাড়ন্ত দেহের কারণে নিজেকে পনেরোই ভাবতে শুরু করেছি।

'আগে কখনও করেছ?' মহিলা জিজ্ঞেস করল।

'করেছি,' অস্বস্তি লাগছে আমার। 'বহুবার!'

'বেশ,' মহিলা বলল: 'এসো তাহলে।' আমাকে শোবার ঘরে নিয়ে এল ও। বিছানার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'দেখি, টাকাটা দাও।'

পকেট থেকে দুটো ডলার বের করে দিলাম। আমার হাত কাঁপছে। নোটগুলো নিয়ে বালিশের নীচে রেখে দিল ও। তারপর কাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আমাকে ডাকল: 'এসো।'

প্যান্ট খুলে ওর পাশে গিয়ে শুলাম। আমার হাঁটু কাঁপছে। কাজটা করার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। ভয় পাচ্ছি আমি। উত্তেজিত হয়ে আছি।

অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে ও। 'জলদি করো। সারাদিন পড়ে থাকব নাকি? যে কোন সময় রে এসে হাজির হতে পারে।'

নাহ্, পারছি না। অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনার কারণে স্বাভাবিক হচ্ছে না আমার শরীর। আমাকে সহযোগিতা করল মহিলা। তাতেও লাভ হলো না। শেষে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। আমি বিছানায় শুয়ে ওকে দেখতে থাকলাম। যেই আমার দিকে পিছন ফিরল, বালিশের নীচে হাত ঢুকিয়ে ডলার দুটো বের করে নিলাম। কাজটাই তো হয়নি, অহেতুক টাকা দেব কেন ওকে। টাকা নিতে দেখল না ও। শার্টের পকেটে রেখে দিলাম নোটগুলো।

কয়েক সেকেন্ড পর বিছানার কাছে এসে একটা তোয়ালে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। কোন কথা না বলে পোশাক পরে নিল।

বিছানা থেকে নেমে প্যান্ট পরলাম। আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও। কাপড় পরা শেষ হলে একসঙ্গে পাশের ঘরে চলে এলাম।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। 'আরও বড় হও, খোকা, তারপর এসো। আমি সব সময়ই বলি: একজন পুরুষ মানুষের কাজ একটা ছেলেকে দিয়ে হয় না।'

ওর দিকে তাকালাম। টের পাচ্ছি মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে আমার। মনে মনে প্রচণ্ড খেপামি তৈরি হচ্ছে। পারলে জুতোর বাক্স দিয়ে বাড়ি মেরে বসি ওকে। হয়তো সেটা বুঝতে পেরেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর, পিছিয়ে গেল এক পা। পেটের মধ্যে গিঁট লেগে যাচ্ছে যেন আমার। জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'তুমি, তুমি আমাকে...' বলতে গেল ও। এই সময় দরজা খুলে গেল।

রে এসেছে। হাতে একটা ব্যাগ। 'তোমার বিয়ার নিয়ে এসেছি, মেরি।'

আবার তাকালাম মহিলার দিকে। আমার দিক থেকে চোখ সরায়নি এখনও। জুতো পালিশের বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

কী যেন জিজ্ঞেস করল রে, হেসে উঠল মহিলা। দুজনেই এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। বিয়ার এনে দেয়ার পারিশ্রমিক হিসেবে রে-কে পয়সা দিল মহিলা। দরজা লাগাতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে পড়ায় ঘুরে দাঁড়াল আবার। রে-কে বলল: 'আর এই যে, এটা তোমার বন্ধুর জন্যে, তোমার অপেক্ষায় বসে থাকার পারিশ্রমিক।' একটা মুদ্রা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল ও।

মুদ্রাটা লুফে নিয়ে সজোরে দরজার গায়ে ছুঁড়ে মারলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম: 'তোর পয়সার নিকুচি করি আমি, হারামি বেশ্যা কোথাকার!' তারপর রে-র দিকে একবারও না থাকিয়ে গটমট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম বাড়িটা থেকে।

চার

আর পনেরো দিন পরেই স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। সময় আর কাটে না আমার। কেওয়াফের ওখানে সত্যিকারের একটা কাজের অপেক্ষা করতে করতে অস্থির হয়ে উঠেছি।

সেদিন বিকেলে জেরিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ওর সঙ্গে আমাকে গেট দিয়ে বেরোতে দেখে অবাক হলো ও।

'আমি ভেবেছিলাম স্কুলেই আটকে থাকবে তুমি, ফ্র্যাঙ্কি,' ও বলল।

'কালকেই আমার শাস্তির শেষ দিন,' বললাম।

'আজ বিকেলে কি বিশেষ কোনও কাজ আছে তোমার?' আমাকে জিজ্ঞেস করল ও।

'কেন?'

'না, এমনি। কৌতূহল হচ্ছিল।'

চুপচাপ কিছুক্ষণ হাঁটলাম আমরা। তারপর জেরি বলল: 'ফ্র্যাঙ্কি, এই গ্রীষ্মে আমার সঙ্গে গ্রামে যাবে?'

'ঠাট্টা বাদ দাও তো,' আমি বললাম।

'না, ঠাট্টা না, সত্যি বলছি।' ওর নীল চোখে আন্তরিকতার ছোঁয়া। 'বাবাকে আমি তোমার কথা বলেছিলাম। বাবা বলল এ সপ্তাহে কোন একদিন আমাদের বাড়িতে ডিনারে নিয়ে যেতে। খেতে খেতে কথা হবে।'

'পাগল!' আমি বললাম। 'ওরা আমাকে কোথাও যেতে দেবে না।'

'আমার বাবা বললে দেবে। বাবা কী, তা তো জানই,' জেরি বলল।

হ্যাঁ, জানি আমি। বিগ জেরি কাউয়ানকে কে না চেনে। নিউ ইয়র্কের হাসিখুশি মেয়র সাহেব। প্রতিদিনকার কাগজে ওঁর ছবি ছাপা হয়। কোটের পকেটে ফুল গোঁজা। ঝকঝকে সাদা দাঁত। হাসিমুখে হাত মেলাচ্ছেন বিশিষ্ট কারও না কারও সঙ্গে। হ্যাঁ, জেরির বাবা চাইলে অনেক কিছুই করতে পারেন। নিউ ইয়র্কের মেয়র যে তিনি।

জুয়ার আড্ডার দরজার কাছে পৌঁছে গেছি আমরা। দাঁড়িয়ে গেলাম। ঘরের ভিতরে তাকালাম। ভিতরে আলো খুব কম, প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। বিয়ার ও প্রস্রাবের গন্ধে ভরা ওই ঘরের মধ্যে পুরো গ্রীষ্মকালটা কাটানোর কথা ভাবলাম। জেরির সঙ্গে গ্রামে কাটানোর কথাও ভাবলাম। নিশ্চয় অনেক চাকর-বাকরে ভর্তি দারুণ একটা জায়গায় থাকবে ও। মাছধরা, সাঁতার কাটা সহ নানারকম আনন্দের ব্যবস্থা থাকবে। লেকের পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্যটা কল্পনা করলাম। কখনও লেকে সাঁতার কাটিনি আমি। নিশ্চয় খুব মজার। মাত্র দু'বার কোনেতে গিয়েছিলাম, ফিফটি-ফোর্থ স্ট্রিটের ডকের কাছে সাঁতার কেটেছিলাম। গ্রীষ্মকাল গ্রামে কাটানোর সঙ্গে এর নিশ্চয় কোন তুলনাই হয় না। জেরির দিকে ফিরে বললাম: 'নাহ্, জেরি, যাব না। অনেক ধন্যবাদ

তোমাকে। আমাকে এখানে থাকতে হবে, কাজ করতে হবে। গরমের ছুটিতে টাকা কামানোর সুযোগটা ছাড়া উচিত হবে না আমার। আর তা ছাড়া, গ্রাম আমার ভাল লাগে না।'

আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল জেরি। বোকা নয় ও। আমি কী ভাবছি, ঠিকই জানে। জেরি একজন আজব বন্ধু। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা সহজ না। আর বন্ধুত্ব হলেও সেটা বজায় রাখা কঠিন। আমাকে কীজন্য পছন্দ করে আমি জানি না। দুই ভুবনের মানুষ আমরা। ভবিষ্যতে এ বন্ধুত্ব কতদিন টিকে থাকবে তা-ও জানি না।

'বেশ,' ও বলল: 'যেতে ইচ্ছে না করলে যাবে না। তবে আমাদের বাড়িতে ডিনারে আসাটা বাদ দিয়ো না।' লক্ষ করলাম বার বার 'ডিনার' বলছে ও, আমাদের মত 'সাপার' বলছে না।

'না, দেব না,' বললাম। ওকে আরেকবার ধন্যবাদ দেব কিনা ভাবলাম। তারপর মনে হলো: 'ধূর! কীসের ধন্যবাদ। একবার তো দিয়েছি।' ওকে শুনিয়ে বললাম: 'আমাকে এখন কাজে যেতে হবে।' হাঁটতে শুরু করল ও। ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। রাস্তার মোড়ে ওকে হারিয়ে যেতে দেখলাম।

জুয়ার আড্ডার দিকে ফিরে তাকালাম। পিছনের দেয়াল ঘড়িটায় তিনটে বেজে পনেরো মিনিট। সকাল সকাল চলে এসেছি আমি। চারটে বাজার আগে ঢোকার দরকার নেই আমার, আর ওই মুহূর্তে কাজ শুরু করতেও ইচ্ছে করল না। জিমি কোথায় আছে দেখলাম। একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে। ও দেখার আগেই চট করে সরে এলাম দরজার কাছ থেকে। ব-কটা পেরিয়ে এসে একটা পুরানো বাড়ির সিঁড়িতে রোদের মধ্যে বসলাম। চারটে বাজার আগে আর যাব না কেওয়াফের ওখানে। বসে বসে গ্রামে যাওয়ার কথা ভাবতে থাকলাম।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সময় কাটানোর চেষ্টা করছি, এ সময় কানে এল চিৎকার। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম রাস্তার অন্যপাশে একটা ইহুদি ছেলেকে কোণঠাসা করেছে দুটো ছেলে। অলস ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইলাম। উঠে গিয়ে আনন্দে যোগ দেয়ারও আগ্রহ বোধ করছি না। আজেবাজে কথা বলে ছেলেটাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে অন্য ছেলে দুটো।

'আধা-মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে কেমন লাগে?' একটা ছেলে বলল।

'এই ব্যাটা যিশুর খুনী!' বলল আরেকজন।

'হারামির বাচ্চা!'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। সাদা হয়ে গেছে মুখ। তবে শান্ত রয়েছে। ধীরে ধীরে ওর দিকে এগোচ্ছে অন্য ছেলে দুটো। হাতের বইগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ইহুদি ছেলেটা। মুঠোবদ্ধ হাত উঁচু করল। আমার চেয়ে সামান্য খাটোই হবে। সোনালি চুল, নীল চোখ আর হালকা-পাতলা দেহ ওর। অবশেষে কথা বলল।

'একজন একজন করে আসো, পিটিয়ে তক্তা বানাব,' ভয়ের প্রকাশ নেই ছেলেটার কণ্ঠে।

জবাবে খিকখিক করে হেসে উঠল অন্য ছেলে দুটো। আরও কাছে এগোল। একজন বলল: 'আমাদের জুতো চাটো!'

আর নিরাসক্ত থাকতে পারলাম না। উঠে দাঁড়ালাম। রাস্তা পেরিয়ে অন্যপাশে চলে এলাম।

'হাই, ফ্র্যাঙ্কি,' একটা ছেলে বলল আমাকে।

'হ্যালে-া, উইলি,' জবাব দিলাম।

অন্য ছেলেটা বলল: 'ওই ইহুদি শয়তানের বাচ্চাটাকে পেটানো দরকার!'

'নিক্স,' আমি বললাম: 'ও কী বলেছে শুনেছ। একজন একজন করে গেলে পিটিয়ে তক্তা বানাবে। সুতরাং আমাদের যে কোন একজনেরই যাওয়া দরকার।'

সন্দিহান চোখে আমার দিকে তাকাল দর্শকরা।

'এখন বলো,' আমি বললাম: 'কে আগে যাবে?'

কোন জবাব নেই।

'বেশ,' বললাম: 'আমিই যাব।'

সরে আমাকে যাওয়ার জায়গা করে দিল ছেলে দুটো। ইহুদি ছেলেটা আমার দিকে তাকাল। প্রতিপক্ষের ক্ষমতা যাচাই করছে।

মুঠি পাকালাম। এগিয়ে এসে আমাকে ঘুসি মারল ও। মাথা নিচু করে সরে গেলাম। মারপিটের কিছুই জানে না ও। এগিয়ে এসে বেশ কয়েকবার ঘুসি মারল ও, যেগুলো সহজেই ঠেকিয়ে দিলাম আমি।

চিৎকার শুরু করেছে দর্শকরা।

'মারো ওকে, ফ্র্যাঙ্কি!'

'লাথি মেরে অণ্ডকোষ ফাটিয়ে দাও!'

ঠোঁটে সিগারেটটা রয়ে গেছে এখনও আমার। ইচ্ছে করেই রেখে দিয়েছি বোঝানোর জন্য কত সহজে আমি ছেলেটাকে পরাস্ত করতে পারি। আবার ঘুসি মারল ও এবং মিস করল। নিঃশ্বাস ভারি হয়ে গেছে ওর। আমি জানি ও বুঝে গেছে আমার সঙ্গে পারবে না। কাত হয়ে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করলাম। সিগারেটটা ঠোঁট থেকে পড়ে গেল। সোজা হয়ে দেখি আমার ঘুসি মারার অপেক্ষা করছে ও। এগিয়ে গিয়ে ওর পেটে ঘুসি মারলাম। আরেকটা ঘুসি মারলাম চোয়ালে। চিত হয়ে পড়ে গেল ও। লাফাতে শুরু করেছে ছেলে দুটো। চিৎকার করে কান ঝালাপালা করছে। 'মেরে ফেলো ওকে! শেষ করে দাও!' চেঁচাচ্ছে ওরা। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেও পারল না ছেলেটা। রাস্তায় পড়ে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। উইলি চেঁচিয়ে বলল: 'এসো, ওকে নর্দমায় ফেলে দিই।' ছেলেটার দিকে এগোতে শুরু করল দুজনে। কিন্তু ওদের সামনে বাধা হয়ে দাড়ালাম আমি।

'ওকে তো হারিয়েই দিয়েছি,' বললাম ওদের। 'আর কিছু করার দরকার নেই।'

আমার চোখের দিকে তাকাল দুজনে। তারপর পরস্পরের দিকে তাকাল। কী করবে বুঝতে পারছে না।

'মজা যা পাওয়ার পেয়েছ,' আমি বললাম আবার। 'এখন ভাগো।'

হাঁটতে শুরু করল ওরা। মোড়ের কাছে গিয়ে ফিরে তাকাল একবার। ওরা চলে গেলে ছেলেটার পাশে বসে পড়লাম। সিগারেটের প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। মাথা নেড়ে মানা করল ও। একটা সিগারেট বের করে ধরালাম। কয়েকটা সেকেন্ড চুপচাপ রইলাম আমরা। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল ও।

'থ্যাংকস,' বলল ছেলেটা।

'কেন, পিটুনি দেয়াতে?' হেসে উঠে বললাম।

'না, সহজেই আমাকে পার পেতে দিয়েছ বলে,' ছেলেটা বলল। 'নইলে ওরা আমাকে...'

'ও কিছু না,' বললাম। 'ওরা আসলে একটু মজা পেতে চেয়েছে।'

'একটু মজা!' শুকনো গলায় বলে বইগুলো তুলে নিতে লাগল ছেলেটা। ওর হাত কাঁপছে এখনও।

ওর দিকে তাকিয়ে আছি। 'মারামারিটা শেখা দরকার তোমার, যদি এই এলাকায় নিরাপদে থাকতে চাও।'

জবাব দিল না ও। তবে ওর চোয়াল শক্ত হয়ে যেতে দেখেই বুঝলাম, শিখতে চায়।

ঠিক এই সময় ফাদার কুইনকে রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'হ্যালে-া, ফাদার,' হাতটা কপালে ছোঁয়ালাম আধা-স্যালুটের ভঙ্গিতে।

'এই ছেলেটার সঙ্গে মারামারি করেছ নাকি, ফ্র্যান্সিস?' হালকা স্বরে জানতে চাইলেন তিনি।

আমি জবাব দেয়ার আগেই ছেলেটা বলে উঠল: 'না, সার, মারামারি করিনি। ফ্র্যাঙ্কি আমাকে বক্সিং শেখাচ্ছিল।'

ওর দিকে তাকালেন ফাদার: 'হুঁ। তবে বেশিদূর এগোতে দিয়ো না ওকে। মাঝে মাঝে কী করছে সেটাই ভুলে যায় ও।' তারপর বদলে গেল ফাদারের কণ্ঠস্বর, ভারি হয়ে উঠল: 'তোমার নাম কী, খোকা? কখনও গির্জায় দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আমি ইহুদি,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল ছেলেটা। 'আমার নাম মার্টিন ক্যাবেল।'

'ও,' ফাদার কুইন বললেন: 'জো ক্যাবেলের ছেলে তুমি।'

'হ্যাঁ, সার।'

'তোমার বাবাকে চিনি। ভাল লোক। আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো ওকে, কেমন?'

'জানাব, সার।'

'তো, আমাকে এখন যেতে হবে। আর মনে রেখো: কোন মারামারি নয়।' ঘুরে পা বাড়িয়েও থেমে গেলেন তিনি। 'ফ্র্যান্সিস, পকেট থেকে সিগারেটটা বের করে ফেলে দাও। প্যান্টটাকে অকারণে ফুটো করার দরকার নেই।' বলে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন তিনি।

পকেট থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা বের করলাম। আমি বুঝতেই পারিনি ওটা আমাকে

পকেটে ঢোকাতে দেখেছেন তিনি। মার্টিন ও আমি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলাম।

'ভদ্রলোককে ভালই মনে হলো,' মার্টিন বলল।

'হ্যাঁ, ভাল,' জবাব দিলাম।

রাস্তা ধরে পাশাপাশি হেঁটে চললাম দুজনে।

'এখানেই থাকো তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ও। 'ফিফটি-নাইন্থ ব্রডওয়েতে বাবার ওষুধের দোকান আছে। সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টে থাকি আমরা।'

নাইন্থ অ্যাভেনিউর মোড়ে পৌঁছুলাম আমরা। একটা জুয়েলারের দোকানের উইনডোতে লাগানো ঘড়ির দিকে তাকালাম। চারটে বেজে গেছে।

'আমাকে এখন যেতে হবে,' বললাম ওকে। 'কাজ আছে।'

'কাজ সেরে আমাদের দোকানে এসো,' মার্টিন বলল। 'একসঙ্গে বসে সোডা খাব।'

'আসব। আবার দেখা হবে,' বলে ঘুরে দাঁড়ালাম। কয়েক পা গিয়ে দৌড়াতে আরম্ভ করলাম। বেশি দেরি করে গেলে রেগে যাবে কেওয়াফ।

পাঁচ

কেওয়াফের দোকানে পৌঁছে দেখি কেউ আসেনি তখনও। মনে হলো বিকেলটা আজ ব্যবসাহীন যাবে। দ্রুত সব সাফসুতরো করে খাতাটা নিয়ে বসলাম। ঘোড়দৌড়ের ফলাফল এলে সেগুলো লিখে ফেলতে লাগলাম।

সাড়ে পাঁচটার দিকে কয়েকজন খদ্দের এল। কয়েক বোতল ঠাণ্ডা বিয়ার আনতে আমাকে নীচে পাঠাল কেওয়াফ। ফিরে এসে দেখি সিল্ক ফেনেলি এসেছে, কেওয়াফের সঙ্গে কথা বলছে। আমার দিকে চোখ পড়তে বলল: 'হ্যালে-া, ফ্র্যাঙ্কি।'

'হ্যালে-া, মিস্টার ফেনেলি,' গর্বিত ভঙ্গিতে চারপাশে তাকালাম এতবড় একজন মানুষের সঙ্গে আমার খাতির আছে বলে।

কেওয়াফের সঙ্গে আবার কথা বলতে লাগল ও। কথা শেষ করে আমার কাছে এল। জিজ্ঞেস করল: 'কী, আজ জুতো পালিশ করে দেবে না?'

দিলাম। খুব ভাল করেই পালিশ করে দিলাম। এমন চকচকে করে দিলাম, জুতোর মধ্যে নিজের চেহারা দেখতে পেলাম।

খুশি হলো ও। বুঝতে পারলাম। আমাকে আধ ডলার দিয়ে জিজ্ঞেস করল ইদানীং আর কোনও স্যালুন থেকে আমাকে ঘাড় ধরে বের করে দিয়েছে কিনা।

জবাবে হাসলাম। কেওয়াফ এলে সেদিন স্যালুনে কী ঘটেছিল বলল ফেনেলি। দুজনেই হাসতে লাগল।

জুতো পালিশের বাক্স রেখে আবার খাতা নিয়ে বসলাম। কেওয়াফ ও ফেনেলি এসে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল।

'তোমার হিসেবপত্র করে দেয় নাকি ও?' কেওয়াফকে জিজ্ঞেস করল ফেনেলি।

'হ্যাঁ,' কেওয়াফ জবাব দিল। 'আর খুব ভাল হিসেব করে।'

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ফেনেলি। 'ধরে রেখো, খোকা। এই লাইনে অনেক বড় হবে তুমি একদিন।'

আমাকে গুড-বাই জানিয়ে বেরিয়ে গেল ও। একটা গাড়িতে চড়ে চলে যেতে দেখলাম ওকে।

'এই লাইনে অনেক বড় হবে একদিন!' ওর কথা কানে বাজতে থাকল আমার। 'তা ঠিক, শহরের সবচেয়ে বড় জুয়াড়ি..সেটাই হব একদিন। তবে জুয়া আমি খেলব না, জুয়াড় আড্ডা চালাব, সিল্ক ফেনেলির মত। বোকাগুলোকে দিয়ে দুধ জ্বাল দিইয়ে সরটা খাব আমি। ফেনেলির চেয়েও বড় একটা গাড়ি কিনব...'

স্বপ্ন দেখে দেখে বিকেলটা কাটিয়ে দিলাম। কখন যে বাড়ি ফেরার সময় হয়ে এল টেরও পেলাম না।

বাইরে বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি পড়ছে। সাপার খেতে যেতে ইচ্ছে করল না, তাই

ব্রডওয়েতে চললাম। ক্যাবেলের দোকানে পৌঁছতে পৌঁছতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেলাম। ভিতরে ঢুকলাম। এগিয়ে এল মার্টিন।

'তুমি এসেছ, খুশি হয়েছি,' বলল ও। 'সোডা খেলে কেমন হয়?' ফাউনটেইনের দিকে নিয়ে চলল আমাকে মার্টিন।

তবে আমি চকলেট নিলাম। খাওয়া শেষ করে বসে কথা বলতে লাগলাম। জানলাম আমার চেয়ে এক বছরের ছোট ও কিন্তু পাবলিক স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। কয়েক মিনিট পর একটা মেয়ে এসে হাজির হলো সেখানে, ওর সঙ্গে কথা বলল।

'জলদি করো, মার্টিন, নইলে সাপারের দেরি হয়ে যাবে,' মেয়েটা বলল ওকে। অনুমান করলাম মেয়েটা ওর বোন।

আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল মার্টিন: 'ফ্র্যাঙ্কি, ও আমার বোন, রুথ।'

'হ্যালে-া,' আমি বললাম।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' বয়েস পনেরোমত হবে, আর খুব সুন্দরী। সোনালি চুলগুলো অনেকটা ছেলেদের মত করে কেটেছে। মার্টিনের মতই নীল চোখ। আর ভাইয়ের মতই সরাসরি তাকিয়ে কথা বলে। সুন্দর সুগঠিত দেহ। হাই স্কুলে সিক্সথ গ্রেডে পড়ে। ওর চেয়ে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু হব আমি। আর মার্টিন যখন আমাকে জিজ্ঞেস করল আমার বয়েস কত, বলে দিলাম ষোলো, আশা করলাম তাতে আমার দিকে মনোযোগী হবে ওর বোন।

বিকেলে কী ঘটেছে বোনকে জানাল মার্টিন। ব্যাপারটা বোধহয় পছন্দ হলো না রুথের। আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল। আমার সম্পর্কে কী ভাবছে ও কে জানে, তবে মার্টিনকে কিছু জিজ্ঞেস করলাম না।

আমার দিকে তাকাল মার্টিন। 'মেয়েমানুষরা খুব আজব। যাকগে, বিকেলে যে আমাকে মারামারি শিখতে বলেছিলে, ভেবে দেখলাম শেখা উচিত, তাই দুটো দস্তানা কিনেছি। বক্সিং গ-াভ। আমাদের বাড়ি গিয়ে আমাকে শেখাবে?'

'আজ রাতে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নিশ্চয়ই,' বলল ও। 'সাপারের পর। বাড়ি চলে যাও এখন। সাপার খেয়ে চলো এসো আমাদের বাড়িতে, কি বলো?'

'পারব বলে মনে হয় না,' বললাম। 'এতিমখানায় থাকি আমি। সাপারের জন্যে একবার গিয়ে ঢুকলে আর বেরোতে পারব না।'

'অ,' ভ্রূকুটি করল ও। পুরো একটা মিনিট চুপ করে কী ভাবল। উজ্জ্বল হলো মুখ। 'একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। এখানে থাকো, আমি আসছি।' দৌড়ে দোকানের পিছন দিকে চলে গেল ও। কাঁচের বেড়ার ওপাশে ওকে দেখলাম ওর বাবার সঙ্গে কথা বলছে। আমার দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছে। ওর বাবা কী যেন বললেন। আমার কাছে ফিরে এল।

'ঠিক করে এলাম। আমার সঙ্গে যাবে তুমি, আমাদের বাড়িতেই সাপার খাবে। সাপার শেখাবে আমাকে।'

প্রথমে যেতে না চাইলেও শেষশেষ রাজি না হয়ে পারলাম না।

সেরাতে ওর বাবা-মা বাইরে চলে গেলেন। আমরা তিনজন–আমি, মার্টিন আর রুথকে খাবার দিয়ে গেল ওদের পরিচারিকা। মেয়েটার নাম জুলি, বয়েস বিশ-বাইশের মত হবে। ফ্রেঞ্চ-ক্যানাডিয়ান, অদ্ভুত টানে কথা বলে। সে-ও আমাদের সঙ্গে বসেই খেল। সাদাসিধে সহজ খাবার, কাজেই শেষ করতে দেরি হলো না আমাদের। খাওয়ার পর পারলারে চলে এলাম আমরা। একটা নতুন রেডিও আছে ওদের। খানিকক্ষণ গান শুনলাম আমরা। এই নিয়ে তৃতীয়বার রেডিওতে গান শুনেছি, আর শুনতে খুব ভাল লাগে আমার। ঘণ্টাখানেক পর মার্টিন বলল, এবার ডেন-এ গিয়ে বক্সিং শেখা যেতে পারে।

আমার কোন সমস্যা নেই। রুথ পারলারে রইল। বলল, বই পড়বে।

ডেনটা একটা সুন্দর ঘর। দেয়ালের তাকে প্রচুর বই সাজানো। একটা কাউচ আর কয়েকটা চেয়ার ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে। চেয়ারগুলো ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে জায়গা করে নিলাম আমরা।

'তোমার দস্তানা পরে নাও,' বললাম। তারপর শেখানো শুরু করলাম ওকে। কীভাবে বাঁয়ে মারতে হয়, ডানে মারতে হয়, পিছিয়ে গিয়ে ঘুসি এড়াতে হয় শিখিয়ে দিলাম। 'নাও, এখন আমাকে মারো দেখি।'

'না, তোমাকে জখম করতে চাই না,' বলল ও।

'ভয় নেই,' আমি বললাম: 'জখম আমাকে করতে পারবে না।'

ঘুসি চালাল ও। সহজেই সেটাকে রুখে দিয়ে বললাম: 'উঁহুঁ, হলো না। এভাবে মারো,' বলে দেখিয়ে দিলাম। ' জায়গা রাখবে না। কোনমতেই প্রতিপক্ষকে মারার সুযোগ দেবে না।' আরও দুবার আমাকে মারার সুযোগ দিলাম ওকে। দুবারই ব্যর্থ হলো ও।

লাগাতে না পারার কারণটা শিখিয়ে দিলাম ওকে।

আবার প্র্যাকটিস শুরু করলাম আমরা। দরজা খুলে গেল। কে ঢুকেছে দেখার জন্য ফিরে তাকালাম। রুথ। আমি ওকে দেখছি, এই সুযোগে আমার কাঁধে ঘুসি লাগিয়ে দিল মার্টিন। নিজের অজান্তেই স্বয়ংক্রিয় ভঙ্গিতে কখন যে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর বাঁ চোখে মেরে বসলাম, বলতে পারব না। মেঝেতে পড়ে গেল ও।

ওর কাছে দৌড়ে গেল রুথ। উঠে বসেছে মার্টিন। আমার দিকে ফিরে তাকাল রুথ। গর্জে উঠল: 'জানোয়ার কোথাকার! মারামারি করার জন্যে নিজের সমান একজনকে খুঁজে নাও না কেন?'

বোকা হয়ে গেছি। কথা বেরোচ্ছে না মুখ দিয়ে।

'এটা ওর দোষ নয়, রুথ,' মার্টিন বলল। 'আমাকে বক্সিং শেখানোর জন্যে আমিই ওকে নিয়ে এসেছি।'

'কিন্তু তোমার চোখ,' প্রায় ককিয়ে উঠল রুথ: 'দেখো, কেমন ফুলে উঠছে। কালো হয়ে যাচ্ছে চারপাশ।'

আমিও দেখলাম। বুঝতে পারছি, আগামী কাল একটা দেখার মত অবস্থা হবে।

অবশেষে কথা বেরোল মুখ দিয়েঃ 'সরি, মার্টিন। এত জোরে মারতে চাইনি, [illegible] যে লেগে গেল!' ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম।

'যাকগে, এটা নিয়ে মন খারাপ কোরো না,' হেসে বলল মার্টিন।

হট্টগোল শুনে ঘরে এসে ঢুকল জুলি। 'একটা তোয়ালে ভিজিয়ে চাপা দাও,' বলল ওঃ 'নইলে ফুলে যাবে।'

ঝাড়া মেরে হাত থেকে দস্তানা খুলে ফেলল ও। 'যাচ্ছি। শীঘ্রি আবার একদিন প্র্যাকটিস করব।' দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল: 'এখানেই থাকো। আমি আসছি।'

চলে গেল ও। পিছনে রুথ। কয়েক সেকেন্ড পর বাথরুমে পানি পড়ার শব্দ শুনলাম।

আমার হাতে দস্তানা পরাই রয়েছে। মেঝেতে পড়ে থাকা মার্টিনের দস্তানা দুটো তুলে নিল জুলি। বলল: 'আমি চেষ্টা করে দেখি?'

'তোমার ইচ্ছে,' বললাম।

পরে নিল ও। 'আরাম লাগে না।'

'পরতে পরতে অভ্যাস হয়ে যায়,' আমি বললাম।

'আমার বাবা বলে আমার ছেলে হওয়া উচিত ছিল,' ও বলল। 'সব সময় টমবয় হয়ে থাকি আমি।'

জবাব দিলাম না।

'কীভাবে বক্সিং খেলতে হয় আমাকে শেখাও, ফ্র্যাঙ্কি,' মেয়েটা বলল।

'বেশ,' আমি বললাম।

'তবে আমাকে মেরো না,' তাড়তাড়ি বলল ও। 'ব্যথা পাওয়ার আমার বড়ই ভয়, বিশেষ করে এখানে।' বুকে হাত দিল ও।

তাকিয়ে রইলাম। জবাব দেয়ার আগে ঢোক গিললাম। 'ঠিক আছে। কয়েকবার আমাকে ঘুসি মারো, লাগানোর চেষ্টা করো।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল ও। দুবার ঘুসি চালাল। মিস করল। এগিয়ে এল আরও কাছে। আবার ঘুসি মারল। অনায়াসে ঠেকিয়ে দিলাম আমি। এতটা কাছাকাছি থেকে একটা মেয়ের সঙ্গে বক্সিং লড়তে বিচিত্র অনুভূতি হচ্ছে আমার। এতই কাছে চলে এল ও, বুকে বুক ঠেকে গেল আমাদের। উত্তেজিত হয়ে পড়ছি।

'তোমার গায়ে ভীষণ জোর,' আমার গায়ের সঙ্গে চেপে এল ও।

ওর দিকে তাকালাম। আমার চেয়েও লম্বা। কালো চুল। চওড়া মুখ। চোখ দুটো কেমন যেন। একটা সেকেন্ড ওভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম দুজনে, তারপর হুঁশ হলো রুথ দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। জোর করে যেন জুলির বুকের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলাম।

মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে আমার। রুথের দিকে তাকিয়ে কৈফিয়তের সুরে বললাম: 'ও আমাকে বক্সিং শেখাতে বলছিল।' খোঁড়া যুক্তি, জানি। কান গরম হয়ে যাচ্ছে আমার।

'বক্সার জিন টুনির ওস্তাদ হয়ে গেছ তুমি, তাই না?' তিক্তকণ্ঠে ব্যঙ্গ করল রুথ। 'মার্টিন তোমাকে ডাকছে।'

দস্তানা খুলে নিয়ে জুলির হাতে দিলাম। রুথের পিছন পিছন চলে এলাম মার্টিনের ঘরে। বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে আছে ও। ভেজা তোয়াল চাপা দিয়ে রেখেছে চোখে।

'যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দুঃখিত, ফ্র্যাঙ্কি। কাল আবার আমার বাবার দোকানে দেখা করো। কথা আছে।'

'ঠিক আছে, মার্টিন,' আমি বললাম। 'তোমাকে জখম করার জন্যে আমিও দুঃখিত। কাল দেখা করব,' বলে ঘুরে রওনা হয়ে গেলাম।

দরজার কাছ পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিল রুথ। দরজা খুলে দিল। 'গুড নাইট, রুথ,' বলে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

'গুড নাইট,' বলে আমার পিছনে পাল-টা লাগিয়ে দিতে গেল ও। অর্ধেক লাগিয়ে বলল: 'আমার একটা কথা শুনবে?'

'বলো?'

'আমার ভাইয়ের কাছ থেকে দূরে থাকবে। তুমি একটা সস্তা, নোংরা, পচাগলা জিনিস, আমার ভাইকে নষ্ট করে ফেলবে।' ভয়ঙ্কর স্বরে কথাগুলো বলে দড়াম করে পাল-টা লাগিয়ে দিল ও।

ধীরে ধীরে হেঁটে চললাম হলওয়ে ধরে।

'শোনো,' কাউকে ডাকতে শুনলাম। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, জুলি, আমার সামনে একটা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

'এসো,' ফিসফিস করে বলল ও। হাত নেড়ে ইশারা করল। ওকে অনুসরণ করে দরজার অন্যপাশে এলাম। রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে আমাকে দূরের একটা ঘরে নিয়ে এল ও। দরজা লাগিয়ে দিল।

'এটা আমার ঘর,' ফিসফিস করে বলল ও। 'চুপ থাকবে।'

আমাকে চুপ থাকতে বলছে ও। কী কাণ্ড! উত্তেজনায় কথা বেরোল না আমার মুখ দিয়ে। নীরবে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। আলো নিভিয়ে দিল ও। আমার কাছে এসে দাঁড়াল। গলা জড়িয়ে ধরে আমাকে চুমু খেল। ওর সারা গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমার হাত। ছোট বিছানাটায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ও।

'ভীষণ জোর তোমার গায়ে,' ও বলল।

মাঝরাতে ওকে ছেড়ে বেরিয়ে এলাম আমি। ঘামে ভেজা শরীরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হলো, হ্যাঁ, এখন আমি একজন পুরুষ মানুষ। তবে আমি একটা গাধা। বয়েস এখনও চোদ্দও হয়নি, এর মাঝেই এমন এক কাণ্ড করে ফেলেছি যেটা আমাকে মানায় না।

ছয়

শনিবারের সকালে দোকানে আমাকে একা রেখে বেরিয়ে গেল কেওয়াফ। বউ-বাচ্চাকে ট্রেনে তুলে দিতে গেছে। গ্রামে চলে যাবে ওরা। গ্রীষ্মকালটা ওখানেই কাটাবে।

টেবিলগুলো পরিষ্কার করলাম। বিয়ারের বাক্সে বরফ ভরলাম। ঝাড়ু দিয়ে চকচকে করে ফেললাম দোকানটা। টয়লেট পরিষ্কার করলাম, শোকেসের কাঁচ পরিষ্কার করলাম যেখানে সিগারেটের বাক্স রাখা হয়, আর এখন ধুচ্ছি জানালাগুলো। কালো রঙ করে কাঁচের নীচের অর্ধেকটা ঢাকা যাতে ভিতরে দেখতে না পারে কেউ, আর প্রতিটি কাঁচে ছোট ছোট কালো অক্ষরে লেখা: বিলিয়ার্ড। ব্রাশ ও পানি দিয়ে কাঁচের ময়লা সাফ করে কাপড় দিয়ে মুছে দিচ্ছি।

আমি যখন কাজ করছি, জেরি আর রে এল রাস্তা ধরে। আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

'বাপরে!' রে বলল। 'তুই তো ওস্তাদ হয়ে গেছিসরে! পেশাদার জানালা মোছাওয়ালার চেয়ে ভাল।'

'আসলে মোছার কায়দা আছে,' গর্বের সঙ্গে জবাব দিলাম। 'কীভাবে এগুলো ব্যবহার করতে হয় জানতে হবে,' ব্রাশ ও কাপড়গুলো দেখালাম। শেষবারের মত মুছে নিয়ে কাজ শেষ করলাম। বালতি, ব্রাশ আর অন্যান্য জিনিসগুলো তুলে নিয়ে স্টোরের দিকে পা বাড়ালাম। 'আয়, ভিতরে আয় তোরা। কেওয়াফ নেই।'

দোকানে ঢুকল ওরা। এই প্রথম ঢুকেছে এখানে। ছোটদের ঢোকা বারণ।

'জুয়াড় টেবিলে আমাদেরকে বল ছুঁড়তে দিবি, ফ্র্যাঙ্কি?' রে জিজ্ঞেস করল।

'না রে ভাই, অসুবিধে আছে। বড়রা ছাড়া খেলা নিষেধ। এই যে দেখ, লিখে রেখেছে।' ক্যাশ রেজিস্টারের ওপরের লেখাটা দেখালাম ওদের: ছোটদের জন্য নিষেধ।

'বিকেলে সাঁতার কাটতে যাবি?' জেরি জিজ্ঞেস করল।

'যেতে তো ইচ্ছেই করছে,' বললাম। 'বিকেলে যদি এখান দিয়ে যাস, আর আমার কোন কাজ না থাকে, তাহলে হয়তো যেতে দেবে জিমি।'

'ঠিক আছে,' জেরি বলল। 'ডকে যাওয়ার সময় এখানে হয়ে যাব।'

খুব গরম পড়ল বিকেলবেলা। কেওয়াফও ফিরল স্টেশন থেকে। মেজাজ ভাল। শিস দিচ্ছে। গানের সুরে বলতে লাগল: 'আমার স্ত্রী গ্রামে বিদেয় হয়েছে, হুররে, হুররে!' ব্যস্ততা নেই। তাই ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আমাকে ছুটি দিল ও।

তিনজনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললাম ফিফটি-ফোর্থ ডকের দিকে। রাস্তার ওপারে মার্টিনকে দেখলাম। ডাকলাম: 'এই, মার্টিন!'

আমাদের কাছে এল মার্টিন। ওর সঙ্গে আমার দুই বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমাদের সঙ্গে সাঁতার কাটতে যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম।

'যাব,' ও বলল: 'অন্যরা যদি কিছু মনে না করে।'

'আরে নাহ্!' বললাম। 'তুমি গেলে বরং খুশিই হবে।'

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম ডকে প্রচুর ভিড়। কয়েকজন আমার পরিচিত। সঙ্গীদেরসহ প্যাট স্যানপেরোও আছে। ও কিছু বলল না আমাকে, আমিও তাকালাম না। ডকের নীচে নেমে আমাদের কাপড়চোপড় খুলে ফেললাম। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে। ডকের কাছে পানি গরম আর নোংরা, ড্রেনের সমস্ত ময়লা এসে পড়ে এখানে, তবে সাঁতরে কিছুটা দূরে সরে গেলেই পরিষ্কার পানি পাওয়া যায়। দাপাদাপি করে পরস্পরকে পানি ছিটালাম আমরা কিছুক্ষণ। তারপর আমি বললাম: 'উড়ে গিয়ে যদি ডকে উঠতে পারতাম, ভাল হতো, কিনারের ময়লা গায়ে লাগত না।'

জেরি বলল: 'আমার সঙ্গে গ্রামে গেলে লেকে সাঁতার কাটতে পারবে। একদম ময়লা নেই।'

মাথার ওপর দিয়ে একটা অ্যারোপে-ন উড়ে গেল। ওটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমরা। রে বলল: 'রিকেনবেকার গেল নাকি কে জানে।'

'তা কী করে যাবে,' আমি বললাম। 'ও তো মরে ভূত হয়ে গেছে কবে।'

'না, মরেনি,' মার্টিন বলল। 'ও বেঁচে আছে। জার্মান ফ্লাইং সার্কাসের সেরা পাইলট ফন রিকটোফেনকে গুলি করে নামিয়েছে।'

'আমেরিকান অ্যারোপে-ন দুনিয়ার সেরা,' রে বলল। 'আমেরিকান পাইলটদেরও তুলনা নেই।'

পানিতে চিত হয়ে ভেসে থেকে ফেরি আর হাডসন রিভারের বোটগুলোকে যেতে দেখলাম খানিকক্ষণ। তারপর পানি থেকে উঠে ডকের ওপর শুয়ে পড়লাম রোদে গা মেলে দিয়ে। পুরো উলঙ্গ, তবে রাস্তা থেকে অনেক দূরে, কেউ দেখতে পাবে না। চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়ে থাকলাম ওখানে। রোদের খুব তেজ, তাই আমার শার্টটা দিয়ে রাখলাম মুখের ওপর।

একটা ছায়া পড়ল আমার ওপর আর একটা কণ্ঠকে বলতে শুনলাম: 'হতচ্ছাড়া এই ইহুদিটাকে আমাদের ডকে ঢুকতে দিল কে?'

নিশ্চয় মার্টিনের কথা বলছে, তাই কোন কথা না বলে কী ঘটে দেখার জন্য চুপচাপ পড়ে থাকলাম।

'এই, দোস্তরা,' চেঁচিয়ে উঠল কণ্ঠটা: 'এসো, মজা দেখো, ইহুদি দিয়ে কী বানানো যায়।'

দুই জোড়া পদশব্দ এসে আমার কিনারে থামতে শুনলাম।

'অবস্থাটা কী দেখো!' বলল একজন। 'দারুণ দেখাচ্ছে এই ন্যাংটোগুলোকে, তাই না?' হেসে উঠল ওরা সবাই।

'এই ইহুদি, ওঠ,' বলল প্রথম কণ্ঠটা। 'দেখি, তোর চেহারাটা কেমন।' এক মিনিট নীরবতা। তারপর আমার গায়ের একপাশে জুতোর ডগা দিয়ে খোঁচা মারল ও। বলল: 'তোকে বলছি। বুঝিস না কার সঙ্গে কথা বলছি?'

মুখের ওপর থেকে শার্ট সরিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। জেরি, রে আর মার্টিন বসে আছে আমার পাশে, আমার দিকে তাকিয়ে। প্যান্ট পরে নিয়েছে মার্টিন। ছোট বেলায়ই পুরুষাঙ্গের মাথার পাতলা চামড়া কেটে বাদ দেয়া হয়েছে আমার। তাই বুঝলাম আমাকেই বলছে ওরা। উঠে দাঁড়িয়ে যে আমাকে উত্যক্ত করছে তার মুখোমুখি হলাম। কখনও দেখিনি আর ওকে। নাম বললাম: 'কেইন, আমার নাম ফ্র্যান্সিস কেইন। আমি ইহুদি নই। আর কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ, ও ঠিকই বলছে,' একটা ছেলে বলল। 'সেইন্ট টেরেসিতে থাকে ও।'

'হুঁ,' বলল আমার সামনে দাঁড়ানো ছেলেটা। 'সরি, বিরক্ত করলাম। আসলে ইহুদিদের আমি দেখতে পারি না। এখানে যদি দেখি কোনটাকে, লাথি মেরে ডক থেকে ফেলে দেব।'

আমি জবাব দেবার আগেই আমার সামনে এসে দাঁড়াল মার্টিন। 'আমি ইহুদি,' শান্তকণ্ঠে বলল ও। 'দেখি, লাথি মেরে ফেলো তো আমাকে।'

ছেলেটা মার্টিনের চেয়ে সামান্য লম্বা। পানির দিকে পিছন করে আছে মার্টিন। হঠাৎ ওর দিকে ছুটে এল লম্বা ছেলেটা। ঠেলা দিয়ে মার্টিনকে পানিতে ফেলে দেয়ার ইচ্ছে। শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়াল মার্টিন। ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেল ছেলেটা, নিজেকে থামাতে না পেরে ঝপাং করে পড়ে গেল পানিতে। হেসে উঠলাম আমি। বাকি সবাই হাসতে লাগল।

ডকের কিনার দিয়ে ঝুঁকে পানিতে পড়া ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বললাম: 'ইহুদিটা তোমার চেয়ে চালাক, তাই না?'

আমার গাল দিতে দিতে উঠে আসার চেষ্টা করল ছেলেটা। কিন্তু তাড়াহুড়া করতে গিয়ে আবার পড়ে গেল পানিতে। আবার হেসে উঠলাম। এই সময় চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ: 'এই দেখো দেখো, একজন মহিলা আসছে এদিকে!' আমাদের যার যার পরনে কাপড় নেই, তাড়াতাড়ি পানিতে লাফিয়ে পড়লাম।

পরে মহিলা চলে গেলে পানি থেকে উঠে এলাম আমরা। কাপড় পরে বললাম: 'এবার যেতে হবে আমাকে, কাজ পড়ে আছে।'

নীরবে টেন্‌থ্ অ্যাভেনিউয়ের দিকে এগিয়ে চললাম আমরা।

জুয়ার আড্ডার দরজার কাছে এসে জেরি বলল: 'কাল গির্জার উপসনা সেরে আমাদের বাড়িতে আসছিস তুই, আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে, ভুলিস না কিন্তু।'

দোকানে ঢুকলাম। কেওয়াফকে দেখলাম অতিরিক্ত ব্যস্ত, গরমে ঘামছে আর পাকির মত পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল: 'সেলার থেকে বিয়ার নিয়ে এসো, জলদি যাও। গরমে গলা শুকিয়ে গেছে সবার।'

সাত

রোববারে আড্ডা বন্ধ রাখে কেওয়াফ। সকালটা আমাকে গির্জায় কাটাতে হয়। সাধারণত বারোটার দিকে এতিমখানায় ফিরে যাই, ডিনার খাওয়ার জন্য, বাকি সময়টা বাইরে কাটাই। কখনও সিনেমায় যাই, কখনও বা পোলো গ্রাউন্ডে। এই রোববারে জেরিদের বাড়িতে যাব ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

জেরির বাবা নিউ ইয়র্কের মেয়র, মস্ত ডেমক্র্যাট, জনগণের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, কিন্তু আমি ওঁকে দেখতে পারি না। বহুকাল আগে, জেরি কাউয়ানের সঙ্গে তখনও পরিচয় হয়নি আমার, একবার আমাদের এতিমখানায় থ্যাংকসগিভিং ডিনারে এসেছিলেন তিনি। চমৎকার একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন যার কিছুই আমরা ছোটরা বুঝতে পারিনি, আর তাতে কোন দুঃখও ছিল না আমাদের। প্রচুর পরিমাণ মুরগীর মাংসে পেট তখন ভর্তি আমাদের। আমার বয়েস তখন নয়। তাঁর ওভারকোটের পকেটে রাখা সিগারেট আনতে আমাকে সুপারিনটেনডেন্টের অফিসে পাঠিয়েছিলেন। আমি তাঁর হাতে প্যাকেটটা দিলে চকচকে একটা সিকি দিয়ে আমাকে বলেছিলেন: 'এটা তোমার মত ভাল ছেলের পুরস্কার।'

'থ্যাংক ইউ,' মুদ্রাটা নিয়ে বিড়বিড় করে বলেছিলাম। তারপর সেই কাজটাই করেছিলাম টিচার আমাদের যা শিখিয়েছেন, মুদ্রাটা নিয়ে গিয়ে গির্জার দানবাক্সে রেখে দিয়েছিলাম।

মিস্টার কাউয়ান সেটা দেখেছিলেন। বলেছিলেন: 'এ তো সাংঘাতিক ভাল ছেলে।' আমাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন: 'তোমার নাম কী, ইয়াং ফেলা?'

'ফ্র্যান্সিস কেইন, সার,' জবাব দিয়েছিলাম।

'এই নাও, ফ্র্যান্সিস, গির্জার জন্যে আরও পাঁচ ডলার, আর এই টাকাটা বাক্সে ফেলার আগেই আমাকে বলো তো এই ক্রিসমাসে তুমি কী চাও?'

'একটা ইলেকট্রিক ট্রেন, সার।'

'একটা ইলেকট্রিক ট্রেনই পাবে তুমি এবার, মাই বয়। বাড়িতে তোমার বয়েসী একটা ছেলে আছে আমার, আর তারও চাওয়া একটা ইলেকট্রিক ট্রেন। দুজনেই দুটো ট্রেন পাবে।' হেসে আমার হাতে পাঁচ ডলারের নোটটা ধরিয়ে দিলেন তিনি গির্জার দানবাক্সে রাখার জন্য।

এরপর দিন গোনার পালা শুরু হলো আমার, কবে ক্রিসমাস আসবে, আর কবে আমি ইলেকট্রিক ট্রেনটা পাব। ক্রিসমাসের দিন সকালে ডাইনিং রুমে বিগ ট্রি'র কাছে গেলাম, ইলেকট্রিক ট্রেনটা দেখব এই আশায়, কিন্তু দেখলাম না। ভাবলাম, এখনও এসে পৌঁছায়নি। কল্পনাই করিনি তিনি ভুলে যাবেন। দিন গড়িয়ে গেল, কিন্তু ইলেকট্রিক ট্রেন আর এল না।

রাতে বিছানায় যাবার আগে আশা ছাড়তে পারলাম না। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকলাম।

হলে টহল দিতে এসে আমার ফোঁপানি কানে গেল ব্রাদার বার্নহার্ডের। দেখতে এলেন তিনি। উষ্ণ আন্তরিক কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: 'কী হয়েছে, ফ্র্যান্সিস?' বিছানায় উঠে বসে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাঁকে জানালাম আমার দুঃখের কথা।

শান্তভাবে শুনলেন তিনি। তারপর বললেন: 'ফ্র্যান্সিস, এত সামান্য একটা জিনিসের জন্যে এভাবে কেঁদো না। বরং ভালবাসার জন্যে কাঁদো। যেটা আমরা দিতে জানি না। আর তা ছাড়া, গত এক মাস ধরে ফ্লোরিডায় রয়েছেন অ্যালডারম্যান কাউয়ান। বড় বড় কাজ নিয়ে নিশ্চয় এতটাই ব্যস্ত তোমার কথা হয়তো মনেই নেই।'

আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। 'এখন ঘুমাও। কাল সকালে তোমাকে সেন্ট্রাল পার্কে নিয়ে যাব, স্লে-জ রাইডে চড়ানোর জন্যে। কী পরিমাণ তুষার পড়ছে জানালার কাছে গেলেই দেখতে পাবে।'

জানালার কাঁচে কপাল ঠেকিয়ে দাঁড়ালাম। সত্যিই, প্রচুর তুষারপাত হচ্ছে। কান্না থামল আমার। চোখের পানি শুকাল। বিছানায় ফিরে এলাম। ব্রাদার বার্নহার্ডের কথা কানে এল হল থেকে, কাউকে বলছেন: 'ভোটারদেরকে কথা দিয়ে কথা রাখে না ওই রাজনীতিবিদগুলো, সেটা নিয়ে অবশ্য আমি আর এখন মাথা ঘামাই না, কিন্তু একটা বাচ্চাকে এভাবে দুঃখ দেয়াটা মোটেও উচিত হয়নি ওই বদমাশটার।'

তারপর হলের আলো নিভে গেল। একটা বাচ্চা ছেলের পক্ষে যতখানি ঘৃণা করা সম্ভব ততটাই ঘৃণা জন্মাল অ্যালডারম্যান কাউয়ানের ওপর।

জেরির সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হলো, ওর বাবা ইলেকশনে জিতে মেয়র হওয়ার অল্প আগে, কী করব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। খুবই আন্তরিক আর পছন্দ করার মত ছেলে ও, বুঝতেই পারেনি প্রাইভেট স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেইন্ট টেরেসিতে ট্র্যান্সফার করার কারণটা আসলে ওর বাবার চালাকি ছিল, রাজনৈতিক চালাকি। ওকে আমি পছন্দ করেছিলাম। ওর বাবাকে দেখতে না পারার আক্রোশটা ওর ওপরও পড়বে কিনা বুঝতে পারিনি।

তাই একটা পরীক্ষা করলাম। মারামারির প্রস্তাব দিলাম ওকে। ও রাজি। মারপিটের মাঝামাঝি পর্যায়ে কেউ যখন পিছ পা হতে রাজি হচ্ছিলাম না, কেউ কারও চেয়ে কম যাচ্ছিলাম না, দুজনেই সমান সমান, হাত গুটিয়ে নিয়ে সরলভাবেই বলে দিয়েছিলাম: 'বাদ দাও তো এবার! আমি তোমাকে পছন্দ করি!'

এ রকম একটা কাণ্ড কেন করেছিলাম বলিনি ওকে। ও হয়তো ভেবেছিল আমার মাথায় সামান্য গণ্ডগোল আছে। আন্তরিক ভঙ্গিতে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল: 'শুনে খুশি হলাম। আমিও তোমাকে পছন্দ করি।'

এরপর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা। সেটা এক বছর আগের কথা। ওর বাবাকে আমি পছন্দ করি না এ কথা কখনও বলিনি ওকে। বন্ধুত্বটা বজায় রয়েছে আমাদের। এখন আমাকে বলছে ওর সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যেতে।

যা-ই হোক, আমাকে নিয়ে যেতে এল ও। হেসে জিজ্ঞেস করল: 'রেডি, ফ্র্যাঙ্কি?'

'হ্যাঁ,' ঘোঁতঘোঁত করে জবাব দিলাম, বিরক্তই লাগছে আমার।

'তাহলে আর দেরি কীসের? চল, যাই।'

আমাদের দরজা খুলে দিল একজন খানসামা। 'হ্যালে-া, মাস্টার জেরি,' বলল ও।

'বাবা কোথায়, রবার্ট?' জেরি জিজ্ঞেস করল।

'লাইব্রেরিতে, মাস্টার জেরি। আপনাদের অপেক্ষাই করছেন।'

জেরির পিছন পিছন লাইব্রেরিতে ঢুকলাম। ওর বাবা-মা ওখানেই রয়েছেন। ওর বাবার মুখে সেই চিরাচরিত হাসি, চোখেও মিটিমিটি হাসি। জেরির সঙ্গে তাঁর হাসির মিল বিস্মিত করল আমাকে। তবে বাবার মত শিশুসুলভ ঠোঁট নয় ওর, বরং মায়ের সঙ্গে মিল বেশি। মায়ের মতই শান্ত, কোমল মুখ।

'এতক্ষণে এলে!' ওর বাবা বললেন। 'আমরা সেই কখন থেকে বসে আছি।'

'থ্যাংকস, ড্যাড,' জেরি বলল। আমাকে দেখাল। 'এই আমার বন্ধু ফ্র্যাঙ্কি, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।'

ঘুরে আমার দিকে তাকালেন ওর বাবা-মা। হঠাৎ করেই আমার তালিমারা প্যান্ট-শার্ট আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' আমার কাছে এসে হাত মেলালেন জেরির বাবা।

কী বললাম মনে নেই। খানসামা এসে জানাল খাবার দেয়া হয়েছে। সবাই মিলে ডাইনিং রুমে গেলাম আমরা।

মস্ত একটা চারকোণা টেবিলের মাঝখানে প্রায় গামলার সমান একটা ফুলের বোল। ওপাশে যে বসবে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে মাথা উঁচু করে ওটার ওপর দিয়ে, কিংবা পাশ দিয়ে, কিংবা ফুলগুলোর নীচ দিয়ে তাকিয়ে বলতে হবে। ছুরি, চামচ, কাঁটা চামচ স্তূপ হয়ে আছে, এত দিয়ে কী হবে বুঝতে পারলাম না। খাওয়া শুরু হলো। সবার শেষে এল আইসক্রিম। লাইব্রেরিতে ফিরে এলাম আমরা।

'জেরি বলল তুমি নাকি ওর সঙ্গে গ্রামে যেতে চাও,' মিস্টার কাউয়ান বললেন আমাকে।

'হ্যাঁ, সার,' জবাব দিলাম। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আমি যেতে পারব না।'

'কেন পারবে না?' মিস্টার কাউয়ান জানতে চাইলেন। 'সেটা কি এতিমখানার নিয়মের বাইরে?'

'না, সার। গ্রীষ্মে একটা চাকরি নিয়েছি আমি, আর সেটা ছাড়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

'কিন্তু প্রচণ্ড গরমে শহরে থাকার চেয়ে গ্রামে গেলে অনেক আরাম পাবে,' মিসেস কাউয়ান বললেন।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম, আমি জানি,' আমি তাঁকে আহত করতে চাইলাম না। মহিলাকে আমার ভাল লেগেছে। 'কিন্তু আমার কিছু চাহিদা আছে। জিনিসপত্র কিনতে হবে। তা ছাড়া

সেপ্টেম্বরে আমি হাই স্কুলে যাব, লেখাপড়ার জন্যে টাকা দরকার। আমি কী বলতে চাই বুঝতে পারছেন...মানে, আমি অন্যদের মত হতে চাই না, সব সময় ভিক্ষের টাকার ওপর নির্ভর করা। আমি দুঃখিত, ম্যা'ম, শক্ত কথা বলে ফেলেছি।'

কাছে এসে আমার হাতটা তুলে নিলেন তিনি। 'না, মোটেও শক্ত কথা বলনি তুমি, ফ্র্যাঙ্কি; বরং তুমি অনেক ভাল ছেলে।'

কী জবাব দেব বুঝতে পারলাম না। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে গেলেন মিসেস ও মিস্টার কাউয়ান। কোথাও একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ওঁদের। জেরির সঙ্গে ওর ঘরে গেলাম।

কিছুক্ষণ এটাওটা নিয়ে কথা বললাম আমরা। তারপর জেরি বলল: 'চিলেকোঠায় যাবে চল। ওখানে খেলার ব্যবস্থা আছে। চল, একটু আনন্দ করা যাক।'

ঘরে ঢুকে প্রথমেই যে জিনিসটা চোখে পড়ল আমার, সেটা হলো একটা মস্ত ইলেকট্রিক ট্রেন। সাংঘাতিক জিনিস। রেললাইন, পুল, সুড়ঙ্গপথ, সুইচবোর্ড, আর তিনটে লোকোমোটিভ ইঞ্জিন সব সেট করা রয়েছে। বলে উঠলাম: 'আরিব্বাবা, কী জিনিসরে!'

'হ্যাঁ,' জেরি বলল: 'তিন বছর আগে ফ্লোরিডা যাবার আগে আমাকে কিনে দিয়েছিল বাবা। খেলবে?'

চুপ করে পুরো একটা মিনিট ওটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। গোগ্রাসে গিলছি যেন খেলনাটাকে। নিজের অজান্তেই পায়ে পায়ে এগোলাম ওটার দিকে। হঠাৎ করেই যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেলাম। চকিতে একটা কথা খেলে গেছে আমার মনে। নিজের ছেলের উপহারটার কথা তো ভোলেননি মিস্টার কাউয়ান।

'না,' চেঁচিয়ে বললাম, অদ্ভুত এক আবেগে গলা কাঁপছে আমার, কেমন বোকাই মনে হলো নিজেকে। 'ভীষণ গরম লাগছে এখানে। চল, সাঁতার কাটতে যাই।'

আট

পরের টার্ম থেকেই হাই স্কুল শুরু হবে আমার। হাইটসের জর্জ ওয়াশিংটন হাই স্কুলে পড়তে যাবে জেরি, আমি ঠিক করলাম আমিও ওখানেই যাব। মার্টিনও সেখানে যাবে ঠিক করেছে। কীজন্য যাব জানি না, কারণ স্কুল আমার ভাল লাগে না, মনে হয় অশুভ জায়গা। সতেরো বছর বয়েসে যখন বৈধভাবে আমাকে এতিমখানা থেকে ছেড়ে দেয়া হবে, স্কুল ছেড়ে দেব। আমার ইচ্ছা জুয়াড়ি আর বুকি হওয়া, তাতে ধনী হতে পারব।

সেইন্ট টেরেসি থেকে ডিগ্রি নেয়া কঠিন হলো না। মস্ত একটা হলঘরে সবাই জমায়েত হয়েছি আমরা, ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েরা এসেছেন, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষকরা উপস্থিত আছেন। তিনজনে তিনটে বক্তৃতা দেয়ার পর ডিপে-মা সার্টিফিকেট বিতরণের পালা শুরু হলো।

আরও অনেকের মত আমাকেও ডাকা হলো। মঞ্চে গিয়ে উঠলাম। উপহার দিতে যাঁকে বিশেষ অতিথি হিসেবে ডেকে আনা হয়েছে, তিনি মনসিইনর, আমার হাতে ডিপে-মা সার্টিফিকেট তুলে দিলেন। মঞ্চ থেকে নেমে ফিরে গেলাম আগের জায়গায়। অনুষ্ঠান শেষে চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম ছাত্রছাত্রী ও তাদের বাবা-মায়েদের। সবাই হাসিখুশি, গর্বিত।

আমার কেউ নেই। আমি একা। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হতে থাকল। প্রচুর ভিড়। ওদের জন্য আমাকে দেখতে পাচ্ছে না জেরি। দরজার দিকে পা বাড়ালাম। এখানে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। বাইরে গেলেই ভাল লাগবে মনে হলো। আমার কাঁধে হাত রাখল কেউ। ফিরে তাকালাম। ব্রাদার বার্নহার্ড। সঙ্গে রয়েছেন ফাদার কুইন। দুজনেরই মুখে হাসি।

'কংগ্র্যাচুলেইশন!' বাজখাঁই কণ্ঠে বলে উঠলেন ব্রাদার।

তার কথার প্রতিধ্বনি করলেন ফাদার কুইন।

হঠাৎ করেই হাসি ফুটল আমার মুখে। চোখের পাতার নীচে বেরিয়ে আসা নোনা পানি জ্বালা ধরাল। একটা মুহূর্ত কোন কথা বলতে পারলাম না।

স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ব্রাদার বার্নহার্ড। একেক সময় আমার মনে হয় তিনি যেন আমার মনের ভিতরটা পড়ে ফেলতে পারেন। 'তুমি ভেবেছিলে কেউ আসব না আমরা?'

আমাকে জবাব না দেয়ার সুযোগ দিয়েই বলে গেলেন: 'এই ডিগ্রির পর আমাদের একটা ছেলেকে আমরা হারালাম, তাই না, ফাদার?'

'মোটেই না, ওকে আমরা ঠিকই পাব,' জবাব দিলেন ফাদার কুইন। 'তোমার জন্যে আমাদের গর্বের সীমা নেই, ফ্র্যাঙ্কি।'

অবশেষে ভাষা খুঁজে পেলাম আমি। সাধারণত যে স্বরে কথা বলি, সেটা নয়,

অন্যরকম শোনাল আমার গলাটা: 'থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।'

আমার কাঁধে হাত রাখলেন ব্রাদার বার্নহার্ড। দরজার দিকে এগোলাম আমরা। আবার মন ভাল হয়ে গেছে আমার। বাইরে এসে আমার সঙ্গে হাত মেলালেন ফাদার কুইন। আমার শুভ কামনা করে গির্জার দিকে রওনা হলেন। ব্রাদার বার্নহার্ডের সঙ্গে আমি এতিমখানার দিকে এগোলাম।

নীরবে আঙিনায় ঢুকলাম আমরা। হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিলেন ব্রাদার। 'ফ্র্যান্সিস, তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছি।' হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

অবাক হয়ে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাঁর হাতের প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'তোমার জন্যে,' জিনিসটা আমার দিকে আরেকটু বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'নাও।'

প্যাকেটটা নিয়ে খুললাম। একটা হাতঘড়ি। ঢোক গিললাম। উঁচু করে ধরলাম জিনিসটা। রোদের আলো ঝিলিক দিয়ে গেল ওটার ওপর। খুব সুন্দর। কাঁপা হাতে ফিতেটা বাঁধলাম আমার কব্জিতে।

'পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'পছন্দ হয়েছে মানে!' উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলাম। 'সারা জীবনে কোন জিনিস এত পছন্দ হয়নি আমার।'

হেসে আমার হাতটা তুলে নিলেন তিনি। একসঙ্গে মস্ত, ধূসর বাড়িটতে প্রবেশ করলাম আমরা।

নয়

সেই প্রথম গ্রীষ্মকাল, যেবারে অনেক বেশি লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো আমার। লোকের সঙ্গে কীভাবে মিশতে হয় শিখলাম। শিখলাম, কীভাবে রসিকতা করতে হয়, হাসতে হয়, কথায় কথায় অপমানিত বোধ না করতে হয়। সেই গ্রীষ্মে আরও অনেক কিছুই শিখলাম, যার বেশির ভাগই শেখাল আমাকে জুলি।

আমার ডিগ্রি পাওয়ার পরদিন আবার আমাকে ওদের বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াত দিল মার্টিন। এই সন্ধ্যায়ও বাইরে বেরোলেন ওর বাবা-মা।

সকাল সকালই পৌঁছে গেলাম আমি। আমার জন্য দরজায় অপেক্ষা করছিল ও। আমাকে স্বাগত জানাল। 'খানিকটা বক্সিং প্র্যাকটিস হয়ে গেলে কেমন হয়?' বলল ও। 'সাপারের পর ঘুরতে বেরোব আমরা।'

'ঠিক আছে,' বললাম।

আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক প্র্যাকটিস করার পর দরজায় উঁকি দিয়ে জুলি জানাল: 'সাপার রেডি।'

দস্তানা খুলে নিলাম আমরা। হাত ধুলাম আমি। শাওয়ার নিতে গেল মার্টিন। আমি গিয়ে রান্নাঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'মার্টি কোথায়?' জুলি জিজ্ঞেস করল।

'গোসল করতে গেছে,' বললাম। 'আসতে সময় লাগবে না।'

আঁটসাঁট পোশাক পরেছে জুলি। বয়েস খুবই কম লাগে, শুধু হাঁটার সময় ছাড়া। 'বক্সিং শেখা কেমন চলছে?' জিজ্ঞেস করল ও। আমার হাত দুটো তুলে নিল।

'ভাল। ভালই শিখছে ও,' জানালাম।

'তোমার কেমন চলছে? তোমার অন্যান্য শিক্ষা?' আমার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসল ও।

'অন্য শিক্ষা মানে?' বোকার মত প্রশ্ন করলাম।

'এই এটা,' বলে আমার হাত দুটো ওর দেহে জড়িয়ে নিল।

চেপে ধরলাম ওকে। গরম শরীর ওর, খুব ভাল লাগল আমার। মনে হচ্ছে ওর দেহের উত্তাপ ঢুকে যাচ্ছে আমার দেহে। ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। চোখ বুজল ও। আবার যখন মেলল, কেমন কোমল আর ভাসা ভাসা হয়ে রইল সে দুটো।

একপাশে মাথা কাত করল ও। গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল: 'এখানে চুমু খাও।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কারণ আমার ভাল লাগে, হাঁদা কোথাকার,' বলল ও। 'তোমারও ভাল লাগবে। তুমি আমাকে ভালবাস না?'

'ওটা তো বাচ্চাদের ব্যাপার,' জবাব দিলাম।

'বাচ্চাদের ব্যাপার মানে?' আমার দিকে অবাক চোখে তাকাল ও। 'তুমি কোথাকার বুড়ো মানুষ হে, জনাব রিপ ভ্যান উইঙ্কল?'

'আমার বয়েস ষোলো হয়ে গেছে।'

'আমি তোমার চেয়ে চার বছরের বড়, আর আমি একটুও বাচ্চাদের ব্যাপার ভাবছি না। চুমু খাও।'

ওর গলায় চুমু খেলাম। প্রথমে কেমন যেন লাগল, তারপর বেশ মজা। আমার এক হাত ওর বুকের ওপর নিয়ে রাখল। আমার কানের কাছে ফিসফিস করল ও, যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছে: 'তোমার মধ্যে কিছু একটা আছে, ফ্র্যাঙ্কি, ঠিক বুঝতে পারি না। কোন কিশোর আমাকে এভাবে জাগাতে পারে না। কিন্তু তুমি, তুমি আলাদা। একেবারে বড় পুরুষ মানুষের মত, কঠিন, স্বার্থপর, হিসেবি। অথচ মুখটা দেখলে কিশোর ছাড়া আর কিচ্ছু মনে হয় না। তোমার গায়ে অনেক জোর। কিন্তু আমাকে যখন জড়িয়ে ধরো, একেবারে শিশুর মত। বলো, তুমি আমাকে ভালবাস।'

মাথা নেড়ে আবার চুমু খেলাম ওর গলায়। শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম।

'বলো!' আদেশের সুরে বলল ও। 'বলো, জুলি, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

ওর ঠোঁটের কাছে আমার ঠোঁট নিয়ে এলাম। কিন্তু কিছু বললাম না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে মার্টিনকে শিস দিতে শুনলাম। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলাম আমরা একে অন্যকে। জুলির দিকে তাকালাম। ও সুন্দরী। ওর চোখ চকচক করছে। আমার চুমু খাওয়ার কারণে ঠোঁটের কোণ এখনও সামান্য বেঁকে রয়েছে।

'তোমাকে আমি বলিয়েই ছাড়ব, দাঁড়াও না, পরে,' ফুঁসে উঠে বলল ও। মার্টিন ঢুকল ঘরে।

হেসে উঠলাম। মার্টিন জিজ্ঞেস করল: 'হাসার কী হলো?'

'কিছু না,' নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে নিজেকে।

খেতে বসলাম আমরা। দশ মিনিট পর রুথ এল। 'সরি, জুলি, ডিনারে আসতে দেরি করে ফেললাম। ক্লাবে আটকা পড়েছিলাম। আমরা একজন নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করছি, জানোই তো।' টেবিলে বসে আমার দিকে তাকাল ও। 'আবার এসেছ?'

'হ্যাঁ,' কোন অপমানই এখন আর গায়ে লাগে না আমার। 'তুমি কি কিছু মনে করলে?'

রুথের পে-ট এনে দিয়ে জুলিও টেবিলে বসল। আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে যেন বোঝার চেষ্টা করল কী নিয়ে আমাদের বিরোধ।

জুলির দিকে তাকালাম আমি। ওর চোখের গভীরে কোথায় যেন হাসির ছোঁয়া ঠিক ধরতে পারলাম না আমি।

খাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য পারলারে এসে বসলাম আমরা। সাড়ে আটটায় গুড-বাই জানিয়ে বিদায় নিলাম। সেদিনের মতই আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় এল রুথ। বলল: 'আমার কথা তো মনে হচ্ছে শোনার ইচ্ছে নেই তোমার।'

'আমাকে নিয়ে পড়লে কেন? নিজের চরকায় তেল দাও,' রুক্ষকণ্ঠে বললাম। এ

ধরনের জবাব আশা করেনি ও, মনে হলো চমকে গেল। দরজার কাছে পৌঁছে ফিরে তাকিয়ে দেখি ওর চোখে পানি টলমল করছে। হাত ধরে বললাম: 'আমি দুঃখিত।'

ঝাড়া দিয়ে আমার হাতটা সরিয়ে দিল ও। 'খবরদার, আমাকে ধরবে না!' শীতল কণ্ঠে বলল: 'তোমার কোন কিছুই আমার পছন্দ না। তুমি মোটেও তোমার বয়েসী ছেলেদের মত না। তোমার মধ্যে কিছু একটা আছে, খারাপ কিছু, যেটা আমি ঠিক ধরতে পারছি না। আর আমার ভয় হচ্ছে তুমি যাকেই ছোঁবে, সে-ই ধ্বংস হয়ে যাবে, আমার ভাইকেও তুমি নষ্ট করবে।'

কথা বলার চেষ্টা করেও পারলাম না। বেরিয়ে এসে পিছনে লাগিয়ে দিলাম দরজাটা।

আগেরবারের মতই সেই অন্য দরজাটার কাছে অপেক্ষা করছিল জুলি। আমাকে বলল: 'এত দেরি করলে যে? আমার তো মনে হচ্ছিল আর আসবেই না।'

'না, কিছু না,' বলে ওকে অনুসরণ করে এসে ওর ঘরে ঢুকলাম। টান দিয়ে ওকে আমার দিকে ঘুরিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। প্রথমে ঠোঁটে, তারপর গলায়, যেখানে চুমু খাওয়া ও পছন্দ করে। ওর কাপড় খুলে ফেললাম। ওর চামড়ার ঠাণ্ডা মসৃণ স্পর্শটা খুব ভাল লাগল আমার। বিছানার দিকে নিতে চাইলাম ওকে।

আমাকে থামিয়ে দিল ও। 'আগে বলো, তুমি আমাকে ভালবাস।'

শক্ত করে ওকে ধরে রেখে ওর উড়ুতে আমার হাত ঘষতে লাগলাম। ধীরে ধীরে ওপর দিকে তুলে আনলাম হাতটা। আমার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল ও, যেন হাঁটুতে ভর রাখতে পারছে না। বিছানার দিকে ঠেলে নিয়ে চললাম ওকে।

কিন্তু শক্ত হয়ে গেল ও। বাধা দিল আমাকে। 'না, আগে বলো, তুমি আমাকে ভালবাস।'

ওর মুখের দিকে তাকালাম। কঠিন হয়ে উঠেছে চোয়াল।

'আমি তোমাকে ভালবাসি, জুলি,' কর্কশকণ্ঠে কোনমতে বলে কাছে টেনে নিলাম ওকে।

দশ

'কাজটা সহজ,' জিমি কেওয়াফ বলল আমাকে। 'এখান থেকে শুরু করে সিক্সটি-ফোর্থ স্ট্রিটের পুরোটাই তোমার এলাকা। তুমি যে যাবে আমার ছেলেদেরকে বলে দিয়েছি। কোন ঘোড়ার ওপর ওরা কত টাকা বাজি ধরে সেটা লিখে নেবে, তারপর রেস শুরু হওয়ার আগেই এখানে এসে আমাকে দেখাবে। কোন কারণে সময়মত যদি পৌঁছতে না পারো, কে কত বাজি ধরেছে ফোন করে আমাকে জানিয়ে দেবে। তুমি যা জোগাড় করে আনতে পারবে, তার লাভ সমান ভাগে ভাগ করে নেব আমরা। যতদিন আমার কাজ করবে, এভাবেই চলবে, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকালাম। এভাবে আগেও বহুবার কাজ করেছি আমরা। শুরু করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি আমি। একটা প্যাড, দুটো পেন্সিল আর দুটো রেসিং ফর্ম পকেটে ভরে নিয়েছি। দরজার দিকে রওনা হলাম।

পিছন থেকে ডাক দিল জিমি। 'শোনো, সময়মত পৌঁছাতে না পারলে ফোন করে আমাকে জানিয়ে দিতে ভুলো না।'

'ঠিক আছে, জিমি,' বলে দরজার বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় উজ্জ্বল রোদ, আর বেশ গরম। এগারোটা প্রায় বাজে। বোঝা যাচ্ছে, গরম আরও বাড়বে, যাকে বলে একেবারে ঝলসানো গরম। জিমির দেয়া অ্যাড্রেস বুকটার দিকে তাকালাম। প্রথম ঠিকানা টেন্‌থ্ অ্যাভেনিউর সিক্সটি-থার্ড স্ট্রিটের একটা গ্যারেজ। চলে এলাম ওখানে। ক্রিস্টি নামে একটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে।

দুটো গাড়ি পেরিয়ে এসে একটা ঠাণ্ডা জায়গায় ঢুকলাম। বিশালদেশী একজন নিগ্রো গাড়ি মুছছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম: 'ক্রিস্টিকে কোথায় পাব, বলতে পারেন?'

'আমিই ক্রিস্টি,' জবাব দিল ও। 'কী দরকার?'

'আমি জিমি কেওয়াফের কাছ থেকে এসেছি,' বললাম ওকে।

হোসটা নামিয়ে রাখল ও। 'ডোপ শিট এনেছ?'

'এনেছি,' কাগজটা বের করে দিলাম।

ওটা নিয়ে চিৎকার করে বলল ও: 'এই জো, দেখে যাও, বুক চলে এসেছে।'

ও আমাকে 'বুক' বলে ডেকেছে, ভাল লাগল আমার। গ্যারেজের পিছনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল আরেকজন মানুষ। কৌতূহলী চোখে আমার দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ক্রিস্টির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শিটটা দেখতে লাগল দুজনে। একটা গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছি আমি। অবশেষে ডাকল আমাকে ক্রিস্টি। ওর কাছে গিয়ে গাড়ির রানিং বোর্ডে বসে পেন্সিল আর কাগজ বের করলাম।

জোকে বলল ক্রিস্টি: 'আজকে দুজনে একটাতেই দাগ দিয়ে দিই, কি বলো?'

'দাও,' জবাব দিল জো।

আমার দিকে ফিরল ক্রিস্টি। 'ও-কে, বয়, এই যে আমাদের বেট, এই ঘোড়াটার ওপর ধরলাম। কাল নাগাদ ফতুর হয়ে যাবে তোমার বস।'

হেসে উঠলাম। 'ঠিক আছে, করুন ফতুর। উনি সেটা সহ্য করতে পারবেন।'

ওরাও হাসল।

'ডকেট ও রেড রোজ প্রতিটি ঘোড়ার জন্য পঞ্চাশ সেন্ট করে ধরলাম,' ক্রিস্টি বলল।

'ঠিক আছে,' পেশাদার জুয়াড়ির ভঙ্গিতে জবাব দিলাম। 'শুধু এই?'

'হ্যাঁ, আজকের মত এই,' হাসল ক্রিস্টি। 'কাল এ সময়েই আমার জেতার টাকাটা নিয়ে এসো, তখন তোমাকে খুশি করে দেব।'

'যদি জেতেন,' আমি বললাম। 'এমনও হতে পারে, এত বেশি টাকা পাবেন, ট্রাক নিয়ে আনতে যেতে হবে।'

বাজির টাকা বের করে আমার হাতে দিল ও। সাবধানে পকেটে ভরে রাখলাম সেগুলো।

'তাহলে কাল দেখা হচ্ছে,' আমি বললাম।

আমার পরের ঠিকানা সিক্সটি-সেভেন্থ স্ট্রিট। একটা বাড়ির প্রবেশপথে এসে দাঁড়ালাম। বড় একটা উঁচু জায়গায় দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন লোক বসে স্যান্ডউইচ খাচ্ছে, সিগারেট টানছে। একজন আচার খাচ্ছে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম: 'আল অ্যানড্রুকে চেনেন?'

'ওই যে এলিভেটরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে,' আচারসহ হাতটা তুলে লম্বা একজন মানুষকে দেখাল লোকটা।

'থ্যাংকস,' বলে অ্যানড্রুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞেস করলাম: 'আপনি আল অ্যানড্রুস?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'আমি জিমি কেওয়াফের কাছ থেকে এসেছি,' বললাম ওকে।

'এদিকে এসো। আমি কী করছি বসকে দেখাতে চাই না।'

ওর পিছন পিছন একটা করিডর পেরিয়ে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। শিটটা দিলাম ওর হাতে। ভালমত দেখে বলল: 'ধূর, পছন্দ করার মত একটা ঘোড়াও তো দেখছি না আজ।'

হেসে বললাম: 'তাই বলে কি কোন ঘোড়া জিতবে না? একটা না একটা তো প্রথম হবেই।'

'কিন্তু আমার পছন্দ হচ্ছে না,' লোকটা বলল। 'গত সপ্তায় যেগুলোর ওপর ধরেছি, কোনটাই লাগেনি।'

'আজকেরটা লাগতে পারে, ভাগ্য যাচাই করতে দোষ কী?'

সন্দিহান চোখে শিটটার দিকে তাকাল ও। কয়েক মিনিট ধরে দেখল। তারপর

বলল: 'ঠিক আছে, স্মুথির ওপর ধরলাম এক ডলার।'

কাগজে লিখে নিয়ে বললাম: 'আর কিছু?'

আবার কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল ও। তারপর মাথা নেড়ে শিটটা ফিরিয়ে দিল আমার হাতে। প্যান্টের বোতাম খুলে অন্তর্বাসের ভিতরে লুকিয়ে রাখা টাকা বের করে দিল। দিতে গিয়ে প্যান্টটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে। আমার টাকা আমি পেয়ে গেছি, ও প্যান্ট তুলে পরল কী পরল না সেটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, রওনা দিলাম দরজার দিকে।

'কাল দেখা হবে,' ফিরে তাকিয়ে বললাম। জবাব দিল না ও। হাত মোছার জন্য টয়লেট পেপার খুঁজছে ওর চোখ।

আমার তৃতীয় স্টপ রাস্তার মাথার একটা ড্রাগ স্টোর। ওখান থেকে তিন ডলার আদায় করলাম। তারপর গেলাম একটা রেস্টুরেন্টে। সেখানে এক লোক সাত ডলার বাজি ধরল। এরপর একটা বিউটি পারলার, একটা ক্যান্ডি স্টোর, আরও কয়েকটা গ্যারেজ, একটা রিপেয়ার শপ, একটা জুতোর দোকান, আবার একটা রেস্টুরেন্ট ঘোরা শেষ করলাম। আর মাত্র একটা জায়গা বাকি। একটা বাড়ি। বেল বাজালাম। দরজা খুলে দিল একটা নিগ্রো মেয়ে।

আমার হাতের ঠিকানা লেখা কাগজের দিকে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম: 'মিস নীল আছেন?'

'আছেন,' মেয়েটা বলল। 'কিন্তু তোমার বয়েস তো খুব কম, ওঁকে দিয়ে লাভটা কী তোমার?' আমাকে দোতলায় নিয়ে এল ও। একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিল: 'মিস নীল?'

'এসো,' জবাব এল ভিতর থেকে।

ঘরে ঢুকলাম। কিমোনো আর হাউসফ্রক পরা আরও কয়েকজন মহিলা বসে আছে সেখানে।

'আমি নীল,' বড়সড় দেহের, কালো চুলওয়ালা এক মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল। 'কী দরকার?'

'কেওয়াফ পাঠিয়েছেন,' ঘরের চারপাশে চোখ বোলালাম। আমার অনুমান ঠিক হলে, জায়গাটা একটা পতিতালয়।

'ও।' মহিলা জিজ্ঞেস করল: 'শিট এনেছ?'

বের করে দিলাম। দ্বিতীয় আরেকটা শিট নিল অন্য আরেকজন মহিলা। ওরা দেখছে, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বার বার পায়ের ওপর ভার বদল করছি আমি। অবশেষে একজন মহিলা আমাকে বসতে বলল। চেয়ারে বসে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ওই বাড়িটা থেকে উনিশ ডলার আদায় হলো। ব্রাদার বার্নহার্ডের দেয়া ঘড়িটা আমার কব্জিতেই বাঁধা আছে। দেখলাম, দুটো প্রায় বাজে। তাড়াহুড়া না করলে কেওয়াফের দোকানে যেতে দেরি হয়ে যাবে। প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এলাম দোকানে।

আমাকে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞেস করল কেওয়াফ: 'কী অবস্থা?'

'ভাল,' জবাব দিলাম। বেটিং স্লি-পগুলো বের করে কাউন্টারে রাখলাম। স্লি-প দেখে হিসেব মেললাম। ৫১.৫০ ডলার আদায় করে এনেছি আমি। টাকাটা কেওয়াফকে বের করে দিয়ে ঘর মোছা শুরু করলাম। দ্রুত কেটে যাচ্ছে বিকেলটা। সেদিন ২২.৫০ ডলার লাভ হলো আমাদের। আমার পাওনা ১১.২৫ ডলার।

'একদিনের আয় এগারো ডলার পঁচিশ সেন্ট,' রাতেরবেলা এতিমখানায় ফিরতে ফিরতে ভাবলাম। এর আগে কাজ করে এক সপ্তায় যা আয় করেছিলাম, তারচেয়ে বেশি। গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার দুঃখটা পুষিয়ে গেল আমার।

এগারো

প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে আমার লাভ দাঁড়াল একান্ন ডলার। ওই টাকা আর কেওয়াফের দোকানে চাকরির বেতন ছয় ডলার মিলিয়ে হলো সাতান্ন ডলার। আমার প্রতিবেশী অনেক বাড়ির কর্তারাও এত টাকা আয় করে না। মনে হলো আমি টাকা চিনি না। দু'হাতে ওড়াতে লাগলাম। যত পারলাম হ্যামবার্গার, কোক আর অন্যান্য খাবার গিললাম গলা পর্যন্ত। জীবনে এই প্রথম সব সময় পকেটে টাকা থাকে আমার। আমার প্রতিবেশী অনেক ছেলেই আমার টাকায় এটা ওটা কিনল। ওদেরকে টাকা দেখানোর লোভ সামলাতে পারলাম না, আর ওরাও আমাকে দিয়ে টাকা খরচ করিয়ে ছাড়ল। ওইসব ছেলে মহলে আমি একজন কেউকেটা হয়ে উঠলাম।

রোববার বিকেলে জুলিকে নিয়ে সাঁতার কাটতে চললাম। ওর হাতে একটা ছোট ব্যাগ। ট্রেনে চড়ে আমাকে জিজ্ঞেস করল: 'তোমার বাদিং সুট কোথায়?'

'আছে, পরনে, কাপড়ের নীচে,' আমি বললাম।

হেসে উঠল ও। 'ফেরার সময় কী করবে? তখন তো ওটা ভিজে যাবে।'

হতাশকণ্ঠে বললাম: 'তাই তো, এটা তো ভাবিনি।'

'থাক, চিন্তা করে কাজ নেই, আমার ব্যাগে ভরে নিতে পারব।'

টাইমস স্কোয়ারে পৌঁছল ট্রেন। প্রচুর যাত্রী উঠল ওই স্টেশনে। গরম এড়াতে সবাই দ্বীপের দিকে ছুটেছে। স্টিপল্‌চেজের কাছে একটা ছোট বাথহাউসে লকার নিলাম আমরা। পকেটে টাকা আছে। কাজেই চিন্তা নেই। সৈকতে দাঁড়িয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু পর সুট পরে বেরিয়ে এল ও। লাল সুটে দারুণ লাগছে ওকে। হাই-হিল জুতো না পরাতে আমার চেয়ে কিছুটা খাটো হয়ে গেছে ও। বয়েসও আমার মতই মনে হচ্ছে, বড় বোঝা যাচ্ছে না। তাতে ভাল লাগছে আমার।

পানি এখানে খুব ভাল। কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে সৈকতে উঠে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। রোদ খুব গরম। ওরা চামড়া সাদা। আর আমার চামড়া বাদামী, ডকে বেশি বেশি যাওয়ার ফল।

'কাজ কেমন চলছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল ও।

গড়িয়ে চলে এলাম ওর পাশে, উপুড় হয়ে শুলাম। 'ভাল। গত সপ্তায় একান্ন ডলার আয় করেছি।'

'একান্ন ডলার?' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল ও।

'হ্যাঁ,' জবাব দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: 'দেখতে চাও?' মানিবেল্ট থেকে টাকা বের করে দেখালাম।

'থাক থাক, রেখে দাও, আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি।'

টাকাগুলো আবার আগের জায়গায় ভরে রাখলাম।

'এত টাকা দিয়ে কী করবে?' জানতে চাইল ও।

'জানি না,' জবাব দিলাম। 'কিছু কাপড়চোপড় কিনব। এতিমখানার দানের কাপড় পরতে পরতে বিরক্ত হয়ে গেছি। আরও কিছু জিনিস কিনব, চিরকাল যা চেয়ে এসেছি, কিন্তু পাইনি।' সিগারেটের প্যাকেট বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। একটা সিগারেট নিল ও। বাতাস আড়াল করে দুই হাতের ভিতর দিয়াশলাইয়ের কাঠি রেখে আগুন জ্বেলে ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিলাম।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ও। 'তোমার একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা উচিত। এভাবে টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো উচিত না। এই টাকা একদিন অনেক কাজে আসবে তোমার, যখন কলেজে যাবে। কী বললাম, বুঝতে পেরেছ?'

'কলেজ নিয়ে কে মাথা ঘামায়?' জবাব দিলাম। 'বুকি হব আমি, টাকা কামাব, প্রচুর টাকা। আর তুমি হবে আমার গার্ল।'

'সত্যিই আমাকে গার্ল করার ইচ্ছে আছে তোমার?' মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করল ও।

'নিশ্চয়!' এত সুন্দরী লাগছে ওকে ওই মুহূর্তে চুমু খেতে ভীষণ ইচ্ছে করল। কিন্তু পারলাম না। আশেপাশে অনেক লোক।

*

গ্রামে যাবার আগের দিন কেওয়াফের দোকানে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল জেরি। বলল: 'আমার সঙ্গে গেলে খুব ভাল হতো, ফ্র্যাঙ্কি।'

'না রে,' জবাব দিলাম: 'এখানকার কাজ ফেলে...'

'আমি জানি,' ও বলল: 'তবে যদি কখনও মত বদলাস, আমাকে চিঠি লিখিস। বাবাকে বলে তখন তোর যাওয়ার ব্যবস্থা করব।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তোর গ্রীষ্মের ছুটিটা ভাল কাটুক, জেরি।'

'তুইও ভাল থাকিস,' বলে এমন ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাল ও, যেন এখানে আমার ভাল থাকা সম্ভব না।

'সেপ্টেম্বরে দেখা হবে,' বললাম ওকে।

আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মেলালাম দুজনে। ওকে চলে যেতে দেখলাম। এ মুহূর্তে ওকে আগের চেয়ে ভাল লাগল। তারপর ঘর সাফ করা ও টয়লেট পরিষ্কারের কাজে মন দিলাম। কাজ শেষ করে খদ্দেরদের দেখতে গেলাম। জুলির পরামর্শ মত ব্রডওয়ের সিক্সটি-থার্ড স্ট্রিটের কর্ন এক্সচেঞ্জে একটা অ্যাকাউন্ট খুললাম। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ দিকে প্রায় সত্তর ডলার জমিয়ে ফেললাম।

সেদিন শহরের পথে হাঁটতে হাঁটতে রে ও মার্টির সঙ্গে দেখা। ডকে যাচ্ছে সাঁতার কাটতে। আমাকেও ওদের সঙ্গে যেতে বলল। বললাম, পারব না, কারণ কাজে বেরিয়েছি আমি। মার্টি বলল রাতে ওদের বাড়িতে যেতে। বললাম, পারলে যাব, যদি ব্যস্ত না থাকি। আরও দুটো ছেলে এসে হাজির হলো, ওদের সঙ্গে চলে গেল রে ও মার্টি। এ দিন আমার প্রথম ঠিকানা একটা গ্যারেজ। সেখানে এসে দেখি রাস্তায় সিকবল

খেলছে কয়েকটা ছেলে। কয়েক মিনিট থেমে খেলা দেখলাম। আমার দিকে ছুটে আসা বলটা একবার ধরে ফেলে খেলোয়াড়দের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল একজন: 'খেলবি, ফ্র্যাঙ্কি?'

'না, আমার কাজ আছে,' জবাব দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। গ্যারেজে ঢুকে ডাক দিলাম: 'ক্রিস্টি, আছেন! কোথায় আপনি?'

একটা গাড়ির নীচ থেকে জবাব এল: 'হ্যালে-া, ফ্র্যাঙ্কি,' মুখে চওড়া হাসি নিয়ে উঁকি দিল ও।

'জিতে গেছেন,' হাসিমুখে জানালাম ওকে। 'একুশ ডলার জিতেছেন আপনি।' টাকাটা পরিশোধ করে দিলাম। কথা শুনে ওর পার্টনার জো বেরিয়ে এল। তার হাতে শিটটা ধরিয়ে দিলাম। আগের বার দুই ডলার বাজি ধরেছিল ওরা, এবার ধরল ছয় ডলার।

তবু কেন যেন সন্তুষ্ট হতে পারলাম না আমি। মক্কেলরা জিতেছে, আমার জন্য একটা মস্ত সুসংবাদ, ভাল লাগার কথা, কিন্তু লাগছে না। ফিফটি-ফোর্থ স্ট্রিটে ডকের পাশ দিয়ে কেওয়াফের দোকানে ফিরে যাবার সময় ছেলেরা যেখানে সাঁতার কাটছে সেখানে থামলাম একটু। থামের গায়ে হেলান দিয়ে ওদের সাঁতার দেখতে লাগলাম। ডোবাডুবি, দাপাদাপি করছে ওরা, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। ইচ্ছে হলো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে, কিন্তু ইচ্ছেটা দমন করলাম। আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।

আমার পিছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ: 'ওদের সঙ্গে খেলতে যেতে ইচ্ছে করছে তোমার, তাই না, ফ্র্যাঙ্কি?'

ফিরে তাকালাম। সিল্ক ফেনেলি দাঁড়িয়ে আছে। 'না সার...মানে...'

হাসল ও। বলল: 'আমি বুঝতে পারছি। তোমার কেমন লাগছে, তা-ও জানি। সাঁতার কাটতে, বল খেলতে, ওদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে হই-চই করতে খুব ইচ্ছে করছে তোমার, কিন্তু পারছ না। তোমার একটা দায়িত্ব এসে গেছে, নিজের জন্যে। ওই ছেলেগুলো নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে না, কিন্তু তুমি ভাবছ। তুমি সামনে এগিয়ে যেতে চাও, বড় হতে চাও। এতদিনে বুঝে গেছ কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। আর এটাও বুঝে গেছ কীসের বিনিময়ে কী পেতে চাও। একদিন আমার অবস্থাও তোমার মতই হয়েছিল।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি, মিস্টার ফেনেলি,' আমি বললাম। 'ওদের সঙ্গে যোগ দেয়ার ইচ্ছেটা নেই আর এখন আমার।'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে,' আমার কাঁধে হাত রাখল ও, আন্তরিকতার ছোঁয়া অনুভব করলাম তাতে। 'এখন কোথায় যাবে?'

'কেওয়াফের ওখানে,' বললাম।

'আমার গাড়িতে ওঠো। ওদিকেই যাচ্ছি। তা ছাড়া তোমার ওই স্পেশাল পালিশটাও আমার দরকার।'

ওর সঙ্গে ওর গাড়িতে উঠলাম। কেওয়াফের দোকানের সামনে এমন একজন মস্ত মানুষের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামার সময় নিজেকে কেউকেটা মনে হলো। কেমন চলছে আমার জানতে চাইল ফেনেলি। জানালাম ওকে। ভাল, বলল ও।

কেওয়াফের দোকানে ঢুকে স্লি-প আর আদায় করে আনা টাকা ওর হাতে তুলে দিলাম। তারপর আমার জুতো পালিশের বাক্সটা এনে মিস্টার ফেনেলির জুতো পালিশ করতে বসলাম।

'এই ছেলেটার হবে,' জিমিকে বলল ফেনেলি।

'হ্যাঁ, স্মার্ট ছেলে!' এমন ভঙ্গিতে ফেনেলিকে বলল জিমি, বাবা যেন গর্বের সঙ্গে তার ছেলের গুনগান করছে।

জুতো পালিশের জন্য টাকা দিতে চাইল ফেনেলি। আজ আর আমি নিতে চাইলাম না। যদিও কম না, আধ ডলার।

'আরে নাও নাও,' ফেনেলি বলল।

চাপাচাপি করবে, বুঝতে পারছি। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বললাম: 'ঠিক আছে, টস করা যাক। আধ ডলার বাজি। জিতলে আমাকে এক ডলার দেবেন। না জিতলে ওই আধ ডলার আপনার।'

'বেশ,' একটা মুদ্রা নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে মারল ফেনেলি। 'বলো, কী নেবে।'

মুদ্রাটা ওপরে উঠে যেতে দেখলাম। ঘুরে ঘুরে নীচে পড়ার সময় বললাম: 'টেল।'

টেলই উঠল। আমাকে এক ডলার দিল ফেনেলি। টাকাটা পকেটে রাখলাম। 'চালিয়ে যেয়ো, ফ্র্যাঙ্কি,' হেসে বলল ও।

'যাব, সার,' জবাব দিলাম। 'থ্যাংক ইউ।'

কেওয়াফ হাসল। 'ফ্র্যাঙ্কি, চট করে দুই বোতল বিয়ার নিয়ে এসো তো।'

সেলার থেকে দুই বোতল ঠাণ্ডা বিয়ার এনে ছিপি খুললাম। ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে অনেকখানি করে গিলে নিল দুজনে। বোতল শেষ করে জিমিকে বলল ফেনেলি: 'গত সপ্তার হিসেবটা শেষ করে ফেলা যাক, কি বলো?'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল কেওয়াফ। 'আমাকে তুমি চেনো, কখনও কারও পাওনা টাকা ফেলে রাখি না।' পকেট থেকে টাকার তোড়া বের করল ও। সেখান থেকে ছয়শো ডলার নিয়ে ফেনেলির হাতে তুলে দিল। পকেটে ভরে রাখল ফেনেলি, গোনার প্রয়োজন মনে করল না।

ওদের কাছ থেকে সরে এসে বালতি ও ঝাড়ু-কাপড় নিয়ে কাউন্টারের সামনের মেঝে মোছায় মন দিলাম আমি। প্রচণ্ড গরম। শার্ট খুলে ফেলে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেললাম। দরদর করে ঘামছি। আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আমার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল ফেনেলি। আমিও সালাম জানালাম, অনেকটা স্যালুট করার মত করে, ফাদার কুইনকে যেভাবে সালাম জানাই।

বারো

গড়িয়ে চলছে গ্রীষ্মকাল। নিউ ইয়র্কের অন্যান্য গরমকালের মতই: আঠা আঠা বিরক্তিকর উত্তাপ, ক্লান্তিকর; কাজ করতে গিয়ে লোকের অস্বাভাবিক ক্লান্ত হওয়া; স্কুল নেই, তাই রাস্তায় বাচ্চাদের চেঁচামেচি, পার্ক ও সৈকতগুলোতে লোকের ভিড়, আবহাওয়া নিয়ে খবরের কাগজগুলোর বিশেষ প্রতিবেদন; বাড়িঘরের খোলা জানালা দিয়ে আসা মানুষের হট্টগোল।

নিউ ইয়র্কের আরেকটা বিরক্তিকর গরম। তবে আমার জন্য নয়। এবারের গরমটা আমার খুবই পছন্দ। জীবনে এই প্রথম আমাকে কারও নজরদারীতে থাকতে হচ্ছে না, পুরোপুরি স্বাধীন। আগস্টের শেষ চলছে। ব্যাংকে সাতশো ডলার জমে গেছে আমার। আমার একজন মেয়েবন্ধু আছে। নতুন সুট বানিয়েছি। রেস্টুরেন্টে খেতে পারি। পকেটে টাকা থাকে। যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি, যা মন চায় করতে পারি। উচ্চমানের জীবনযাত্রা এখন আমার। প্রচুর টাকা কামিয়ে ফেলেছি। তবে কেওয়াফের চাকরি ছাড়ার সময় এখনও হয়নি। আমার বয়েস এখনও কম। স্কুল খোলার পরও ঘোড়দৌড়ের বাজির ব্যবসাটা কীভাবে চালাব ভাবি। হাই স্কুলে গিয়ে মর্নিং সেসনে পড়ার আবেদন জানাব কর্তৃপক্ষের কাছে, তাতে পড়ালেখা করেও ব্যবসা চালাতে পারব। এতিমখানার অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তুলনায় আমার ভবিষ্যৎ খুব সম্ভাবনাময়।

২২ আগস্ট, শনিবার। বিকেল শেষ হয়ে আসছে। কেওয়াফের সঙ্গে বসে হিসেব শেষ করছি আমি। আরও চুরাশি ডলার পকেটে এসে গেছে আমার। জুয়ার আড্ডা লোকে গিজগিজ করছে। হই-হট্টগোলে মুখরিত। চিৎকার-চেঁচামেচি, গালাগাল চলছে সমানে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনেকে চলে যাবে, মেয়েবন্ধুর সঙ্গে ডেটিং করবে কেউ, কেউ যাবে পার্টিতে, নাচে অংশ নেবে কেউ কেউ। বিয়ার আর অন্যান্য কোল্ড ড্রিংক শেষ হয়ে গেছে। কাউন্টারের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকাল কেওয়াফ। বলল: 'আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। ভাবছি তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দিয়ে ট্রেন ধরব, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'সবাইকে বলে দেব?' জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা ঝাঁকাল ও।

টেবিলে টেবিলে ঘুরে বলতে লাগলাম: 'দোকান বন্ধ করব! দোকান বন্ধ করব!'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই খালি হয়ে গেল জায়গাটা। টাকাপয়সা সব গুনে নিয়ে পকেটে ভরল কেওয়াফ। তারপর বলল: 'চলো, বেরোই।'

কেওয়াফ যখন দরজায় তালা লাগাচ্ছে, সিল্ক ফেনেলির গাড়িটা এসে থামল দোকানের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল ও। হেসে জিজ্ঞেস করল: 'এত তাড়াতাড়ি বন্ধ করলে যে, জিমি?'

'হ্যাঁ,' কেওয়াফ জবাব দিল: 'স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'ভাল,' ফেনেলি বলল। 'আমার জন্যে কিছু আছে?'

'আছে,' কেওয়াফ বলল। 'আমাকে তো তুমি চেনো, সব সময় রেডি!' পকেট থেকে টাকার তোড়া বের করল ও। মোটা একটা রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। দরজায় দাঁড়াল ওরা। আমি সরে গিয়ে জায়গা করে দিলাম। রাস্তার দিকে পিছন করে রয়েছি।

হঠাৎ একটা ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। চমকে ফিরে তাকাল সিল্ক ও কেওয়াফ। আমার পিছনে কোন কিছুর দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের তাকানোটা স্বাভাবিক মনে হলো না। সাদা হয়ে গেল কেওয়াফের মুখ। হাত থেকে খসে পড়ল টাকার তোড়া।

নিচু হয়ে ওটা তুলে নিতে নিতে বললাম: 'এতটা অসাবধান হওয়া আপনার...' গুলি ফোটার তীক্ষ্ণ শব্দে থেমে গেলাম। পেটে হাত চাপা দিয়ে দরজার গায়ে পড়ে যাচ্ছে কেওয়াফ। ফেনেলির দিকে তাকালাম। বুকে হাত চাপা দিয়েছে। সে-ও পড়ে যাচ্ছে, সামনের দিকে ঝুঁকে। পকেট থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে একটা হাত। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ফোয়ারার মত ছুটে এল আমার দিকে। নড়ে উঠলাম। ভাবতে পারছি না। শুধু পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রথমে চার হাতপায়ে ভর দিয়ে সরে এলাম। তারপর লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করলাম মরিয়া হয়ে। ফিরে তাকালাম না। ছুটছি আর ছুটছি। একটা ব-ক পেরিয়ে এলাম। তারপর আরেকটা। কোথায় চলেছি জানি না। শুধু দৌড়াচ্ছি।

মার্টিনদের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের কাছে এসে থেমে গেলাম। দরজা দিয়ে ঢুকে দৌড়ে উঠতে শুরু করলাম সিঁড়ি বেয়ে। পিছনের দরজার কাছে চলে এলাম। বেল বাজালাম। জানি, জুলি খুলে দেবে। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি। ধড়াস ধড়াস করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছি।

দরজা খুলে দিল জুলি। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলাম।

'কী হয়েছে, ফ্র্যাঙ্কি!' ও বলল। আমার শার্টে রক্ত দেখল। 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

জবাব দিলাম না। রান্নাঘরেরর পিছনে ওর ছোট্ট ঘরটায় ঢুকলাম। ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিছানায়। কর্কশ ঘড়ঘড়ে শব্দে আমার আমার গলা দিয়ে নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে।

আমার পিছন পিছন ঘরে ঢুকে দরজাটা লাগিয়ে দিল জুলি। 'কী হয়েছে, ফ্র্যাঙ্কি? জখম হয়েছ?' ভয়ে বড় বড় হয়ে গেছে ওর চোখ।

উঠে বসলাম। 'না। আমার বস আর ফেনেলিকে ওরা গুলি করেছে।'

'কারা?'

'জানি না। দৌড়ে পালিয়েছি।' উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎই অনুভব করলাম কিছু একটা ধরে রেখেছি আমি। তাকিয়ে দেখলাম, কেওয়াফের টাকার তোড়া। কখন ওটা তুলে নিয়েছি, মনে পড়ে না। নিশ্চয় কেওয়াফের হাত থেকে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়েছিলাম। তোড়াটা পকেটে ভরে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালাম। 'আমাকে অনুসরণ করে ওরা এখানে চলে আসবে কিনা কে জানে?' প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করলাম

আমি।

আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জুলি। 'বেচারা! তোমার জন্যে মায়া হচ্ছে আমার! এত ভয় পেয়েছ!' আমাকে কাছে টেনে নিল ও।

'না, আমি ভয় পাইনি,' মিথ্যে কথা বললাম। ওর বুকে মাথা গুঁজে দিলাম। এত উষ্ণ, এত নিরাপদ মনে হলো জায়গাটা। নড়াতে ইচ্ছে করছে না। সারা গায়ে কাঁপুনির ঢেউ খেলে গেল: প্রথমে একবার, তারপর আবার। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কাঁপুনি বন্ধ হচ্ছে না। ঘামে ভিজে যাচ্ছে শরীর। জুলির বাহুবন্ধনে দাঁড়িয়ে থেকে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম...

খানিক পরে ঘরের কোণের একটা ছোট আর্মচেয়ারে বসে ভাবতে লাগলাম: 'কেউ আমাকে এখানে আসতে দেখেনি। মনে হয় ফেনেলির পিছে লেগেছিল ওরা। আমাকে মারতে আসেনি। কেওয়াফকে মরতে হয়েছে ওদেরকে দেখে ফেলার কারণে। আমি ওদের দেখিনি। আমার সঙ্গে ওদের কোন বিরোধ নেই। পুলিশ আমাকে নিশ্চয় প্রশ্ন করতে আসবে। কিন্তু আমি কিছুই দেখিনি। যতক্ষণ মুখ বন্ধ রাখতে পারব ততক্ষণ আমি নিরাপদ। ঘাবড়াবার কিছু নেই আমার।' অন্য ঘরে আমার জন্য ড্রিংক আনতে গেল জুলি। 'টাকাগুলো নিয়ে কী করব আমি?' গুনে দেখলাম, ছয়শো তিপ্পান্ন ডলার। টাকাটা আবার পকেটে ভরলাম। এক কাপ কফি নিয়ে এল জুলি।

'এই যে,' কাপটা বাড়িয়ে দিল ও। 'খেয়ে নাও, ভাল লাগবে।'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। 'এখনই ভাল লাগছে আমার।' ধীরে ধীরে কফির কাপে চুমুক দিতে থাকলাম। 'কিন্তু এই শার্টটা পরে আর বেরোতে পারব না। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে।' খুলে ওটা জুলির হাতে দিলাম। 'পুড়িয়ে ফেলো। আর মার্টির একটা শার্ট দাও আমাকে।'

শার্টটা নিয়ে বেরিয়ে গেল ও। রান্নাঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। তারপর চুলি-র দরজা বন্ধ হতে শুনলাম। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে মার্টিনের ঘরে চলে গেল জুলি। কয়েক সেকেন্ড পর একটা শার্ট হাতে ফিরে এল।

পরে নিলাম। আমার গায়ে কিছুটা ছোট হলো। তবে পরে খারাপ লাগল না। ভাবলাম: 'এখান থেকে বেরোনো দরকার।'

'থ্যাংকস, জুলি,' বললাম। 'বাড়ির লোকেরা ফিরে আসার আগেই বেরিয়ে যাই।'

'তাড়াহুড়ার দরকার নেই,' জুলি বলল। 'মিস্টার ক্যাবেল বাদে বাকি সবাই উইকএন্ডে গ্রামে চলে গেছে। দোকান বন্ধ করে রাত একটার আগে বাড়ি ফিরবেন না উনি।'

কাজেই ওখানেই সাপার খেয়ে রাত ন'টায় বেরিয়ে এতিমখানায় চললাম। পিছনের দরজা দিয়ে ডরমিটরিতে ঢুকলাম। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। নিজের ঘরে ঢুকে কাপড় খুলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এতই ক্লান্ত হয়ে আছি, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজ দেখার জন্য সবার আগে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নীচে নেমে এলাম। 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকার প্রথম পাতায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা

হেডলাইন যেন চিৎকার করে ঘোষণা করছে: ফেনেলি গুলি খেয়েছে। পুরো কাহিনীটা ছাপা হয়েছে ২য় পৃষ্ঠায়। দ্রুতহাতে পাতা ওল্টালাম। পাতার ডান পাশে ওপরের কোণায় ফেনেলির ছবি ছাপা হয়েছে। নীচে লেখা:

নিউ ইয়র্কে আবার আঘাত হানল খুনে অপরাধীরা

জুয়াড়ি ও অপরাধী দলের নেতা সিল্ক ফেনেলি গুলি খেয়ে মারাত্মক জখম হয়ে এখন হাসপাতালে আছেন; একইসঙ্গে জেমস (জিমি) কেওয়াফ অপরিচিত আততায়ীর গুলিতে মারা গেছেন আজ। কেওয়াফের বুকে দুবার গুলি করা হয়েছে, হৃৎপিণ্ড ভেদ করে গেছে বুলেট। ফেনেলি গুলি খেয়েছেন বুকে ও তলপেটে, কেওয়াফের একটা জুয়ার আড্ডার সামনে ঘটেছে ঘটনাটা। ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল, খুনটা হতে দেখেছে এমন একটা ছেলেকে খুঁজছে পুলিশ। রুজভেল্ট হাসপাতালের ডাক্তাররা জানিয়েছেন ফেনেলির আঘাত গুরুতর হলেও মৃত্যুর আশঙ্কা নেই। কোন রকম বিবৃতি দিতে রাজি হননি তিনি। শুধু বলেছেন: 'আমি কাউকে চিনতে পারিনি, কে গুলি করেছে দেখিনি, আমি আমার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।' খুব শীঘ্রি তদন্তের অগ্রগতি হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পত্রিকাটা নামিয়ে রাখলাম। ফেনেলির ভাষ্য শুনে আমার মনে হলো, ইঙ্গিতে আমাকেও সাবধান করে দিতে চেয়েছে ও। অন্যের ব্যাপারে নাক না গলাতে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। ডাইনিং রুমে ঢুকে নাস্তা করলাম। তারপর গেলাম গির্জায় প্রতিদিনকার নিয়মিত প্রার্থনা সারতে। বুঝতে পারলাম উদ্বিগ্ন হবার কিংবা ভয় পাবার কোন কারণ নেই আমার।

তেরো

পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেল। ইতিমধ্যে কেউ আমাকে বিরক্ত করতে এল না। আবার নিরাপদ বোধ করতে থাকলাম। আবার নির্ভয়ে রাস্তায় বেরোলাম। পত্রিকা পড়ে জানতে পারলাম ফেনেলির অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, তিন সপ্তাহের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবে। কেওয়াফ নেই, ওর আড্ডা বন্ধ হয়ে গেছে, আমার চাকরিও নেই। তবে তাতে কোনরকম দুশ্চিন্তা হচ্ছে না আমার। প্রচুর টাকা জমে গেছে আমার হাতে। কেওয়াফের টাকাটা অন্য একটা অ্যাকাউন্টে রেখে দিলাম। গত এক সপ্তায় জুলির সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছি এবং ঘটনাটা নিয়ে কোনরকম আলোচনা করলাম না আমরা।

এক সকালে ডরমিটরির দরজায় উঁকি দিয়ে আমাকে বললেন ব্রাদার বার্নহার্ড: 'নাস্তা সেরে আমার অফিসে একবার এসো তো।'

'আচ্ছা, সার,' বললাম।

তাঁর অফিসে গিয়ে দেখি অনেকেই বসে আছেন। স্কুলের নীচের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ইনচার্জ সিস্টার সুপিরিয়র, ফাদার কুইন ও একজন অপরিচিত লোক। পুলিশের লোক মনে হলো আমার।

মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ পেতে দিলাম না। ব্রাদার বার্নহার্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'কীজন্যে আসতে বলেছিলেন, সার?'

'ফ্র্যান্সিস,' ব্রাদার বললেন: 'ইনি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিশনের ইনভেস্টিগেটর বুচাল্টার।' বুচাল্টারকে বললেন: 'এই ছেলেটার কথাই আপনাকে বলেছিলাম।'

বুচাল্টারের কথা বলার অপেক্ষায় রইলাম। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ঘরে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করল।

অবশেষে সিস্টার সুপিরিয়র বললেন: 'ফ্র্যান্সিস, এই স্কুলের তুমি একজন ভাল ছেলে। সেই শিশুকাল থেকে তোমাকে দেখে আসছি। এখন তোমাকে আমি কয়েকটা কথা বলব। কথাগুলো বলতে ইচ্ছে করছে না, তবু বলব। ফ্র্যান্সিস, চমৎকার একজন ক্যাথলিক বয় হওয়ার পাশাপাশি আর কিছু হওয়ার কি ইচ্ছে আছে তোমার?'

'না, ম্যা'ম,' সাবধানে জবাব[illegible]

হাসলেন ফাদার কুইন। 'কী [illegible] না?' আনন্দে যেন বিস্ফোরিত হলেন তিনি। 'আমি যা বলেছি, সেটাই [illegible] বার চুপ হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে বললেন সিস্টার সু[illegible] কেউ এসে যদি বলে তুমি ভিন্ন ধর্মের লোক, তাহলে কী রকম অনুভূতি হবে তোমার, ফ্র্যান্সিস?'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল আমার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, স্বস্তির নিঃশ্বাস। যাক, ওই গোলাগুলির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে আনা হয়নি আমাকে। জবাব দিলাম: 'বললেও বিশ্বাস করব না, ম্যা'ম।'

সারাঘরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল, সবার মুখে গর্বের হাসি, আমার উদ্দেশ্যে বলা হলো: 'খুব ভাল একজন ক্যাথলিক বয়।'

সিস্টার সুপিরিয়রের আড়ষ্টতা কেটে গেল, কথা বললেন আগের চেয়ে সহজ ভঙ্গিতে: 'ফ্র্যান্সিস, তোমার বাবা-মায়ের কথা কি কিছুই মনে করতে পারো না তুমি?'

প্রশ্নটা বোকার মত করা হলো বলে মনে হলো আমার। আমি যেমন জানি, তিনিও জানেন, আমার বোধ হওয়ার আগে থেকেই এই এতিমখানায় আছি আমি। ভদ্রভাবে জবাব দিলাম: 'না, ম্যা'ম।'

'মিস্টার বুচাল্টার এখানকার এতিম ছেলেমেয়েদের মা-বাবার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন, তদন্ত করছেন,' সিস্টার সুপিরিয়র বললেন। 'মাঝে মাঝেই তিনি ওদের অতীত ইতিহাস জানার চেষ্টা করেন, ওদের সাহায্য করতে চান। তিনি তোমাকে কিছু বলবেন।' বলে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন তিনি।

অস্বস্তি বোধ করছেন মিস্টার বুচাল্টার। 'ফ্র্যান্সিস, কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে। সেইন্ট টেরেসি থেকে ডিগ্রি নেয়ার পর তোমার কেসটা নিয়ে আবার তদন্ত করা হয়েছে।' তাঁর কণ্ঠস্বরে কেমন একধরনের মাপ চাওয়ার ভঙ্গি। 'এখান থেকে কেউ যখন হাই স্কুলে যায়, তার ব্যাপারে নতুন করে খোঁজ-খবর নিই আমরা। অনুমতি দেয়ার আগে শিওর হয়ে নিই–যদি কোন আত্মীয়-স্বজন পাওয়া যায়। যাই হোক, অত বিস্তারিত বলার কোনও প্রয়োজন নেই, তোমার একজন আত্মীয়র খোঁজ পাওয়া গেছে, তোমার এক মামা। কিছুদিন আগে চিঠি লিখে তোমার জন্মের আগে তোমার মায়ের নিউ ইয়র্কে চলে আসার কথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তোমাকে আমরা পাওয়ার আগেই মারা গেছেন তোমার মা। হাতের একটা আংটি দেখে তোমার মাকে বোন বলে সনাক্ত করেছেন তোমার মামা। আংটিটা দামি নয়, তবে কিছুটা অস্বাভাবিক। আংটিটা দেখার আগেই ওটার যে বিবরণ দিয়েছেন তিনি, হুবহু মিলে গেছে। এখন, আইনত, তোমার মামা চান তুমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে থাকো। খুব দায়িত্বশীল একজন ভাল মানুষ তিনি, তাতে কোন সন্দেহ নেই আমাদের। তাঁর নিজের দুটো বাচ্চা আছে। তাঁদের সঙ্গে নিজের ছেলের মতই মানুষ করতে চান তোমাকে।' দীর্ঘক্ষণ একটানা কথা বলে থামলেন মিস্টার বুচাল্টার।

শান্তকণ্ঠে ফাদার কুইন বললেন: 'কিন্তু, ফ্র্যান্সিস, তিনি আমাদের চেয়ে আলাদা। আমরা যে ধর্মে বিশ্বাসী, তিনি তা নন।' শেষদিকে ভারি হয়ে এল তাঁর কণ্ঠ। 'তিনি খ্রিস্টান নন।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম আমি। 'খ্রিস্টান নন?' বুঝতে না পেরে যেন ফাদারের কথার প্রতিধ্বনি করলাম আমি।

'না, ফ্র্যান্সিস,' ধরা গলায় বললেন ফাদার। 'তিনি ক্যাথলিক নন।'

কী বলছেন তিনি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

'ফ্র্যান্সিস,' ফাদার বার্নহার্ড বললেন: 'অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর ওখানে থাকতে যেতে হবে তোমাকে, আমাদের কিছু নিয়ম-কানুন সারার পর। তবে এখানে যে শিক্ষা

তুমি পেয়েছে, সেগুলো না ভুলতে তোমাকে অনুরোধ করব, ফ্র্যান্সিস। যে গির্জা তোমাকে এতদিন আশ্রয় দিয়ে এসেছে, তোমাকে বড় করে তুলেছে, তার কথা তুমি ভুলো না। সব সময় একজন ভাল ক্যাথলিক থাকার চেষ্টা কোরো, যে যা-ই বলুক না কেন তোমাকে।'

'থাকব, ব্রাদার বার্নহার্ড,' বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলাম যেন আমি।

'তোমার মামা বাইরে অপেক্ষা করছেন, ফ্র্যান্সিস। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাও?' সিস্টার সুপিরিয়র জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, ম্যা'ম,' জবাব দিতে একটুও দ্বিধা করলাম না। বন বন করে ঘুরছে যেন মগজটা। আমার একজন আত্মীয় আছে। আমার জন্ম পরিচয় আছে। বংশ পরিচয়হীন জারজ নই আমি।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন মিস্টার বুচাল্টার। 'আসুন, মিস্টার কেইন।'

দরজায় দেখা দিলেন একজন ভদ্রলোক। ছয় ফুট লম্বা, মাথা টাক হতে শুরু করেছে, চওড়া কাঁধ, লাল মুখ। কোমল বাদামী চোখের তারা যেন কুয়াশাচ্ছন্ন। ওঁর দিকে তাকিয়ে থেকে একটা কথাই মনে এল আমার, কোথায় যেন শুনেছি যারা ক্যাথলিক নয়, তার নরকে যাবে। তবে নরকে যেতে কোনও আপত্তি নেই আমার যদি এমন কাউকে পাই যিনি আমাকে ভালবাসবেন, মায়া করবেন, আদর-স্নেহ দিয়ে মানুষ করবেন, আমার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি, আর আমার মনে হলো পুরো ঘরটা আলোকিত হয়ে গেল। হাসিটা যেন অন্তরঙ্গতার বিদ্যুৎতরঙ্গ ছড়িয়ে দিল আমাদের দেহের পরতে পরতে।

'তুমিই তাহলে ফ্র্যাঙ্কি, আমার ভাগ্নে!' তিনি বললেন। উষ্ণতায় ভরা ভারি কণ্ঠস্বর সামান্য যেন কেঁপে উঠল পরম আবেগে।

'হ্যাঁ, সার,' জবাব দিতে গিয়ে দেখলাম আমার গলাও কাঁপছে। নিজের অজান্তেই পানি জমে গেল চোখের কোণে। বুকের মধ্যে তৈরি হলো অদ্ভুত এক ভাল লাগা। আমি বুঝে গেছি, এই পৃথিবীতে আমি আর একা নই, আমার সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়ার মত একজন মানুষকে আমি পেয়ে গেছি। তাঁর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক, আমি তাঁর বংশেরই ছেলে।

কিছুক্ষণ পর তাঁর নামটা জানলাম, পদবী আমার মতই 'কেইন', তবে বানানটা ভিন্ন।

আর আমি যে একজন ইহুদি, এই কথাটা জানতে পারলাম আরও কিছুদিন পর।

চৌদ্দ

কোথাও শুনেছিলাম খবর ছড়ায় বাতাসের গতিতে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত ডরমিটরিতে ছড়িয়ে গেল আমাকে দত্তক নেয়া হয়েছে। আমাকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন শুরু করল ছেলেরা। যতটা জানি বললাম। বিকেল হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি আমি। জুলিকে গিয়ে জানাতে হবে খবরটা।

প্রথমে ওকে ফোন করে জেনে নিলাম, বাড়িতে অন্য কেউ আছে কিনা। তারপর ওপরতলায় উঠে গেলাম।

রান্নাঘরের দরজা খুলে দিয়ে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল ও। ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। যা যা ঘটেছে সব গড়গড় করে বলে গেলাম। বিছানার পায়ের কাছের চেয়ারটায়ে বসে সব শুনল ও। আমি বসেছি বিছানার কিনারে।

আমার কথা শেষ হলে ও বলল: 'যাক, তোমার একটা গতি হলো, খুশি হলাম। এ রকম একটা কিছু প্রয়োজন ছিল তোমার।' কেমন ক্লান্ত আর প্রাণহীন ওর কণ্ঠস্বর।

ওর দিকে তাকালাম: 'মনে হচ্ছে তুমি খুশি হওনি।'

উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। আমার দিকে পিছন করে। একটা মিনিট কোন কথা বলল না। তারপর কঠিন, শুকনো কণ্ঠে বলল: 'আমি বাড়ি চলে যাব, ফ্র্যাঙ্কি।' আগে আর কখনও এই স্বরে আমার সঙ্গে কথা বলেনি ও।

'কেন?' জিজ্ঞেস করলাম। ও জবাব দেয়ার আগেই বললাম: 'যেয়ো না। আমি তোমার কাছে ঠিকই আসব, যা-ই ঘটুক না কেন আমার।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরে তাকাল ও। 'কেন, বিনে পয়সায় আমাকে পাওয়ার জন্যে?'

মাথা নাড়লাম। 'না, আমি তোমাকে পছন্দ করি, ভালবাসি। ভাল করেই জানো সেটা তুমি, বহুবার আমাকে দিয়ে বলিয়েছ এ কথা।'

'না, তুমি আমাকে ভালবাস না,' বরফের মত শীতল শোনাচ্ছে ওর কণ্ঠ: 'যে মেয়ে তোমাকে আমার মত সঙ্গ দেবে তাকেই তুমি এ কথা বলবে।' আবার জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'কোনদিন আর আমাদের দেখা হবে না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললাম: 'কেন, জুলি? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

আবার আমার দিকে ফিরল ও। 'কেন, জানতে চাও? ঠিক আছে, শোনো, তোমার মত একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে থেকে আমার কোন লাভ নেই। আমার জন্যে কিছুই করতে পারবে না তুমি। যদি বেকায়দায় পড়ি, আমাকে বিয়েও করতে পারবে না। আমি শুধু তোমার শিক্ষকতা করতে পারব, কিন্তু তোমার কাছে কিছুই পাওয়ার নেই আমার। না, ফ্র্যাঙ্কি, আর দরকার নেই। সামার স্কুল শেষ, মজা যা পাওয়ার পেয়েছ, এখন লক্ষ্মী ছেলের মত কেটে পড়ো।'

উঠে গিয়ে ওর হাত ধরলাম। ঝাড়া মেরে আমার হাতটা সরিয়ে দিল ও।

'কিন্তু জুলি...'

'তুমি চলে যাও, ফ্র্যাঙ্কি!'

গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠল আমার। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। 'গুড-বাই, জুলি!'

জবাব দিল না ও। দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালাম। ওর বিছানার মৃদু শব্দ কানে এল। ওর কান্না শুনতে পেলাম। দরজার কাছ থেকে সরে এলাম। বেরিয়ে এলাম অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে।

রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। বিকেলের উজ্জ্বল রোদ ঝলমল করছে। কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। শীত শীত লাগছে। পার্কে গিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম শূন্য দৃষ্টিতে। মনের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা যেন চিৎকার করছে জুলি, জুলি, জুলি।

*

চিঠি লিখে আমার দত্তক নেয়ার খবরটা জেরিকে জানালাম। জবাবে ও লিখল খুব খুশি হয়েছে। সপ্তাহটা যেন উড়ে গেল এবং অবশেষে এসে গেল আবার যাবার দিন। বিকেল বেলা আমার মামা আসবেন আমাকে নিয়ে যেতে। দুটো কার্ডবোর্ডের বাক্সে আমার জিনিসপত্র সব ভরে নীচতলায় সুপারিনটেনডেন্টের অফিসে নিয়ে গেলাম।

নিজের ঘরে ফিরে যেতে খারাপ লাগছে। বেযমেন্টে জিমনেশিয়ামে হট্টগোল শোনা যাচ্ছে। কী হচ্ছে দেখতে যাওয়ার কথা ভাবলাম।

সিঁড়ি বেয়ে নামছি, এ সময় লাঞ্চের ঘণ্টা বাজল। আবার ওপরতলায় উঠে ডাইনিং-রুমে ফিরে এলাম। ব্রাদার বার্নহার্ড খাওয়া শুরুর আগে ঈশ্বরের গুণগান করছেন, টেবিলে বসে মাথা নিচু করে শুনছি। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে আমার, যেটা আগে কখনও হয়নি। আমার চারপাশের চেহারাগুলো কেমন আজব, নিস্পৃহ মনে হচ্ছে। সাদা মার্বেলে তৈরি খাবার টেবিলের ওপরটাও কেমন নতুন লাগছে। বহু বছর আগে চাবি দিয়ে আঁচড় কেটে আমার নাম লিখে রেখেছিলাম ওটার এক জায়গায়, কবে কোন সময় ভুলেই গেছি, আঙুল রাখলাম তাতে। খিদে নেই আমার। ভাবছি আমার মামী আর মামাত ভাইবোনেরা কীভাবে নেবে আমাকে, পছন্দ করবে কিনা কে জানে। তারপর ভাবলাম, এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে চাই না আমি।

অর্ধেক খাওয়া হতেই খাবার টেবিল থেকে উঠে যাবার অনুমতি চাইলাম ব্রাদার বার্নহার্ডের কাছে। আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছেন তিনি। অনুমতি দিলেন।

আঙিনায় নেমে এলাম আমি। এই জায়গাটাতে কতদিন বল খেলেছি আমি, কত বছর নিয়মিত সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছি ক্লাসে যাওয়ার জন্য। এখন ওটা শূন্য, নির্জন, কিন্তু কল্পনায় হঠাৎ করেই দেখতে পেলাম অসংখ্য ছেলেমেয়ের হই-চই, স্কুলের ঘণ্টা বাজার অপেক্ষায় আছে তারা। বইয়ের স্তূপ ঘাসের ওপর ফেলে রেখে ছুটাছুটি করে খেলছে অনেকে। গির্জার চূড়ার দিকে মুখ তুলে তাকালাম, মনে হলো যেন এখনই বেজে উঠবে

ঘণ্টা।

আমার সামনে একটা ছায়া পড়ল। তাকিয়ে দেখি ব্রাদার বার্নহার্ড।

'তোমার খুব খারাপ লাগছে, তাই না, ফ্র্যান্সিস?' কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

মাথা ঝাঁকালাম।

'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি আমি, ফ্র্যান্সিস,' তিনি বললেন। 'বহু বছর ধরে দেখছি তোমাকে, সেই শিশুকাল থেকে। প্রথম যেদিন হাঁটতে শিখলে, পরিষ্কার মনে আছে আমার। উঠে দাঁড়ালে, পা বাড়ালে, ধপাস করে পড়ে গেলে। কাঁদনি তুমি। আবার উঠে দাঁড়ালে। আবার হাঁটলে। তুমি যখন অসুস্থ হতে, তোমার পাশে বসে থাকতাম আমি। আমিই ছিলাম তোমার বাবা, তোমার মা। পরম আদরে তোমাকে আগলে রাখতাম। যে কারও চেয়ে তোমাকে আমি ভাল চিনি, এমনকী তোমার নিজের চেয়েও। অনেক জিনিস তোমাকে শিখিয়েছি আমি, আবার অনেক কিছু তুমি নিজে নিজেই শিখেছ। জীবনে এখনও অনেক কিছু শেখার আছে তোমার। দোয়া করি, তুমি ভাল থাকো, জীবনে উন্নতি করো।'

মুখ তুলে তাকালাম তাঁর দিকে। 'আপনি সত্যিই মহান, ব্রাদার বার্নহার্ড। ধন্যবাদ দিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।'

হাসলেন তিনি। 'আমাকে ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই, ফ্র্যান্সিস। কৃতজ্ঞ যদি কারও কাছে হতেই হয় তো এই গির্জার কাছে হও। এখানে তোমাকে অনেক ভাল ভাল জিনিস শেখানোর চেষ্টা আমরা করেছি। কিন্তু এখানকার চার দেয়ালের বাইরে,' রাস্তার দিকে হাত তুললেন তিনি: 'আরও বহু কিছু আছে, জীবনে টিকে থাকতে হলে যেগুলো তোমাকে শিখতে হবে। আমরা যারা এখানে বাস করি, নিরাপদ, শান্ত জীবন আমাদের, কোন ঝুটঝামেলা পোহাতে হয় না। এখানে থাকলে তোমার ওপর নজর রাখতে পারি আমরা, কিন্তু বাইরে...তোমাকে সাহায্য করার কে আছে ওখানে? কে তোমাকে আশ্রয় দেবে, নিষ্ঠুর এই সমাজে নিরাপত্তা দেবে? একজনই আছেন, তাঁর কথা প্রতিদিনই বলা হয় তোমাদের।' রুমাল বের করে নাক মুছলেন তিনি। 'আবেগের কথা অনেক হয়েছে, ফ্র্যান্সিস। ফাদার কুইন, সিস্টার সুপিরিয়র আর তোমার অন্যান্য টিচারদের কাছ থেকে বিদায় নাওগে। আরেকটা কথা, ফ্র্যান্সিস, তোমাকে আমরা মিস করব।'

'আপনাদের জন্যে আমারও মন খারাপ লাগবে, সার,' বললাম। 'ওঁদের কাছ থেকে সকালেই বিদায় নিয়ে রেখেছি।'

'গুড বয়!' আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটার দিকে এগোলেন তিনি। 'তুমি চলে যাওয়ার আগে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব আমি।' বলে বাড়িতে ঢুকতে গেলেন।

'ব্রাদার বার্নহার্ড,' ডাকলাম আমি।

ফিরে তাকালেন তিনি। 'বলো?'

'ইহুদি হয়ে জন্ম গ্রহণ করা কি পাপ?'

আমার দিকে তাকিয়ে কোমল হয়ে এল তাঁর চোখ। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর শান্তকণ্ঠে বললেন তিনি: 'না, বাবা, পাপ হবে কেন? মানুষ তো তার নিজের ইচ্ছেয় জন্মায় না। তা ছাড়া আরেকটা কথা আমরা ভুলে বসে থাকি, আমাদের যিশু খ্রিস্টও ইহুদি হয়েই জন্মেছিলেন।

'কিন্তু ব্রাদার, আমার ইহুদি পরিবারের সঙ্গে থেকে আমি তো গির্জায় আসতে পারব না। প্রার্থনায় অংশ নিতে পারব না। তারমানে মৃত্যুর পর অনন্তকাল আমাকে নরকের আগুনে জ্বলতে হবে।'

এগিয়ে এসে আমার একটা হাত তুলে নিলেন তিনি। 'ফ্র্যান্সিস,' নিচুস্বরে বললেন: 'যতই আমরা ভাবতে ভালবাসি না কেন, স্বর্গ ক্যাথলিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ওটা এমন একটা জায়গা যেখানে সব ভাল মানুষেরই সমান অধিকার, তাদেরকে সেখানে স্বাগত জানানো হবে–আমি অন্তত এটা বিশ্বাস করি–আমাদের লর্ড যে ধর্মাবলম্বীই হন না কেন, অন্য ধর্মেরও যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে, তিনি তাদের পক্ষ নেবেন। সব সময় ভাল হওয়ার চেষ্টা করবে, ফ্র্যান্সিস, মানুষকে ভালবাসবে। যেটা ঠিক, সেটাই করবে, তাহলেই আর কোন ভয় থাকবে না তোমার।' হাসলেন তিনি: 'আমার কথা বুঝতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ, সার,' জবাব দিলাম। 'মনে হয় পেরেছি।'

'গুড,' তিনি বললেন। 'এখন আমাকে যেতে হবে। এতক্ষণে নিশ্চয় লাঞ্চ শেষ হয়ে এসেছে।' আদর করে আমার চুলে আঙুল চালিয়ে দিলেন তিনি।

লাঞ্চ শেষে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করেছে ছেলেরা। সব ক'টা দরজা দিয়ে আঙিনায় নেমে আসছে। জিমনেশিয়ামের দরজা দিয়ে আমি বিল্ডিঙে ঢুকলাম।

জিমনেশিয়ামের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালাম। ঘরের অন্যপ্রান্তে বাস্কেটবল খেলছে দুটো ছেলে। পিটার স্যানপেরো তাদের একজন। ওর দিকে এগোলাম। গুড-বাই জানাব। আমাদের মধ্যে যা হয়েছে ওকে ভুলে যেতে অনুরোধ করব।

আমাকে এগোতে দেখে খেলা থামিয়ে দিল ওরা। তাকিয়ে রইল। বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। আমার ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল। কেন, বুঝলাম না। বহু আগেই আমি শিখেছি, বিপদ টের পেলে ভাবেভঙ্গিতে সেটা প্রতিপক্ষকে বুঝতে দেয়া ঠিক নয়। তাই ফিরে না গিয়ে যেমন হাঁটছিলাম তেমনি হাঁটতে থাকলাম। ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পিটারের সামনে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম।

'যা হয়েছে, ভুলে যাবে?' আমি বললাম।

আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও, হাত বাড়াল না। তারপর এক পা এগিয়ে এল। 'নিশ্চয় ভুলে যাব,' বলেই ঘুসি মারল আমার চোয়ালে। আমার পিছনে দাঁড়ানো উবু হয়ে থাকা একটা ছেলের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চিত হয়ে পড়ে গেলাম। কয়েক জোড়া হাত চেপে ধরল আমাকে। নড়তে পারলাম না। এতটাই হতবাক হয়ে গেছি, পাল্টা আঘাত হানার কথাও মাথায় ঢুকল না। আমার গায়ের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে পিটার।

'ইহুদি কুত্তার বাচ্চা!' গাল দিয়ে উঠল ও। 'পরিচয় লুকিয়ে আমাদের স্কুলে ঢুকে

বসে আছো!' আমার গায়ে লাথি মারল। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে গেল আমার সারা দেহে। নিচু হয়ে আবার আমার মুখে ঘুসি মারল ও। কোনমতে একটা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ওর শার্টের বুকের কাছটা চেপে ধরলাম। টান দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করল ও, একইসঙ্গে আবার আমার মুখে ঘুসি মারল। আমার অন্য হাতটাও ছাড়িয়ে নিলাম। এক হাত দিয়ে ওর ঘাড় পেঁচিয়ে ধরে আরেক হাতে গলা টিপে ধরলাম। ঠেসে ধরলাম দেয়ালের সঙ্গে। ওর বন্ধুরা আমাকে পিটিয়ে চলল। কেয়ার করলাম না। জীবনে এই প্রথম ভাবনাচিন্তা করে মারপিট করছি না আমি। প্রচণ্ড ঘৃণা ও রাগে অন্ধ হয়ে গেছি। ওর গলা ও ঘাড়ে চাপ বাড়ালাম। তারপর মাথাটা ঠুকতে শুরু করলাম পিছনের দেয়ালে। ওর হাত আমার পেটে অনবরত ঘুসি মেরে চলেছে। আমার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করেছে। অন্য ছেলেগুলো আমাকে টেনে মাটিতে ফেলে দিল আবার। তবে পিটারকে ছাড়লাম না। ওকে নিয়ে পড়লাম আমার সঙ্গে। টানাটানিতে আমার জ্যাকেট ছিঁড়ে গেল। কিন্তু তবু কেয়ার করলাম না। মগজে একটাই ভাবনা, পিটারকে আমি খুন করব। সিমেন্টের মেঝেতে ওর মাথা ঠুকতে লাগলাম। শক্ত একটা হাত আমার কাঁধ চেপে ধরল। টেনে তুলে দাঁড় করাল। সরিয়ে নিল পিটারের কাছ থেকে। হঠাৎ করেই নীরব হয়ে গেল ঘর। সবাই চুপ। দেখলাম, ব্রাদার বার্নাহার্ড ধরে রেখেছেন আমাকে। নড়তে পারছি না আমি। পিটার পড়ে আছে মেঝেতে।

রাগে জ্বলছে ব্রাদারের চোখ। 'শুরুটা কে করেছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

ভবিষ্যতের বিপদের কথা না ভেবে ফস করে বলে বসল একটা অল্প বয়েসী ছেলে: 'পিটার। ও বলছিল, নোংরা ইহুদিটাকে শিক্ষা দেয়ার সময় এসেছে।' বলেই চুপ হয়ে গেল ছেলেটা।

আমার কাঁধে ব্রাদারের হাতের আঙুলগুলো ঢিল হলো না। বললেন: 'ডরমিটরিতে যাও।' পিটারকে বললেন: 'বাড়ি যাও। আর কোনদিন এই জিমনেশিয়ামে ঢুকবে না। এখানে যারা থাকে এই জায়গাটা শুধু তাদের জন্যে।'

ওরা বেরিয়ে যেতে শুরু করল, আমাকে ধরে রাখলেন ব্রাদার। সবশেষ ছেলেটি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমার কাঁধ থেকে হাত সরালেন তিনি। আমার দিকে তাকিয়ে নরম কণ্ঠে বললেন: 'ওদের ওপর আক্রোশ রেখো না। এখনও ওদের অনেক শিক্ষা বাকি।'

তাঁর দিকে তাকালাম। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে আমার। নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। বুকের একপাশে প্রচণ্ড ব্যথা। কিছু বললাম না।

'যাও, রক্ত ধুয়ে ফেলো,' কোমলকণ্ঠে বললেন তিনি। 'তোমার মামা অপেক্ষা করছেন। কাপড়চোপড় সব বাক্সে ভরে ফেলেছ, পরনের কাপড় পরেই যেতে হবে, বদলাতে পারবে না।'

গোসলখানায় ঢুকে মুখ ধুলাম। চুপচাপ আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রাদার বার্নাহার্ড। আমাকে কাগজের তোয়ালে এগিয়ে দিলেন। মুখ মুছলাম। তারপর নীরবে গোসলখানায় চললাম সুপারিনটেনডেন্টের অফিসে।

আমার মামা রয়েছেন সেখানে। তাঁর সঙ্গে একজন মহিলা, নিশ্চয় মামী। বুঝতে পারছি, ভয়াবহ চেহারা হয়েছে আমার। কাপড় ছিঁড়ে ফালা ফালা, রক্তে মাখামাখি। মামীর মুখ সাদা হয়ে গেছে। ওঁদের দিকে এগোলাম। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে আমার বুকের একপাশে। কানের ভিতর সোঁ-সোঁ গর্জন। চোখের সামনে যেন চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল অসংখ্য মুখ–ব্রাদার বার্নহার্ড, মামা, মামী, পিটার, মার্টিন, রেমন্ড, জেরি, জেরির বাবা, সিস্টার অ্যানি, ফাদার কুইন, জিমি কেওয়াফ, ফেনেলি, জুলি।

চোখ মেলার চেষ্টা করলাম। খুলতে কষ্ট হচ্ছে। চোখের পানিতে যেন সাঁতার কাটছে চোখ দুটো। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় যেন খুলতে পারলাম অবশেষে। সাদা একটা ঘরে রয়েছি আমি। আমার মামা-মামী ও ব্রাদার বার্নহার্ড আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছেন। চোখের কোণ দিয়ে একজন নার্সকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। বুঝতে পারলাম না আমার ঘরে নার্স কেন। কথা বলার চেষ্টা করলাম।

আমার ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করলেন ব্রাদার বার্নহার্ড। 'চুপ করে থাকো, কথা বোলো না। রুজভেল্ট হাসপাতালে রয়েছ তুমি। তিনটে পাঁজর ভেঙে গেছে। চুপচাপ থাকো।'

মাথাটা ছেড়ে দিলাম। গড়িয়ে পড়ল বালিশে। দেয়ালের ক্যালেন্ডারের একমাত্র পাতাটায় বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখলাম 'সেপ্টেম্বর ১, ১৯২৫'।

সেইন্ট টেরেসির এতিমখানায় ওটাই আমার শেষ দিন।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

হাসপাতালে থাকার দিনগুলোতে আমার মামা-মামীর সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম। শহরতলীর একটা পোশাকের দোকানে সেলসম্যানের কাজ করে আমার মামা। গত দশ বছর ধরে নিউ ইয়র্কে আছেন তাঁরা। ওয়াশিংটন হাইটসে একটা আরামদায়ক পাঁচ কামরার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে বাস করছেন।

আমার মামী একজন শান্ত, ভদ্র মহিলা, এক নজরেই ভাল লেগে যায়। তাঁর কথায়, কাজে একটিবারের জন্য মনে হয়নি আমার তিনি আমাকে অপছন্দ করেন। প্রতিদিন হাসপাতালে আসেন তিনি। হাতে করে কোন না কোন উপহার ফল, বিস্কুট কিংবা বই নিয়ে আসেন। যতটা বেশি সময় থাকা যায়, থাকেন, আমাকে সঙ্গ দেন। মাঝে মাঝে আমার মামাত বোনদের সাথে করে নিয়ে আসেন। তাঁর দুই মেয়ে, একজনের বয়েস আট, আরেকজনের দশ।

প্রথম প্রথম আমাকে দেখে লজ্জা পেত ওরা, কথা বলতে বিব্রত বোধ করত, তবে অপছন্দ করেনি বোঝা যেত। শেষ দিকে যখন সহজ হয়ে এল, ঘরে এসেই গালে চুমু খেত, বেরোলের সময়ও চুমু খেত।

মরিস আর বার্থা কেইন এবং তাঁদের মেয়েরা ইস্টার ও আইরিন এখন আমার পরিবারের লোক, একটা সত্যিকারের পরিবার বলতে যা বোঝায়। ওদেরকে আমি বুঝতে পারি, ওরাও আমাকে বুঝতে পারে। তবে কখনও তো পরিবারের সঙ্গে থাকিনি, তাই সবার কাছে যে রকম লাগার কথা, আমার কাছে কিছুটা অন্যরকম লাগত, জটিলই বলা চলে। তবে মিশতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না আমার।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে হাসপাতাল ছাড়লাম আমি। ঢুকে পড়লাম নতুন এক পৃথিবীতে। ছোট একটা বুইক গাড়ি আছে মামার, সেটাতে চড়িয়ে আমাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন তিনি। একাই এলেন আমাকে নিতে। অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেখলাম আমার জন্য একটা পার্টির ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা। আন্ট বার্থা অর্থাৎ আমার মামী একটা কেক বানিয়েছেন। আমার আরও কিছু আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত আছেন সেখানে। পার্টি শেষে সবাই চলে গেলে আমাকে আমার ঘর দেখানো হলো। আইরিনের ঘর ছিল এটা--দুবোনের মধ্যে ও-ই বড়। আমাকে ঘরটা দিয়ে সে এখন ইস্টারের সঙ্গে একই ঘরে শোবে। ইস্টারের নামটা সহজ করে নিয়ে ইজি বলে ডাকে ওরা। আমার কাপড়চোপড় আলমারিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মনে হলো শান্তিতেই বাস করা যাবে এ ঘরে।

ঢোকার আগে মামা বলেছেন: 'এটা তোমার ঘর, ফ্র্যাঙ্কি।' তারপর দরজা খুলে দিয়ে আমাকে ঢুকতে ইশারা করেছেন। মামীকে নিয়ে অনুসরণ করলেন আমাকে।

বিছানা করে রেখেছে আমার মামাত বোনেরা। চারপাশে তাকালাম। প্রথমেই চোখে পড়ল ড্রেসারের ওপর রাখা একজন অল্পবয়েসী মহিলার ছবি।

ওটার দিকে আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মামী বললেন: 'তোমার মায়ের ছবি, ফ্র্যাঙ্কি। ওই একটা ছবিই আছে আমাদের কাছে। ভাবলাম, তোমার ঘরেই রেখে দিই, তোমার ভাল লাগবে।'

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছবিটা তোলার সময় মা'র বয়েস সম্ভবত উনিশ-বিশ ছিল। চুল আঁচড়ে পিছনে নিয়ে গিয়ে খোঁপা করে বাঁধা, যখন তোলা হয়েছিল সেসময়কার ফ্যাশন। মুখে প্রশান্ত হাসি। চোখ দুটোতেও মিটিমিটি হাসি। ঠোঁট ও নাকের সঙ্গে মানানসই চোখা চিবুক। কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে।

মামা বললেন: 'তোমার মায়ের সঙ্গে তোমার চেহারার অনেক মিল, ফ্র্যাঙ্কি। তোমার চোখের রঙ, মুখের গঠনে এতই মিল, ছেলে না হয়ে মেয়ে হলেই বেশি মানাত তোমাকে।' ছবিটার কাছে এসে, ওটাকে তুলে নিয়ে খানিক দেখে আবার রেখে দিলেন। 'মা'র কথা তোমার শুনতে ইচ্ছে করে?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'কাপড় বদলাও,' তিনি বললেন। 'বদলাতে বদলাতে শোনো।'

ড্রেসারের ড্রয়ার খুললেন মামী। একটা নতুন পাজামা বের করে আমাকে পরতে দিলেন। হেসে বললেন: 'আমার মনেই হচ্ছিল নতুন কিছু কাপড়-চোপড় তোমার দরকার হবে।'

'থ্যাংক ইউ,' মামীর হাত থেকে কাপড়টা নিলাম। বিচিত্র এক অনুভূতি হচ্ছে আমার। শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করলাম।

'তোমার মাকে খারাপ ভেবে কখনও কষ্ট পেয়ো না, ফ্র্যাঙ্কি,' মামা বললেন। 'অসাধারণ মেয়ে ছিল ও। অনেক বছর আগে, শিকাগোতে থাকতাম আমরা। সেখান থেকেই এসেছি। তোমার মা ছিল আমাদের পরিবারের গর্ব। বিশ বছর বয়েসেই কলেজ পাশ করে বেরিয়ে গিয়ে কাজে লেগে পড়েছিল। এই ছবিটা এর কিছুদিন পরে তোলা, ডিগ্রি নেয়ার কয়েক মাস পরে। খুব শক্ত মনের মানুষ ছিল তোমার মা। সব সময় পুরুষ ও নারীর সমঅধিকার, নারীদের ভোটের অধিকারের কথা বলত। ওকে নিয়ে গর্বের শেষ ছিল না আমাদের। এখনকার মত সে-সময় মেয়েদের ভোট দেয়ার নিয়ম ছিল না। এ নিয়ে মিটিঙে বক্তৃতা দিত ও। খুব ভাল হিসেব জানত। শিকাগোর এক মস্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর–মার্শাল ফিল্ডে হিসেব রক্ষকের চাকরি করত। আগের অ্যাকাউনটেন্ট মাসে মাসে কিছু ভুল করে রেখে গিয়েছিল, সেই ভুলগুলো ধরেছিল তোমার মা। ওই সময় আমি নিউ ইয়র্ক চলে আসি। এর কিছুদিন পর একটা ছেলের প্রেমে পড়েছিল ও, ওই দোকানেই কাজ করত ছেলেটা। ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিল তোমার মা, কিন্তু আমার বাবা-মা মত দেননি, তার কারণ ও ইহুদি ছিল না, আর এসব ব্যাপারে আমার বাবা-মা ছিলেন ভীষণ কড়া। শেষে একদিন ওই ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল তোমার মা। আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিল, নিউ ইয়র্কে আমার কাছেই

আসতে চেয়েছিল ও। ওটাই শেষ, এরপর আর কোন খবরই পাইনি ওর। ওকে খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি। কোনই হদিস পাইনি ওর। এর কিছুদিন পর আমার মা মারা যান, বাবা চলে আসেন নিউ ইয়র্কে, আমাদের কাছে। তবে এরপর আর বেশিদিন বাঁচেননি তিনি। মা'র শোকে ভেঙে পড়েছিলেন।'

আমার মা'র ছবিটা আবার তুলে নিয়ে তাকিয়ে রইলেন ওটার দিকে।

'অতীত নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই,' মামী বললেন। 'মানুষের উচিত বর্তমানকে নিয়ে ভাবা। আমি জানি, তোমার নানা-নানী তোমাকে পেলে খুব খুশি হতেন, আমরা যেমন হয়েছি। আমি চাই তুমি আমাদের ভালবাস, ফ্র্যাঙ্কি, আমরা যেমন তোমাকে ভালবাসি।' মামার হাত থেকে ছবিটা নিয়ে ড্রেসারে রেখে দিলেন তিনি।

'ভালবাসব, ম্যা'ম।' পাজামাটা পরে নিয়েছি। পরনে যে প্যান্টটা ছিল সেটা ভাঁজ করে রেখে দিলাম চেয়ারের হেলানে। বিছানার কিনারে বসে জুতো, মোজা খুলে নিলাম।

'গুড নাইট,' মামা-মামী দুজনেই বললেন। মামী নিচু হয়ে আমার গালে চুমু খেলেন।

'গুড নাইট,' আমি জবাব দিলাম।

দরজার কাছে গিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বাতির সুইচে হাত রেখে মামী বললেন: 'ফ্র্যাঙ্কি?'

'বলুন, ম্যা'ম?' জবাব দিলাম।

'ম্যা'ম নয়, আমাকে মামী বলে ডেকো।' বলে আলো নিভিয়ে দিলেন।

'ঠিক আছে, মামী।' হাতটা রাখলাম আমার গালে, যেখানে তিনি চুমু খেয়েছেন। চমৎকার একটা ভাল লাগা, নতুন ধরনের অনুভূতি হচ্ছে আমার। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে ঘরে। মায়ের ছবিটার ওপর পড়েছে। বালিশে মাথা রেখে ঘুমানোর আগে মনে হলো মা যেন আমার দিকে তাকিয়েই হাসছে।

দুই

পরদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙল আমার। পুরো বাড়িটাই নীরব হয়ে আছে। সবাই এখনও ঘুমোচ্ছে। বিছানা থেকে নেমে ড্রেসারের কাছে হেঁটে গেলাম। ড্রেসারের ওপরে রাখা আমার হাতঘড়িটা দেখলাম। সাড়ে ছ'টা বাজে। জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকালাম।

ধূসর হয়ে আছে সকালটা। এখনও সূর্য ওঠেনি। বাড়িটার সামনে একটা দেয়ালঘেরা খোলা জায়গা। তার ওপাশে আরও দুটো বাড়ি। খোলা জানালা দিয়ে অ্যালার্ম ঘড়ির শব্দ শোনা গেল। নাকে এসে লাগল কফির সুগন্ধ। সামনের বাড়ি দুটো সাদা রঙ করা। তাতে আলো প্রতিফলিত হয় বেশি। জানালার কাছ থেকে সরে এসে আন্ডারওয়্যার আর পাজামা পরে নিয়ে হাতমুখ ধুতে বাথরুমে ঢুকলাম।

হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এসে বিছানায় বসে রইলাম। এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে আমাকে। এক ঘরে অনেক ছেলের ঘুমানো নেই, একসঙ্গে জেগে উঠে হাসিঠাট্টা ও রসিকতাগুলো মিস করলাম। আমার দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শুনলাম। দরজা খুলে দেখি, মামী।

'গুড মর্নিং, ফ্র্যাঙ্কি,' হেসে বললেন তিনি: 'এত সকালে উঠলে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম: 'আমি সকালেই উঠি।'

'হাতমুখও ধুয়ে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ। কাপড়ও বদলেছি।'

'একদৌড়ে বেকারিতে গিয়ে কয়েকটা রোল নিয়ে আসতে পারবে? আমি তাহলে ঝামেলা থেকে বাঁচি।'

'পারব।'

কিছু পয়সা আমার হাতে দিয়ে বললেন কোন দোকান থেকে আনতে হবে। বাড়ি থেকে বেরোলাম।

সাতটা প্রায় বাজে। লোকে কাজে বেরোনো শুরু করেছে। বেকারি থেকে জিনিসপত্র কিনে ফেরার পথে একটা দৈনিক 'নিউজ' কিনলাম।

বাড়ি ফিরে জিনিসপত্রগুলো রান্নাঘরের টেবিলে রেখে খবরের কাগজটা পড়তে বসলাম। কয়েক মিনিট পর মামী এসে চুলায় কফির পানি চড়ালেন। দশ মিনিট পর মামাও এলেন। টেবিলে বসে বললেন: 'গুড মর্নিং, ফ্র্যাঙ্কি। রাতে ঘুম ভাল হয়েছে?'

'হয়েছে, মামা,' জবাব দিলাম।

'কাগজ পড়ছ, বিশেষ কোনও খবর আছে নাকি?'

'নাহ্, তেমন কিছু না,' কাগজটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। 'পড়বেন?'

'থ্যাংকস,' বলে কাগজটা আমার হাত থেকে নিলেন তিনি।

পে-টে করে কিছু টোস্ট আর এক গ-াস কমলার রস আমাদের সামনে রাখলেন মামী। খবরের কাগজের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে একটা টোস্ট তুলে নিলেন মামা। গ-াসটা নিয়ে আমি ধীরে ধীরে চুমুক দিতে লাগলাম।

তারপর ডিম ভাজা, কফি ও বেকারি থেকে আমার নিয়ে আসা ড্যানিশ প্যাস্ট্রি দিয়ে নাস্তা করতে লাগলাম আমরা। আমাদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এই সময় মামাত বোনেরা এল।

একসঙ্গে গুড মর্নিং বলল দুজনে। দু'পাশ থেকে মামার দুই গালে চুমু খেল দু'বোন। দুজনেরই গাল টিপে আদর করে দিয়ে আবার পড়ায় মন দিলেন মামা। মাঝে মাঝে কাপ তুলে কফিতে চুমুক দিচ্ছেন। প্রথম কাপ শেষ করে দ্বিতীয় কাপ নিয়েছেন তিনি। মামীর কাছে গিয়ে তাঁকেও মামার মত করেই চুমু খেল দুই বোন। ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করল।

তারপর আমার কাছে এসে আমাকে চুমু খেল। হেসে ফেললাম। ওরা চেয়ার টেনে টেবিলে বসল।

ঘড়ি দেখলেন মামা। 'কাজে যাওয়ার সময় হয়েছে,' বললেন তিনি। আমার দিকে তাকালেন: 'তুমি স্কুলে যাবে না, ফ্র্যাঙ্কি?'

'যাওয়া তো দরকার,' জবাব দিলাম।

'যাও,' তিনি বললেন। 'কী রকম চলছে, রাতে জানিয়ো আমাকে।' বলে স্ত্রীর গালে চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'কোন স্কুলে যাবে, ফ্র্যাঙ্কি?' ছোট বোন ইজি জিজ্ঞেস করল।

'জর্জ ওয়াশিংটন হাই,' জবাব দিলাম।

'আমি যাব পি এস ওয়ান এইট ওয়ানে,' ও বলল।

'ভাল।' কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলাম আমরা। কী বলব বুঝে উঠতে পারছি না।

মেয়েদের নাস্তা দিলেন মামী। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন: 'খাবার পছন্দ হয়েছে?'

'খুব ভাল, মামী।'

'খুশি হলাম,' তিনি বললেন। 'তোমার এখন তৈরি হওয়া উচিত। প্রথম দিনেই স্কুলে দেরি করে যাওয়াটা ঠিক নয়।'

'না,' বললাম: 'দেরি করব না।' আমার ঘরে গিয়ে টাই ও জ্যাকেট পরলাম। ফিরে এলাম রান্নাঘরে। 'চলি তাহলে।'

টেবিল থেকে উঠে আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন মামী। আমাকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন: 'এটা তোমার সাপ্তাহিক অ্যালাউন্স। লাঞ্চ আর অন্যান্য জিনিস কেনার জন্যে। আরও লাগলে চেয়ে নিয়ো।'

তিন ডলার দিয়েছেন তিনি। 'লাগবে না, এতেই চলবে। থ্যাংকস।'

'গুড লাক,' বলে দরজা লাগিয়ে দিলেন তিনি। পুরো পরিস্থিতিটাই কেমন যেন লাগছে আমার। কেন, বুঝতে পারছি না। হতে পারে, স্কুলে যাওয়ার আগে প্রার্থনা

করিনি বলে।

অডোবন অ্যাভেনিউর ১৯১ নম্বর স্ট্রিটে জর্জ ওয়াশিংটন হাই স্কুল। একটা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লাল ইঁটে তৈরি বাড়িটা, হাইটসের দিকে মুখ করা, সামনে দিয়ে সমান্তরালভাবে ব্রঙ্কসের দিকে চলে গেছে ইস্ট রিভার।

সুপারিনটেনডেন্টের অফিসে ডেকে পাঠানো হলো আমাকে। ক্লার্ককে আমার নাম জানিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমাকে কার্ড খুঁজে বের করে ন'টা সময় ৬০৮ নম্বর রুমে যেতে বলল।

ঘণ্টা বাজল। হলে ছেলেমেয়ের দল হুড়াহুড়ি করে ক্লাসে চলেছে। আমার ক্লাসটা খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। ভিতরে ঢুকে টিচার ইন চার্জকে আমার কার্ড দিলাম। ঘরের পিছনের একটা সিট দেখিয়ে দিলেন আমাকে তিনি। বিশজন করে নিগ্রো ছেলেমেয়ে ও বিশজন করে শ্বেতাঙ্গ রয়েছে ক্লাসে।

'নতুন নাকি?' চওড়া হাসি হেসে আমাকে প্রশ্ন করলেন টিচার। 'আমার নাম স্যাম কর্নেল।'

'আমি কেইন,' জানালাম ওঁকে: 'ফ্র্যান্সিস কেইন।'

আমার আগের স্কুলের তুলনায় এই স্কুলের পরিবেশ ভিন্নরকম।

প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়ে এলে ধর্মের আলোচনা শুরু হলো আমাদের। সারা সপ্তাহে গির্জায় যায় না ইহুদিরা, এমনকী শনিবারেও না, যেটা ওদের কাছে রবিবারের মত।

ধর্মের প্রতি আমার যে খুব একটা মন আছে, তা নয়। এতিমখানায় থাকতে বেশির ভাগ সময় গির্জায় যেতাম বাধ্য হয়ে, আর সুযোগ পেলেই পালাতাম। করি আর না করি, বোধ হওয়ার পর থেকেই আমার রুটিনে ওই কাজটা বহাল ছিল।

কিন্তু মামার বাড়িতে বসে থাকা ছাড়া যেন আর কোন কাজ নেই আমার। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে অস্থির হয়ে উঠলাম। শনিবার সকালে উঠেই তাড়াহুড়া করে কাজে চলে গেলেন মামা, সারা সপ্তাহের হিসেব মেলানোর জন্য। বাড়িতে শুধু মামী আর আমি। বাচ্চারা বাইরে খেলতে চলে গেছে। অবশেষে খবরের কাগজটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। 'মামী,' বললাম: 'আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি? অসুবিধে আছে?'

আমার দিকে তাকালেন মামী। 'যাও। কোথাও যেতে হলে বলে যাওয়ার দরকার নেই।'

ঘরে গেলাম কোট আনতে। কোট পরে বসার ঘরে এলাম। কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছেন মামী। অস্বস্তি বোধ করলাম। বুঝতে পারছি আমি কোথায় যাচ্ছি জানতে চান তিনি, ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্ন করছেন না। ব্রাদার বার্নহার্ডের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, তারপর হয়তো গির্জাও যেতে পারি, এ কথা তাঁকে বলব কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমতী তিনি। আমি দরজার দিকে এগোতেই কথা বললেন।

'তোমার দেরি হবে, ফ্র্যাঙ্কি?' জিজ্ঞেস করলেন।

দাঁড়িয়ে গেলাম। 'জানি না। ভাবছি, খানিক ঘুরেফিরে পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'ও!' তিনি বললেন। 'আমি আর তোমার মামা ভাবছিলাম, তোমাকে নিয়ে সিন্যাগগে যাব। অন্য কোন কাজ নেই যেহেতু তোমার, ভাবলাম, ওখানে যেতে তোমার ভালই লাগবে।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কথাটা ভেবে দেখলাম। মামী অনেক চালাক। হয়তো খানিকটা মাইন্ড রিডারও, কে জানে, আমার মনের কথা পড়ে ফেলেছেন। জবাব দিলাম: 'আপনার কি মনে হয় আমার যাওয়া উচিত? আগে কখনও যাইনি তো।'

মৃদু হাসলেন তিনি। কোমল স্বরে বললেন: 'নিশ্চয় উচিত। তুমি গেলে আমরা খুবই খুশি হব।'

'বেশ,' জবাব দিলাম: 'যা বলেন।'

'এক মিনিট,' তিনি বললেন: 'আমি কোট নিয়ে আসি, তোমার সঙ্গে বেরোব।'

রাস্তায় হাঁটার সময় চুপচাপ রইলেন তিনি। ধূসর ইঁটের একটা বাড়ির সামনে এসে বললেন: 'এটাই সিন্যাগগ।'

বাড়িটার দিকে তাকালাম। দেখতে আহামরি কিছু নয়। একতলা একটা সাধারণ বাড়ি, দরজায় কোন সেইন্টের মূর্তি নেই, এমনকী কোনও ইহুদি মহামানবের ছবিও নেই। অতি সাধারণ একটা বাড়ি আর তার সাধারণ দরজা। কোন পবিত্র বাড়ির মত লাগছে না, যেখানে এসে লোকে প্রার্থনা করবে। হতাশই হলাম।

ভিতরে ঢুকে আরও হতাশ। রাস্তার সমতল থেকে দরজা কিছুটা নীচে, কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। দরজার ওপাশে ছোট্ট একটা ঘর, সাদামাঠা ধূসর রঙ করা দেয়াল। হ্যাট খোলার জন্য হাত উঁচু করলাম।

বাধা দিলেন মামী। 'সিন্যাগগে হ্যাট খোলার প্রয়োজন হয় না, ফ্র্যাঙ্কি। সব সময় মাথায় রাখতে পারবে।'

আমাকে ঘরের অন্যপ্রান্তের আরেকটা দরজা দিয়ে অন্যপাশে নিয়ে এলেন তিনি। এটাই উপাসনালয়। খুবই সাধারণ ঘর। কয়েকজন লোক আছে ঘরে। বসার জন্য কিছু কাঠের বেঞ্চ আছে, এতই পুরানো, রঙ করার সময় হয়েছে বহুকাল আগেই। দেয়ালের জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরেছে, আস্তর খসে পড়েছে, সেগুলোও মেরামত করা প্রয়োজন।

ঘরের অন্যপ্রান্তে একটা মঞ্চ। ওপরে লাল মখমলের শামিয়ানা। তার নীচে জিনিসপত্র রাখার ছোট্ট একটা খুপরি। ওটার কাছে দাঁড়ানো একজন মানুষ। দুজন লোক একটা পুরানো চওড়া কাগজের ফালি ধরে রেখেছে তাঁর সামনে। আর সেটা থেকে হিব্রু ভাষায় পাঠ করছেন তিনি।

বেঞ্চের সারির মাঝখানের পথ ধরে এগোলাম আমরা। হাঁটু গেড়ে বসতে যাচ্ছিলাম আমি। কিন্তু হাত ধরে আমাকে থামালেন মামী। বেঞ্চে বসতে ইশারা করলেন। পাশাপাশি বসলাম আমরা।

'ইহুদিরা কখনও ঈশ্বরের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে না,' ফিসফিস করে বললেন তিনি। 'তিনি দেখেন আত্মাকে, দেহটাকে নয়।'

চোখ বড় বড় করে মামীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। জায়গাটাকে মোটেও আমার পরিচিত গির্জার মত লাগছে না।

'র‍্যাবাই কোথায়?' মামীকে জিজ্ঞেস করলাম। মঞ্চে দাঁড়ানো সাধারণ সুট পরা ভদ্রলোককে ধর্মযাজকের মত লাগছে না আমার কাছে।

তাঁকে দেখিয়ে মামী বললেন: 'ওই তো, উনিই তো, টোরাহ্ পড়ছেন দেখছ না।'

কাগজের ফালি থেকে যিনি পড়ছেন, তিনিই র‍্যাবাই, বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার। আমি আশা করেছিলাম ধর্মযাজক হবেন ঝলমলে দামি আলখেল-া পরা কেউ।

পাশ থেকে ছোট একটা বই তুলে নিলেন মামী। পাতা খুলে আমার হাতে দিলেন। পাতার অর্ধেক লেখা রয়েছে হিব্রু ভাষায়, বাকি অর্ধেক ইংরেজিতে। একটা লাইনের ওপর আঙুল রেখে বললেন: 'এখানটায় পড়ছেন। উনি পড়ছেন হিব্রুতে, তোমার ইংরেজিতে পড়লেও চলবে।'

এক মুহূর্ত থামলেন র‍্যাবাই। ফালির একপাশ পড়া শেষ, অন্য পাশ ওল্টানো হচ্ছে। আবার পড়তে শুরু করলেন তিনি। সুর করে একঘেয়ে কণ্ঠে।

বইয়ের দিকে তাকালাম। ইংরেজিতে লেখা আরেকটা লাইনের ওপর হাত রাখলেন মামী। লেখা রয়েছে 'Blessed art Thou, O Lord our God...

এটুকু বুঝতে পারলাম। চোখ বুঝে ফাদার কুইনকে কল্পনা করলাম। বেদির সামনে হাঁটু গেড়ে রয়েছেন, মোমের মোলায়েম আলোয় তাঁর আলখেল-ার সাদা রঙ সোনালি হয়ে উঠেছে। কানের পর্দায় বেজে উঠল যেন সম্মিলিত ধর্মসঙ্গীত। নাকে আসছে যেন গির্জায় পোড়ানো রজন ও ধূপের গন্ধ। নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন আপনাআপনি নড়ে উঠল আমার ঠোঁট, 'Hail Mary, Mother of God.'

আমার কাঁধে হাত রাখলেন মামী। চোখ মেলে একটা মুহূর্তের জন্য মামীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। মুখে তাঁর মৃদু হাসি, কিন্তু চোখের কোণে পানি টলমল করছে। 'সেই একই ঈশ্বর, ফ্র্যাঙ্কি।'

মানসিক উত্তেজনা যেন নিংড়ে বেরিয়ে গেল আমার। মামীর দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

ঠিকই বলেছেন তিনি: ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকা হোক, যে কোন ভাষায়, ইংরেজি, ল্যাটিন কিংবা হিব্রু, তিনি সেই একই।

*

বাড়ি ফিরে দেখলাম মামা দোকান থেকে চলে এসেছেন। আমরা কোথায় গিয়েছিলাম, মামী বললেন ওঁকে। আমার দিকে তাকালেন মামা: 'কী রকম মনে হলো তোমার?'

'জানি না, মামা,' জবাব দিলাম। 'তবে কেমন একটু অদ্ভুতই লাগল।'

'ভাষাটা শেখার জন্যে হিব্রু স্কুলে যেতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

কী জবাব দেব, দ্বিধা করতে লাগলাম। আমার হয়ে মামী বলে দিলেন: 'শোনো, ওর যা করতে ইচ্ছে করে ও করুক। কোন কিছু আমাদের চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না। নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার মত যথেষ্ট বয়েস হয়েছে ওর। কী করতে চায়, কোথায়

যেতে চায় না চায়, আমাদের জানাবে, আমরা সেইমত কাজ করব।'

মামীর কথা খুব ভাল লাগল আমার। ওই মুহূর্তে আমি কী করতে চাই, কোথায় যেতে চাই, কিছুই জানি না। ব্রাদার বার্নহার্ডের সঙ্গে মামীর কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পেলাম, প্রায় একইভাবে কথা বলেন দুজনে। স্বস্তি পেলাম।

'কিন্তু,' মামা বললেন: 'কিন্তু ওকে bar mitzvah-র জন্যে তৈরি হতে হবে, এটা ভুললেও চলবে না।'

আবার মামী জবাব দিলেন, আমার দিকে তাকিয়ে হেসে: 'ওসবে কিছুই আর যায় আসে না এখন। bar mitzvah ওকে এমন কিছু নতুন মানুষ বানিয়ে দেবে না যা ও হতে পারেনি। ওর যা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে করুক, কোনটা পছন্দ করবে সেটা ও নিজেই ঠিক করে নিতে পারবে। একটা জিনিস বুঝেছি, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও পেয়ে গেছে।'

ধর্ম সম্পর্কে আমার ব্যাপারে মামা-মামীর এটাই শেষ কথা। এ নিয়ে আর কোন কথা বললেন না ওঁরা। সব আমার ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দিলেন। ধর্ম নিয়ে আমিও আর মাথা ঘামালাম না। এরপর হিব্রু স্কুল, গির্জা কিংবা সিন্যাগগেও আর গেলাম না কোনদিন। ঈশ্বরকে নিয়েও মাথা ঘামালাম না। যখন প্রয়োজন হবে, তখন ঘামাব, জীবনের অন্যান্য ব্যাপার নিয়ে যেমন ঘামাই। আমার কথা হলো, সময় আসার আগেই অকারণে কোন কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন মানে হয় না।

তিন

পুরানো সময়কে কখনও আর ফিরিয়ে আনা যায় না, এতদিনে এই সত্যটা জেনে গেছি আমি। এখনও বন্ধুই রয়েছি আমি, জেরি ও মার্টিন, কিন্তু আগের সেই আন্তরিকতাটা যেন নেই আর, আমি এতিমখানা থেকে চলে আসার পর। এর কারণ এই নয় যে সৌহার্দ্য কমে গেছে আমাদের, এর কারণ আমার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার প্রচেষ্টা। আর সেটা হওয়ার জন্য আমার এখন বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, একটা পরিবার পেয়েছি, সেখানেই যথেষ্ট। আর পরিবারটাকে পছন্দও করে ফেলেছি আমি। অন্যের সম্পর্কে সহমর্মিতা দেখাতে হয় কীভাবে, কীভাবে নিজের ব্যাপারে যত্নবান হতে হয়, শিখছি। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার জন্য।

স্কুলেও আমি খারাপ ছাত্র নই। আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করে নিজেই বিস্মিত হয়েছি, নেতৃত্ব দেয়ার একটা ক্ষমতা আছে আমার মধ্যে। ভাল বাস্কেটবল খেলতে পারি, সাঁতার কাটতে পারি।

ক্রিস্টমাসের আগে এক শুক্রবার রাতে জেমস মনরো হাই স্কুলের সঙ্গে একটা বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা আমাদের। খেলার পর নাচ। শুনলাম, আমাকে ক্লাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার চিন্তাভাবনা চলছে। না শোনার ভান করে রইলাম। আমি জানি, ওই খেলাটার ওপর আমার প্রেসিডেন্ট হওয়া না হওয়া অনেকখানি নির্ভর করছে।

মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, খুব ভাল করে খেলতে হবে। টেন্‌থ অ্যাভেনিউতে যে উদ্দাম খেলা খেলতাম, এখানেও সেভাবেই খেললাম। জিতলাম তো বটেই, স্টার হয়ে গেলাম আমি।

শাওয়ারে গোসল করতে গিয়ে কয়েকটা ছেলের আলোচনা কানে এল, আমাকে নিয়ে হিংসে করছে ওরা। মনে মনে হাসলাম। করুক হিংসে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে কীভাবে থামিয়ে দিতে হয়, সেটা আমার ভালই জানা আছে। এরপর পোশাক পরে নামতে গেলাম। ডান্স ফ্লোরে ভিড়ের মধ্যে জেরি ও মার্টিনকে চোখে পড়ল।

'এই, ফ্র্যাঙ্কি!' চেঁচিয়ে বলল মার্টিন। 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'বাড়ি,' হেসে জবাব দিলাম। 'মামীর সঙ্গে এক জায়গায়...'

'না, যেতে পারবি না,' বাধা দিল ও। 'তোকে নিয়ে আজ আমাদের অনেক আশা। ওরা বলেছে, তোকে নাচতে হবে।'

'কারা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ক্লাসের ছেলেরা। এখন তুই চলে গেলে সবাই খুব দুঃখ পাবে। আগামী মাসে তোকে ক্লাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেরও কথা আছে।'

মনে মনে হাসলাম। এ সময় কাছে এসে দাঁড়াল জেরি।

'এই, জেরি,' আমার হাত চেপে ধরল: 'ওকে আটকা। ও বাড়ি চলে যাচ্ছে।'

'কেন?' আমার দিকে তাকাল জেরি। 'অসুস্থ লাগছে নাকি তোর?'

'না, ক্লান্তি লাগছে,' জবাব দিলাম। 'সারাটা বিকেল কী পরিশ্রম গেছে দেখেছিসই তো।'

'আরে ধ্যাত্তোরি তোর পরিশ্রম!' জেরি বলল। 'তোকে নাচতেই হবে। নতুন ক্লাস প্রেসিডেন্ট হতে হবে।'

'এই প্রেসিডেন্ট বানানোর কুবুদ্ধিটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে, বল তো?' বিরক্ত হওয়ার ভান করে বললাম।

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল জেরি ও মার্টিন। মার্টিন বলল: 'শোন, আমাদের মনে হয়েছে তুই প্রেসিডেন্ট হলে খুব ভাল হবে। ক্লাসে, আমাদের মতে, তুইই সবার সেরা। সবাই তোকে পছন্দ করে, তা ছাড়া তুই কাজটার উপযুক্ত।'

'প্রেসিডেন্ট হলে কী কী করতে হবে আমাকে?' প্রশ্ন করলাম।

'তেমন কিছু না,' জেরি বোঝানোর চেষ্টা করল। 'স্টুডেন্ট-টিচার অ্যাডভাইজারি কমিটিতে ছাত্রদের হয়ে কথা বলতে হবে তোকে। কিছু কিছু সুবিধেও পাবি তুই। আয়, নাচতে আয়। পরে সব বুঝিয়ে বলব।'

'বেশ। তবে আগে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিতে হবে আমাকে।'

ফোন সেরে জিমনেশিয়ামে ফিরে গেলাম। ছয়জনের একটা ব্যান্ড পার্টি এককোণে বাজনা বাজাচ্ছে, আর ছেলেমেয়েরা নাচছে। একটা টেবিলে বসে সফ্‌ট্ ড্রিংক খাচ্ছে কয়েকটা ছেলে। আমার কাছে এসে দাঁড়াল মার্টিন। সঙ্গে একটা মেয়ে। চিনি ওকে। বায়োলজি পড়ে। তবে ওর নাম মনে করতে পারলাম না।

'চিনিস মনে হচ্ছে,' মার্টি বলল আমাকে। 'তোর সহকারী হবে ও, ভাইস-প্রেসিডেন্ট।' আমাদের রেখে চলে গেল ও।

পরস্পরের দিকে তাকালাম আমরা। মেয়েটা হাসল। হাসিটা সুন্দর। 'তুমি চাও না, ফ্র্যাঙ্কি?'

'চাই,' বিব্রত বোধ করছি: 'কিন্তু আমি তো ভাল নাচতে পারি না।'

'ও কিছু না,' আমি তোমাকে সাহায্য করব। 'আমার দুই বাহুর ভিতরে চলে এল ও। কয়েক মুহূর্তের জন্য আড়ষ্ট হয়ে গেলাম আমি। একবার ওর পা মাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু ও হেসে বলল: 'শান্ত হও। উত্তেজনা কমাও।'

তাই করলাম। খুব খারাপ নাচলাম না। বাজনা থামল অবশেষে। 'কী, খুব কি কঠিন মনে হলো?' হাসল ও।

'না,' হাসলাম। 'তবে আমার চেয়ে অনেক ভাল নাচতে পারো তুমি।'

খুশি হলো ও, মিষ্টি করে হাসল। 'তুমিও পারবে ওরকম। শুধু একটু প্র্যাকটিস দরকার।'

'একটা ড্রিংক দরকার, কী বলো, গলাটা শুকিয়ে গেছে।'

রিফ্‌রেশমেন্ট টেবিলে গিয়ে বসলাম আমরা। আমাদের আশপাশ দিয়ে যাওয়া

ছেলেমেয়েদের হ্যালে-া বললাম। অনেকেই জবাব দিল, তবে মেয়েটার নাম ধরে ডাকল না কেউ। আরও কয়েকবার নাচলাম আমরা। এগারোটা সময় নাচ শেষ হলো। একসঙ্গে বাড়ি ফিরে চললাম আমরা। আমাদের বাসার কয়েক ব-ক দূরে একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে থাকে ও। হলওয়ে ধরে গিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম ওকে। দরজার কাছে গিয়ে থামলাম। আর কোন প্রসঙ্গ না পেয়ে নাচের ব্যাপারেই আলোচনা করতে লাগলাম আমরা। হঠাৎ করেই আমার মনে হলো, সময়টা খুব ভাল কাটছে।

সওয়া এগারোটা বেজে গেল। 'এখন আমাকে যেতে হবে,' মেয়েটা বলল: 'রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম: 'আমাকেও যেতে হবে।'

'গুড নাইট, ফ্র্যাঙ্কি,' আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ও।

'গুড নাইট,' আমি বললাম। তারপর নিজের অজান্তেই যেন চুমু খেলাম ওকে। দুই হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল ও। ওর চুলের তাজা সুগন্ধ পেলাম। জুলিকে যেভাবে চুমু খেয়েছি ওকেও তেমন করে চুমু খেতে গিয়ে হঠাৎ কীসে যেন থামিয়ে দিল আমাকে। এই মেয়েটা নিজেকে আমার গায়ে চেপে ধরল না; জুলির ঠোঁটের মত এতটা তীব্রতাও নেই। ঢিল হয়ে এল আমার স্নায়ু। ওর পিঠ চেপে ধরলাম। আপনাআপনি আমার হাত ওর বুকের স্পর্শ নিতে গিয়েও সময়মত থেমে গেল। ওর ঠোঁটের মিষ্টতা আর গালের কোমলতা আমার ভাল লাগল। ঠোঁট থেকে ঠোঁট ছাড়িয়ে নিয়ে আমার কাঁধে মাথা রাখল ও। আমি ওকে আলগাভাবে ধরে রাখলাম। জুলিকে ধরার সঙ্গে এই ধরার অনেক তফাৎ, এতে উত্তেজনা নেই, আছে ভাল লাগা।

'তুমি কী ভাবছ, আমি জানি না, ফ্র্যাঙ্কি,' ও বলল: 'কিন্তু এখন যা করলাম, আর কারও সঙ্গে করিনি।'

'জানি,' জবাব দিলাম। ওর গায়ের পারফিউমের সুগন্ধ আমার নাকে ঢুকছে।

পিছিয়ে গেল ও। 'গুড নাইট, ফ্র্যাঙ্কি।' নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল ও।

হলওয়ে ধরে কয়েক পা হেঁটে গেলাম। মনে পড়ল, এখনও ওর নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি। ফিরে গেলাম আবার ওর দরজার কাছে। ডোরবেলের কাছে লেখা রয়েছে 'লিনডেল'।

জেনেট বলে ডাকতে শুনেছি ওকে, পদবী লিনডেল। তারমানে ওর নাম জেনেট লিনডেল। হালকা সুরে শিস দিতে দিতে হলওয়ে ধরে হেঁটে চললাম আমি।

চার

ক্রিসমাসের সপ্তাহে আমাদের বাড়িতে এল জেরি ও মার্টিন আমার সঙ্গে দেখা করতে। মামাত বোনদের নিয়ে মামী গেছেন সিনেমায়। বন্ধুদের নিয়ে বসার ঘরে বসলাম আমি।

বকবক করে চলে চলল জেরি, সব সময়ই প্রচুর কথা বলে ও। আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করল ওরা, ক্লাস প্রেসিডেন্ট হওয়া একটা বিরাট ব্যাপার। কিন্তু আমার মুখের ভঙ্গিতে প্রভাবিত হওয়ার লক্ষণ না দেখে বলল: 'শোন, তোর জন্যে ভাল হবে, বুঝতে পারছিস না কেন। স্টুডেন্ট-টিচারস কমিটিতে থাকবি তুই, সিভিকস ক্লাসে অনেক সুযোগ-সুবিধে পাবি।'

'তাই তো!' জেরির সঙ্গে সুর মেলাল মার্টিন। 'ছাত্রদের মাঝে অনেক দাম হবে তোর, ওরা তোর কথা শুনবে, নেতা হয়ে যাবি।'

কথাটা আমার পছন্দ হলো। 'বুঝলাম। তা আমাকে কী করতে হবে এখন?'

'তেমন কিছু না,' আমি মত বদলে ফেলব এই ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল জেরি: 'তোর পক্ষে প্রচার আর অন্যান্য কাজগুলো আমাদের ওপর ছেড়ে দে, ওটা আমরাই করব। তোকে শুধু শুক্রবারে স্কুলের ইনট্রডাকটরি র‍্যালিতে একটা বক্তৃতা দিতে হবে, ব্যস।'

'না না, আমি পারব না! এত লোকের সামনে বক্তৃতা দেয়া আমার কর্ম নয়। আমি বাদ।'

'আরে এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন?' মার্টিন বলল। 'এ তো সহজ কাজ। শোন, আমরা তোর বক্তৃতাটাও লিখে এনেছি। এই যে কপি।' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দিল ও।

পড়তে লাগলাম। অর্ধেকটা পড়ে থেমে গেলাম। 'কী সব ছাইপাঁশ লিখে এনেছিস? এটা কোন বক্তৃতা হলো? আমাকে জেতাতে চাইলে এটা আমার প্রতিপক্ষকে দিয়ে পড়াগে। এটা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'পলিটিকস মাথায় ঢুকবেও না,' জেরি বলল: 'ও আমি জানি। বাবাকে বহুবার বলতে শুনেছি। তুই কী করছিস সেটা বড় কথা নয়, লোকে কোনটা পছন্দ করছে সেটাই আসল। দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল মানুষটাও ভোট পাবে না যদি তার ব্যক্তিত্ব দেখাতে যায়। মার্টি আর আমি তোকে সব শিখিয়ে দেব। সব ঠিক করে দেব। বক্তৃতা প্র্যাকটিস করাব। মঞ্চে উঠে তুই শুধু তোতাপাখির মত গড়গড় করে বলে যাবি।'

'হ্যাঁ,' মার্টিন বলল।

'বেশ,' জবাব দিলাম: 'তবে যদি লেজেগোবরে করে ছাড়ি, সব দোষ তোদের।'

'করবি না,' একসঙ্গে বলে উঠল দুজনে: 'কিচ্ছু ভাবিস না তুই। সব ঠিকঠাকমতই হয়ে যাবে।'

দশটা রাত একনাগাড়ে আমাকে বক্তৃতা প্র্যাকটিস করাল ওরা। জেরি আর

মার্টিনের শিক্ষকতার ঠেলায় অসুস্থ হয়ে যাব মনে হলো। ওরা আমাকে শেখাল কীভাবে হাঁটতে হবে, কীভাবে হাত মেলাতে হবে, কী পোশাক পরতে হবে। র‍্যালির দুদিন আগে ওরা আমাকে সব ভুলে যেতে, মাথা থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করে দিতে বলল।

কিন্তু ভুলতে আমি পারলাম না। ক্লাসে মন দিতে পারলাম না। ভাবনায় রাতে ভাল ঘুম হলো না। দুঃস্বপ্ন দেখলাম। অবশেষে এল সেই দিন। বন্ধুদের পরামর্শ মত একটা বো টাই পরলাম, আর জ্যাকেটের নীচে একটা সোয়েটার পরে নিলাম।

অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে যখন মঞ্চে গিয়ে উঠলাম, কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হচ্ছে সবগুলো চোখ শুধু আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। জেনেট বসেছে আমার পাশে। একটু পর পরই আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে ও, ওর হাসিটা ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম। আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয় বিবর্ণ দেখাচ্ছে আমাকে।

প্রথমে বক্তৃতা দিলেন প্রিন্সিপ্যাল। ভাল নাগরিক কীভাবে হওয়া যায়, গণতন্ত্রের চর্চা কীভাবে করতে হয়, এ সব ভাল ভাল কথা বলছেন তিনি, কিন্তু আমার মাথায় যেন কিছুই ঢুকছে না এতটাই অস্বস্তি বোধ করছি। তিনি বসলে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী প্রথম বক্তা উঠে দাঁড়াল।

ফার্স্ট-টার্মের ছাত্রদের কী চমৎকার প্রতিনিধিত্ব করবে ও, সেসব বলল ইনিয়ে বিনিয়ে। দশ মিনিট সময় নিল। ও বসলে চিয়ার লিডাররা উঠে ওর জন্য সামান্য চিয়ারের ব্যবস্থা করল। ওরা বসলে দ্বিতীয় প্রার্থী উঠে দাঁড়াল। সে-ও প্রথমজনের মতই ভাল ভাল কথা বলল, দশ মিনিটই সময় নিল। দেখলাম, অস্থিরতায় ভুগতে শুরু করেছে দর্শকরা, বিরক্ত হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় প্রার্থী বসার পর একইভাবে চিয়ার লিডাররা উঠে চিয়ার দিল। এরপর এল আমার পালা।

বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন আমার। গলা শুকিয়ে গেছে। মনে হলো কথাই বলতে পারব না। জেনেটের দিকে ফিরে তাকালাম। দুই হাত তুলে আমাকে সাহস জোগাল সে। ধীরে ধীরে হেঁটে মঞ্চের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকালাম। কেমন ঝাপসা দেখছি, কারও মুখই স্পষ্ট হচ্ছে না যেন। জোর করে কথা বললাম।

'মাননীয় প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, শিক্ষক মহোদয়গণ ও প্রিয় ছাত্র বন্ধুরা,' অডিটরিয়ামের পিছনে যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে আমার কথাগুলো, অতিরিক্ত জোরে, আমার মনে হলো।

মনে হলো শ্রোতারা চমকে গেছে, যেন ঘুম থেকে ওদেরকে জাগিয়ে তুলেছি আমি।

'আমি ভয় পাচ্ছি,' এমন ভঙ্গিতে বললাম, ছাত্রছাত্রীরা তো বটেই, শিক্ষকরাও হেসে উঠল। অস্বস্তিবোধটা দ্রুত কেটে গেল আমার।

'বিশ্বাস করো,' আমি বললাম: 'কেন এখানে বক্তৃতা দিতে এসেছি আমি, আমি নিজেই জানি না।'

আবার হেসে উঠল সবাই। আমার অস্বস্তিবোধ পুরোপুরি কেটে গেল।

'সেদিন,' বলতে থাকলাম: 'এখানকার দুজন ছাত্র—আমার বন্ধু আমাকে বলল, এই,

প্রেসিডেন্ট হতে তোর কেমন লাগবে? বোকার মত জবাব দিয়েছিলাম, ভাল। এখন ভাবছি ওরা সত্যি আমার বন্ধু কিনা।'

শ্রোতারা হেসে উঠল। কেউ কেউ হাততালি দিল। 'খোদা!' ভাবছি আমি: 'ঠিকই তো বলেছে জেরি! ওরা তো গিলতে আরম্ভ করেছে!'

'আমার প্রতিপক্ষ বন্ধুদের বক্তৃতা শুনলাম,' বলতে থাকলাম। 'ভাবছি, আমার ভোটটা ওদের কাউকেই দিয়ে দেব কিনা।'

চিৎকার করে হেসে উঠল শ্রোতারা, আমার পরের মন্তব্যটা শোনার জন্য সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল অনেকে। মঞ্চের এককোণে হেঁটে গেলাম পরের কথাটা বলার জন্য।

'যাই হোক, যদি বাস্কেট বল কিংবা সাঁতারে ভাল করার জন্যে ক্লাস প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রয়োজন হয়,' আমার জ্যাকেট খুলে নীচের সোয়েটারে কমলা ও কালো রঙে লেখা ছোট্ট "W" অক্ষরটা ওদের দেখিয়ে দিলাম: 'তাহলে অবশ্য অন্য কথা। পিং-পং কিংবা টেনিস খেলায়ও আমি ভাল করব কথা দিতে পারি।'

এই কথাটা বিশেষ মনে ধরল না কারও, তারপরেও ওরা হাসল। মঞ্চের সামনে হেঁটে গেলাম আমি।

'আমাকে ক্লাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হলে কী করব আমি কথা দিতে পারি না তোমাদের। আমার প্রতিপক্ষের প্রার্থীরা সব করবে কথা দিয়ে ফেলেছে। নতুন আর কিছু বলার নেই আমার।'

আবার হাসল শ্রোতারা। হাততালি দিল। হাত তুলে ওদের শান্ত হতে বললাম।

'আমি মনে করি না ওরা যা বলেছে ভুল বলেছে, বরং একেবারে সঠিক কথাগুলো বলেছে ওরা। ওদের প্রতিটি কথাকে সমর্থন করি আমি। বাড়ির কাজ কমিয়ে দিয়ে স্কুলে বেশিক্ষণ পড়াশোনা, ক্লাসের সময় কমিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে আমি খুশিই হতাম, কিন্তু সেটা সম্ভব না। আমার ধারণা এডুকেশন বোর্ড এতে আপত্তি জানাবে।'

হাসি ও হাততালি দিয়ে আমার কথাকে স্বাগত জানানো হলো। সামনের সারিতে বসা জেরি ও মার্টিনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম ওদের মুখে হাসি। জেরি হাত তুলল, আঙুলগুলো মুঠোবদ্ধ করে আমাকে ইঙ্গিতে বোঝাল সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই হচ্ছে। আমার বক্তৃতা চালিয়ে গেলাম।

'এখন আর আমি তোমাদের বেশি সময় নেব না, কারণ আমি জানি ক্লাসে ফেরার জন্যে কতটা অস্থির হয়ে উঠেছ তোমরা। (আবার হাসি) তবে আমি তোমাদেরকে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত করতে পারি, আমার দুই প্রতিপক্ষ বন্ধু ও আমার তরফ থেকে, যাকেই তোমরা নির্বাচিত করো, সহযোগিতা করার সাধ্যমত চেষ্টা করব আমরা।'

সিটে গিয়ে বসে পড়লাম। উঠে দাঁড়াল ছাত্রছাত্রীরা। চিৎকার করে, হাততালি দিয়ে আমাকে স্বাগত জানাতে লাগল।

আমার কানে কানে ফিসফিস করে জেনেট বলল: 'ওঠো, উঠে দাঁড়াও। বাউ করো সবাইকে।'

'করব, যদি তুমি সাথে আসো,' বললাম। মাথা ঝাঁকাল ও। ওর হাত ধরে

পাশাপাশি হেঁটে মঞ্চের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম দুজনে। শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। গোলাপি পোশাকে খুব সুন্দর লাগছে ওকে। আমি হাত তুলতেই চুপ হয়ে গেল শ্রোতারা।

'আমাকে ভোট দাও বা না দাও,' আমি বললাম: 'ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে জেনেটকে ভোট দিতে ভুলো না। ও হবে জর্জ ওয়াশিংটন হাই স্কুলের সবচেয়ে সুন্দরী ও সবচেয়ে স্মার্ট ভাইস-প্রেসিডেন্ট।'

হাসি ও হাততালিতে ফেটে পড়ল যেন ঘর। মঞ্চে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম আমরা। বন্ধুরা ঘিরে রাখল আমাদের।

সেদিন বিকেলেই নির্বাচন হয়ে গেল। ভোটের ফলাফল জানার অপেক্ষায় আছি আমি, জেনেট ও আমাদের সমর্থকরা। এ সময় আমার কাছে এসে দাঁড়াল রুথ ক্যাবেল।

'নাটক কোম্পানিতে যোগ দিলেই ভাল করবে, ফ্র্যাঙ্কি, প্রেসিডেন্ট হওয়ার খাহেশ ছাড়ো,' রুক্ষকণ্ঠে আমাকে ব্যঙ্গ করল ও। 'অভিনেত্রী মিস গিবস তোমাকে পেলে লুফে নেবে।'

'মেয়েটা কে?' জেনেট জানতে চাইল।

'মার্টির বোন।'

ঠিক এই সময় দৌড়াতে দৌড়াতে এল মার্টিন। ভীষণ উত্তেজিত। 'ফ্র্যাঙ্কি, জিতে গেছি, আমরা জিতে গেছি! তুই প্রেসিডেন্ট হয়েছিস!'

আমার হাত চেপে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল ও। একটা মুহূর্ত আমি হাসতে পারলাম না। আমি শুধু রুথের কথা ভাবছি—কী জঘন্য আচরণ করে গেল আমার সঙ্গে। অবশেষে হাসি ছড়িয়ে পড়ল আমার মুখে।

প্রায় ডজনখানেক ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে এল জেরি। আমাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল সবাই। আরও অনেকেই এল। এমন মাতামাতি শুরু করল আমাকে নিয়ে, রুথের দুর্ব্যবহারের কথা ভুলিয়ে দিল।

পাঁচ

ক্লাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত না হলে কোনদিনই আমার সঙ্গে মিসেস স্কটের পরিচয় ঘটত না। লিখতে বসে মাঝে মাঝে চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলি আমি, এত দ্রুত ভাবনা চলে লিখে কুলিয়ে উঠতে পারি না তখন।

স্টুডেন্ট-টিচার কাউন্সিলের প্রথম মিটিঙে আমার সঙ্গে পরিচয় হলো মিসেস স্কটের। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েসের আন্তরিক একজন মহিলা, ইস্পাত-ধূসর চোখ, পাতলা দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল। চিলড্রেন'স ওয়েলফেয়ার বুরোতে মানসিক সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন তিনি তখন।

বেশির ভাগ সমস্যাই বেশ মজার: বাচ্চাদের দেরি করে আসা কিংবা আসতে না চাওয়ার প্রবণতা, ক্লাস ফাঁকি দিতে চাওয়া, টিচারদের সঙ্গে তর্ক করা, ইত্যাদি। ওদের আমরা শাস্তি দিতে চাই না; আমরা শুধু বুঝতে চাই সমস্যাটার মূলে কে? বাচ্চারা, ওদের শিক্ষকরা, নাকি ওদের বাবা-মায়েরা? প্রতিটি কেসই মিসেস স্কটের সিদ্ধান্তের জন্য তাঁর কাছে পেশ করা হয়েছে। বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি নিজে ওদের বক্তব্য শুনবেন।

এতবড় একটা স্কুলের কেসও অসংখ্য। মিসেস স্কটের সহকারী হিসেবে কাজ করছে যে মেয়েটা, রেকর্ড রাখছে, সে ওই বছরই ওই স্কুল থেকে ডিগ্রি নিয়েছে। মেয়েটা একা সামলাতে পারছে না তাই ওরও একজন সহকারী প্রয়োজন। আমি মার্টিনকে নিতে বললাম, কারণ ও কিছু বাড়তি কাজ করে নাম কামাতে চাইছে।

মার্টিন আর মেয়েটা মিলে ভালই কাজ চালিয়ে গেল। কাজটা মার্টিনের পছন্দ। আর মানসিক রোগের ডাক্তার হওয়ার ভাবনাটাও বোধহয় ওই সময়ই ওর মাথায় ঢুকেছিল। ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে ওর বহুকালের। কাজটা ওকে সেই সুযোগ এনে দিল।

জেনেট আর আমার মাঝে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। স্কুলে বেশিরভাগ সময় একসঙ্গে চলাফেরা করি আমরা। আমি ওকে পছন্দ করি। কিন্তু জুলির সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়ে যাওয়াতেই কিনা জানি না—বাধাটা যে কোথায় ঠিক ধরতে পারি না, জেনেটের সঙ্গে তেমন কিছু ঘটছে না, আদৌ কোনদিন ঘটবে কিনা তা-ও জানি না। তবু পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করি আমরা।

স্কুল চলছে। দেখতে দেখতে ইস্টার উৎসবের সময় এসে গেল। তার পর পরই শুরু হলো গ্রীষ্মের ছুটি। পরীক্ষায় সব বিষয়েই পাশ করলাম আমি। আমার পরিবারের লোকদের সঙ্গে রকওয়েতে গরমের ছুটি কাটাতে গেলাম।

আমার জীবনের সবচেয়ে ভাল গ্রীষ্মের ছুটি ছিল ওটা। সৈকতে আমার বয়েসী ছেলেমেয়েদের ভিড়। প্রায় সারাটা দিনই সৈকতে কাটাই, যত খুশি সাঁতার কাটি।

রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে এল আমার চামড়া। আমার মনে হয় না সৈকতের অন্য ছেলেদের চেয়ে আমি আলাদা কিছু। বেইদিং সুট পরে মেয়েরা ঘুরে বেড়ায়। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি আমরা, ওদের নিয়ে আলোচনা করি, কাউকে আকৃষ্ট করা যায় কিনা সে-চেষ্টা করি। একটা মেয়েকে পটিয়ে ফেলেছি মনে করে তার দিকে কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পরই দেখি আরও অনেকের সঙ্গেই ভাব আছে তার। বাদ দিয়ে দিলাম ওকে।

গ্রীষ্ম শেষ হওয়ার আগেই সাত পাউন্ড ওজন বেড়ে গেল আমার। বাংলো বন্ধ হওয়ার সময় এসে গেল। শীঘ্রি শহরে ফিরে যেতে হবে আমাদের। আবার শুরু হবে স্কুল। আমার ধারণা, আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর গ্রীষ্মাবকাশ ছিল ওটা। মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হই, সে-সময়কার সবকথা মনে করতে পারি না কেন, মধুর সেই সময়ের কথাগুলো? আসলে প্রতিটি দিনই এত সুন্দর ছিল, এত আনন্দে কেটেছে, একটার সঙ্গে আরেকটাকে আলাদা করতে পারিনি বলেই বোধহয় মনে থাকেনি।

আবার স্কুল। এই টার্মে আমি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। নিয়মিত বাস্কেটবল খেলি, সাঁতার কাটি। টার্ম শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত সোয়েটারে বড় অক্ষরের একটা "W" লিখে রাখলাম। স্কুলে আমার এখন বেশ দাম, সবসময় আমার চারপাশ ঘিরে থাকে ছেলেমেয়েরা। আমার চাটুকারের সংখ্যাও অনেক, একজন হাই স্কুল হিরোর যেমন হয়ে থাকে।

সেই গ্রীষ্মে সবাই বড় হয়ে গেছি আমরা। জেরি, মার্টিন, আমি, এমনকী জেনেটও বড় হয়ে গেছে। তবে সেটা বুঝলাম থ্যাংকসগিভিং ডে-তে ফুটবল খেলা শেষে ওদের বাড়িতে গিয়ে। ওর বাবা-মা বাড়ি নেই। কাপড় বদলাতে গেল ও। ওর দাদুর বাড়িতে যাবে। আমি ওদের লিভিং-রুমের কাউচে আমার কোটটা খুলে ঝুলিয়ে রেখে কাগজ পড়তে লাগলাম।

কয়েক মিনিট পর ঘরে ঢুকল ও। পরনে বাথরোব। এক বাহুর ওপর ঝোলানো একটা হাতাকাটা অন্তর্বাস। 'এটা ইস্ত্রি করতে হবে,' বলল ও। 'ধুয়েছিলাম, শুকায়নি ভালমত। ইস্ত্রি করে শুকাতে হবে।' রান্নাঘরে ঢুকল ও। পিছন পিছন গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। দেয়ালে বসানো আয়রন বোর্ডটা মেলে নিল ও। ইস্ত্রির প-াগটা সকেটে ঢুকিয়ে গরম হতে দিয়ে আমার সঙ্গে পারলারে এল। 'গরম হতে কয়েক মিনিট লাগবে। ইস্ত্রি করতে দেরি হবে না।'

'ও নিয়ে ভেবো না,' আমি বললাম। 'আমার অফুরন্ত সময়।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। 'দেখো,' চেঁচিয়ে উঠল: 'তুষার পড়ছে!'

ওর পাশে এসে দাঁড়ালাম। 'আরে, তাই তো!'

আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'এ বছরের প্রথম তুষার।'

'হ্যাঁ,' ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম: 'এ বছরের প্রথম।'

একটা মুহূর্তের জন্য সে-ও আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর ছেড়ে দিয়ে

রান্নাঘরে ঢুকল। ইস্ত্রির দিকে এগোতে এগোতে বলল: 'এতক্ষণে নিশ্চয় গরম হয়ে গেছে।'

'আমিও গরম হয়ে গেছি!' আমি বললাম।

ও হেসে ইস্ত্রি পরীক্ষা করতে করতে বলল: 'না, ঠিকমত হয়নি এখনও।'

আবার ওকে চুমু খেলাম। আরও কাছে টেনে আনলাম। বাথরোবের নীচে অন্তর্বাস ছাড়া আর কোন পোশাক নেই ওর। একসঙ্গে কাউচের কাছে হেঁটে গিয়ে বসে পড়লাম। ওর মাথাটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে আবার চুমু খেলাম। আমাকেও চুমু খেল ও, ক্রমেই গরম হয়ে উঠছে ওর ঠোঁট। ওর নরম মসৃণ চামড়ার স্পর্শ এক ধরনের শিরশিরে অনুভূতি তুলল আমার আঙুলে। গায়ে আমার আঙুলের ছোঁয়া লাগতে দম আটকে ফেলল ও। আবার চুমু খেলাম ওকে। ওর পিঠে হাত বোলাতে লাগলাম। দুই হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল ও, আমাকে আরও কাছে টেনে নিল। মাথা নিচু করে ওর গলায় চুমু খেলাম, তারপর কাঁধে। টান দিয়ে নামিয়ে দিলাম বাথরোবের অর্ধেকটা।

'থাক, ফ্র্যাঙ্কি!' গুঙিয়ে উঠল ও।

'না, ডার্লিং!' বিড়বিড় করে বললাম। ওর হাত দুটো আমার মাথাটা চেপে ধরে রেখেছে ওর বুকের ওপর।

'ও, ফ্র্যাঙ্কি, ফ্র্যাঙ্কি!' আর বার বার বলতে থাকল ও।

ওর রোবের বেল্ট খুলতে শুরু করলাম। হঠাৎ আমাকে থামিয়ে দিল ও। ওর হাত আমার হাত চেপে ধরল।

'থাক না, ফ্র্যাঙ্কি! এটা ঠিক হচ্ছে না!'

আবার ওকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করলাম। এবার ও মুখ সরিয়ে নিল।

'থাক, ফ্র্যাঙ্কি, থাক! খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সস্তা মেয়েদের মত,' কথা বলতে গিয়ে দম আটকে যাচ্ছে ওর।

চেপে ধরে রাখলাম ওকে। ঠেলা মেরে আমাকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। টেনেটুনে রোবটা সোজা করতে থাকল। 'আমরা এখন আর ছোট নই, ফ্র্যাঙ্কি। যা ইচ্ছে করে ফেলাটা উচিত না আমাদের।'

ওর হাত তুলে নিয়ে চুমু খেলাম। হাতটা ঘষলাম আমার গালে। 'না, ছোট নই, আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ।'

সামনে ঝুঁকে আমাকে চুমু খেয়ে বলল ও: 'ফ্র্যাঙ্কি, তুমি খুব মিষ্টি!' তারপর রান্নাঘরে চলে গেল।

দরজার কাছে গিয়ে ওকে দেখতে থাকলাম। 'জেনেট,' জোর করে হাসি ফোটালাম মুখে: 'তুমি একজন দুষ্টু মহিলা, এভাবে হতাশ করলে আমাকে।'

ইস্ত্রি করতে করতে ফিরে তাকাল ও। চোখে আহত দৃষ্টি। না, করিনি, ফ্র্যাঙ্কি,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল: 'কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'উঁহুঁ, বাসো না,' আমিও সমান গম্ভীর স্বরেই জবাব দিলাম।

ইস্ত্রি শেষ করে, বোর্ডটা তুলে দিয়ে, ইস্ত্রিটা সরিয়ে রেখে, নিজের ঘরে চলে গেল ও। কাপড় বদলে নিল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলে আবার চুমু খেলাম ওকে। তারপর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে ওর দাদুর বাড়িতে চলল।

রাস্তায় পরস্পরকে 'হ্যাপি হলিডে' জানিয়ে আলাদা হয়ে দুজন দুদিকে চললাম। চিন্তিত ভঙ্গিতে রাস্তা ধরে হাঁটছি আর ভাবছি, এই গ্রীষ্মে অনেক বড় হয়ে গেছে জেনেট।

ছয়

স্যাম কর্নেলের যে বিচার হবে সেকথা শুনলাম আমি ক্রিসমাসের তিন দিন আগে। স্টুডেন্ট-টিচার্স কমিটির এডভাইজারি কমিটির সদস্য হয়েও খবরটা আমাকে জানতে হলো অন্যের মুখ থেকে, অবাক হওয়ার মতই ঘটনা। আসলে কমিটির মিটিঙের কোনটাতেই উপস্থিত থাকিনি আমি, তাই শুনিনি। আমি ছিলাম আমার বাস্কেট বল প্র্যাকটিসে ব্যস্ত। স্বীকার করতে দোষ নেই, ওসব একঘেয়ে মিটিঙে উপস্থিত থাকার চেয়ে বাস্কেট বল খেলতে আমার বেশি ভাল লাগত।

করিডরে সেদিন মার্টিনের সঙ্গে দেখা। আমাকে জিজ্ঞেস করল, বিকেলে মিসেস স্কটের সঙ্গে দেখা করব কিনা। কেন, জানতে চাইলাম।

'স্যাম কর্নেলের ব্যাপারে আলোচনা হবে,' জবাব দিল ও। 'ওকে বোধহয় রিফর্ম স্কুলে পাঠানো হবে।'

'কী করেছে ও?' জানতে চাইলাম।

'বিপদে পড়েছে। মিটিঙে হাজির থাকলে জানতি,' ও জবাব দিল।

'মিটিং-ফিটিং আমার ভাল লাগে না,' বললাম। 'আমি ঠিক করেছি, এবারের টার্মে আর প্রেসিডেন্ট থাকব না। বাস্কেটবল টিম নিয়ে ব্যস্ত আছি এখন, নাকি শুনিসনি?'

'না শোনার কিছু নেই, মিস্টার হিরো,' হেসে জবাব দিল ও। 'এখন বল, দেখা করতে যাবি কিনা?'

'যাব,' বললাম। 'এখন আমার ক্লাস নেই, কাজেই যেতে পারব।'

পাশাপাশি হেঁটে চললাম আমরা। মিসেস স্কটের দরজার কাছে আমাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল মার্টিন। আমি ভিতরে ঢুকলাম।

'হ্যালো-া, মিসেস স্কট,' আমি বললাম: 'আমাকে ডেকেছিলেন?'

'হ্যালো-া, ফ্র্যান্সিস। হ্যাঁ ডেকেছিলাম,' তিনি জবাব দিলেন। 'ইদানীং কোথায় থাকো তুমি? কোন মিটিঙেই তো দেখি না।'

'আসলে খুবই ব্যস্ত,' আমি জানালাম: 'প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হয়। বাস্কেট বল টিমে যোগ দিয়েছি তো।'

'জানি,' তিনি বললেন। 'কিন্তু মিটিঙে তোমার যোগ দেয়া উচিত। তোমাকে ক্লাস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার এটা একটা কারণ।'

'জানি। কিন্তু এই টার্মে আমি ক্লাস করব না ঠিক করেছি।'

'পদটা ধরে রেখে থাকব না বললেই তো আর হলো না। যারা তোমাকে ভোট দিয়েছে, তাদের প্রতিও অবিচার করা হচ্ছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার এটাও একটা কারণ, এই কথাটা তোমাকে বলার জন্যে।'

'আমি শুনলাম, স্যাম কর্নেলের ব্যাপারে কথা বলতে চান।'

'হ্যাঁ, চাই। আর সেটার জন্যেও তো তোমার মিটিঙে থাকা জরুরি, কারণ স্যাম কর্নেলও তোমাকে ভোট দিয়েছে তার ভালমন্দ নিয়ে কথা বলার জন্যে। ও বিপদে পড়ার পর যখন আমাদের কাছে পাঠানো হলো, তুমি তখন অনুপস্থিত। তুমি থাকলে হয়তো দেখা করার সময় সাহস পেত, ওর পক্ষে কথা বলবে এ রকম একটা পরিচিত মুখ দেখে অন্তত ভরসা পেত।'

'তা ঠিক। আমি দুঃখিত।'

'কিন্তু তুমি দুঃখিত নও, ফ্র্যান্সিস, আমি জানি। তুমি অতিরিক্ত স্বার্থপর, আর তাই নিজের ঘাড়ে দোষ চাপতে যাচ্ছে দেখে দুঃখিত বলে পার পেতে চাইছ। যাকগে, তোমাকে নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাচ্ছি না আমি। এখন শোনো, স্যামকে সাহায্য করতে চাইছি আমি, আশা করি তুমিও চাইবে।'

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করলাম।

নিজের ডেস্কে গিয়ে বসলেন তিনি। 'বোসো, ফ্র্যান্সিস।'

ওঁর ডেস্কের কাছে একটা চেয়ারে বসলাম আমি।

'তুমি জানো, ফ্র্যান্সিস, কোন ছেলেকে রিফরম্যাটরিতে পাঠাতে ঘোর আপত্তি আছে আমার। কাউকে অপরাধী ভাবার আগে ভেবে দেখে উচিত, তার অপরাধী হওয়ার পিছনে কারণটা কী ছিল। আমাদের ব্যর্থতার জন্যেও তো এটা হতে পারে।' আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। 'আমি কি বলতে চাই আশা করি বুঝতে পারছ?'

'মনে হয়,' আমার কণ্ঠে সন্দেহের সুর।

'গুড!' চশমার ওপাশে মৃদু হাসির ঝিলিক দেখা গেল তাঁর চোখের তারায়। 'পরস্পরকে বুঝতে পারলে আমাদের কাজ করতে সুবিধে হবে।' টেবিল থেকে একটা ফাইল তুলে নিয়ে খুললেন তিনি। 'প্রথম এবং দ্বিতীয় টার্মে স্যাম খুব ভাল ছাত্র ছিল। সব বিষয়ে গড়ে পঁচাশির ওপর নম্বর পেয়েছে, সব সময় ওর গ্রেড ছিল 'এ'। হাজিরার রেকর্ডও খুব ভাল: একদিন মাত্র অনুপস্থিত থেকেছে, দেরি করে এসেছে মাত্র দুদিন।

'কিন্তু এই টার্মে এসে সে তিরিশ দিন অনুপস্থিত, প্রচুর ক্লাস মিস করেছে, আচরণ খারাপ করেছে। বেশির ভাগ সাবজেক্টে ফেল করেছে। এ সবের জন্যে অবশ্য ওকে রিফরম্যাটরিতে পাঠানো হচ্ছে না, হচ্ছে ভিন্ন কারণে। ও চুরি করেছে। ওর প্রতিবেশীরা অভিযোগ করেছে, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে নাকি কয়েকটা দোকানে ডাকাতি করেছে। আমরা তদন্ত করে দেখেছি, সাক্ষি-প্রমাণ সব ওর বিপক্ষে চলে যায়। ভাল ফ্যাসাদে পড়েছে ও, বুঝতে পেরেছ?

'ওর বাবা-মার সঙ্গে কথা বলেছি, সন্তোষজনক কোন জবাব দিতে পারেননি তাঁরা। ওর মা শুধু বলেছেন স্যাম খুব ভাল ছেলে। ওর বন্ধুরা ওর সর্বনাশ করেছে। এবং আমিও কথাটা বিশ্বাস করি। আমার ধারণা, স্যাম এখনও খারাপ হয়ে যায়নি। আমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। সত্যি কথাটা কী, জানতে চেয়েছি। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না ও, আসল কথাটা বলছে না।

'গত অক্টোবরে আদালত থেকে পেরোলে মুক্ত রয়েছে ও। ইতিমধ্যেই মনোবল

ভেঙে পড়েছে। রিফর্ম স্কুলে ওকে যেতেই হবে। তবে কেন ও এমন হয়ে গেল, সত্যি কথাটা জানা গেলে এখনও হয়তো ওকে বাঁচানো যায়। অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, লাভ হয়নি, একটা কথাও ফাঁস করেনি ও। মার্টিনকে দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু মার্টিনের সঙ্গে খাতির নেই ওর, ভালমত চেনেই না, তাই কিছু করতে পারেনি। শেষে তোমার কথা বলল মার্টিন। ফার্স্ট টার্মে নাকি স্যামের সঙ্গে তোমার খুব খাতির ছিল।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম। 'টার্মে আমি দেরি করে ঢুকেছিলাম, ও আমাকে খুব সহায়তা করেছিল।'

'তাহলেই বোঝো,' মিসেস স্কট বললেন: 'তুমি ওকে সাহায্য করলে ঋণটা শোধ করতে পারবে।'

'কিন্তু আমি ওকে কীভাবে সাহায্য করব? এ ধরনের কাজ তো আগে কখনও করিনি।'

'তাতে কোন অসুবিধে নেই,' সামনে ঝুঁকলেন তিনি। 'ওর সঙ্গে খাতিরটা নতুন করে ঝালিয়ে নাও। ওকে বোঝাও। তোমাকে পছন্দ করে থাকলে সব কথা তোমাকে বলবে। তুমি তখন আমাদের জানাবে। তারপর বাকি কাজ আমার। কী করা যায়, আমি সেটা বুঝব।'

'ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করব, মিসেস স্কট।'

'চেষ্টা নয়, ফ্র্যান্সিস, আমি জানি, তুমি পারবে। ওর পার্সোন্যাল ফাইল পড়ে দেখতে চাও?'

'না, লাগবে না,' মাথা নাড়লাম। 'ওর কথা আমি ওর কাছ থেকেই শুনব।'

হাসলেন তিনি। এবার হাসিটা অনেক চওড়া। 'খুশি হলাম, ফ্র্যান্সিস। তোমার কাছে এমন জবাবই আশা করেছিলাম। ইয়ে, তোমার বয়েস কত?'

'পনেরো।'

'আশ্চর্য! আমি কিন্তু তোমার বয়েস আরও বেশি মনে করেছিলাম। তোমার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা এই বয়েসী ছেলেদের থাকে না। তোমার ওপর অন্য ছেলেমেয়েরা কতখানি নির্ভর করে ভাবলে অবাক হবে। আর মার্টি তো তোমাকে দেবতা ভাবে।'

'অনেকদিন থেকে চেনে তো তাই,' আমি বললাম: 'একটু বাড়িয়েই ভাবে।'

'উঁহুঁ, তা না। মার্টির সঙ্গে তোমার পরিচয়টা কীভাবে হয়েছে, সব বলেছে আমাকে ও।'

দৃশ্যটা জ্যান্ত হয়ে উঠল আমার মনে। সামান্য ফ্যাকাসে, নির্ভিক একটা মুখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমার ঘুসি মারার অপেক্ষায়। 'আপনাকে বলেছে ও?'

'বলেছে। ওকে বক্সিং শেখানো, ডকে সাঁতার কাটা, স্কুল ছুটির পর তোমার কাজ করা, গ্রীষ্মের ছুটিতেও ছুটি না কাটিয়ে কঠোর পরিশ্রম করা, সবই বলেছে আমাকে। তোমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি আমি।'

ঠিক এই সময় পিরিয়ড শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজল। পরের পিরিয়ডে আমার অঙ্ক ক্লাস। উঠে দাঁড়ালাম। 'আমার ক্লাস আছে।'

তিনিও উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। 'আমার বিশ্বাস, স্যামের ব্যাপারে কিছু একটা করতে পারবে তুমি।'

'মনে হয়। ও খুব ভাল ছেলে।' আমি দরজা খুললাম।

'ফ্র্যান্সিস,' করিডরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমাকে থামালেন তিনি: 'ক্লাস প্রেসিডেন্ট থেকে রিজাইন দিতে চাওয়ার ব্যাপারে তোমাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করব আমি। অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে এই দায়িত্বে থাকাটা তোমার জন্যে অনেক জরুরি।'

'ঠিক আছে, ভাবব,' বেরিয়ে এলাম। হলওয়েতে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ক্লাসে দৌড়াচ্ছে ছেলেমেয়েরা। ফিরে তাকিয়ে মিসেস স্কটকে বললাম: 'গুড-বাই।'

হাসলেন তিনি। 'ব্যাপারটা নিয়ে অন্য সময় আবার কথা বলব আমরা। আমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসার জন্যে ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না,' স্প্যানিশ ভাষায় জবাব দিলাম, ভাষাটা প্র্যাকটিস করছিলাম সেসময়।

দরজা লাগিয়ে দিলেন তিনি। হল ধরে হেঁটে চললাম আমি।

সাত

অঙ্ক ক্লাসের পর আবার মার্টিনের সঙ্গে দেখা।

'দেখা করেছিস?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ।'

'কী করবি?'

'জানি না। কীভাবে শুরু করব, তা-ও জানি না।'

'প্রথমে ওর সঙ্গে দেখা কর,' হেসে বলল মার্টিন।

'আহা, সেটা যেন আমি জানি না। দেখা করলাম, তারপর? ওর চারপাশে হেগে বেড়াব?'

'দেখ, ফ্র্যান্সিস,' ওর স্বভাবজাত আন্তরিক স্বরে বলল ও: 'ওভাবে কথা বলিস না। কারও জন্যে হেগে বেড়াচ্ছিস না তুই, সাহায্য করতে চাইছিস। একজন বন্ধুকে সমস্যা থেকে উদ্ধার করতে চাইছিস।'

'হয়তো। কিন্তু ধর, আমার কথা সে শুনল না, আমাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলল, তখন?'

'তখন কী বলবি না বলবি সেটা তোর ব্যাপার। তবে আমার বিশ্বাস, পারবি তুই,' দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে কথাটা বলল মার্টিন।

'অনেক ধন্যবাদ তোকে, মার্টি, আমার আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করার জন্যে। ঠিক আছে, দেখা যাক।'

'আমি জেরির কাছে যাচ্ছি, কোক খেতে। যাবি?'

'না, থ্যাংকস। আমার ক্লাস আছে।'

'দেখা হবে,' বলে চলে গেল ও।

হল ধরে হেঁটে চললাম আমি। বায়োলজি ক্লাসের সামনে রুথের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। রুম থেকে বেরিয়ে আসছিল ও।

'ও, তুমি। ইচ্ছে করেই ধাক্কাটা দিলে।'

মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। সব সময় ও আমাকে অপমান করে কথা বলবে, ব্যঙ্গ করবে, আর আমি সহ্য করে যাব এ হতে পারে না। আর এ মুহূর্তে কারও কথাই সয়ে যাবার মত মেজাজ নেই আমার। 'যদি জানতাম তুমি বেরোবে, ভুলেও এদিক দিয়ে আসতাম না।'

'ঘটনাটা কী? খুব কি গায়ে লাগল?'

'শোনো, সব কিছুরই একটা সীমা আছে। আমি তোমার কী করেছি বলো তো?'

'না, কী আর করবে,' বিচিত্র হাসি হাসল ও। এই হাসি আমার চেনা। মার্টিনও এ রকম করে হাসে। 'আমি জানি, তুমি একটা ভুয়া। একটা ফালতু ছেলে, পচা ডিম।

তোমার মত ছেলেদের আমি দুচোখে দেখতে পারি না।'

রাগে অন্ধ হয়ে গেলাম। 'তুমি কোথাকার বিশ্বসুন্দরী,' ভয়ানক হয়ে উঠল আমার কণ্ঠস্বর: 'স্বার্থপর, নীচ, কুত্তি কোথাকার! বড় বড় কথা বলা ছাড়া আর কী জানো তুমি।'

আমাকে চড় মারতে হাত তুলল ও। কব্জি ধরে ফেললাম। চোখে চোখে তাকালাম। ধকধক করে জ্বলছে ওর চোখ। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। তারপর হাতটা ছেড়ে দিলাম। কব্জির কাছে সাদা হয়ে গেছে ওর, যেখানটায় আমি ধরেছি।

'আমি হলে এই কাজটা করতাম না, তুমি যা করলে,' মুখে হাসি ফুটিয়ে বললাম। 'এটা কোন ভদ্র মেয়ের কাজ হলো না।'

ওর চোখের আগুন নিভে গেল। ঢিল হয়ে এল মুখের পেশি। হাসার চেষ্টা করল। ক্ষমতা আছে মেয়েটার। 'ঠিকই বলেছ তুমি, ফ্র্যাঙ্কি। আমি দুঃখিত। আসলে তোমাকে কোন সুযোগই দিইনি আমি। সেই যখন থেকে...'

'যখন থেকে মার্টিকে তোমাদের বাড়ির পার্লারে ঘুসি মেরেছিলাম?'

'না, সেজন্যে নয়। জুলির জন্যে।'

'জুলি?' অবাক হয়ে গেলাম। 'তুমি জানতে?'

'আমার মনেই হচ্ছিল জুলির সঙ্গে কিছু একটা হচ্ছে তোমার। তুমি আসার আগে আমরা বোনের মত ছিলাম। কিন্তু তুমি ঢুকতেই সব কেমন উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। মুখচোরা হয়ে গেল ও, কথা কম বলা শুরু করল। আমি...আমি তোমাকে নিয়ে হিংসে শুরু করলাম। ও চলে যাবার পরও আমাকে লেখা চিঠিগুলোতে তোমার কথা জিজ্ঞেস করত ও, তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে বলত, কিন্তু কখনই তোমাকে সেসব কথা বলিনি।'

ক্লাস শুরুর ঘণ্টা বাজল। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করল না। আমি জানতে চাইছিলাম জুলি ও আমার ব্যাপারে কতখানি জানে রুথ। ওর হাত চেপে ধরে দরজার কাছ থেকে দূরে টেনে নিয়ে চললাম। বাধা দিল না ও।

'বলনি কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কেন বলিনি, বলেছি তোমাকে,' ও জবাব দিল। 'তবে এখন ওসব পাট চুকেবুকে গেছে। জুলি বিয়ে করেছে।'

অদ্ভুত এক ধরনের স্বস্তি বোধ করলাম কথাটা শুনে। জিজ্ঞেস করলাম: 'আমার আর জুলির ব্যাপারটা কখন জানতে পেরেছিলে?'

'এক রোববারে, তোমরা সৈকত থেকে ফিরে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলে। হল থেকে কথার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। উঁকি দিয়ে দেখি তুমি ওকে চুমু খাচ্ছ। মার্টিকে বক্সিং শেখানো নিয়ে এমনিতেই তোমার ওপর আমার মেজাজ খারাপ ছিল, ওটা দেখার পর আরও খারাপ হয়ে গেল।'

'ও! আর কিছু দেখেছ?'

'যেটুকু দেখেছি সেটুকুই কি যথেষ্ট নয়?'

ওই মুহূর্তেই অনুভব করলাম রুথকে নিয়ে আমার উদ্বেগের অবসান ঘটল।

নিজেকে ওর চেয়ে বড় মনে হলো। হালকা, উচ্ছল লাগছে মনটা। হলওয়ের মোড়ে রয়েছি আমরা। কোন ছাত্রছাত্রীকে চোখে পড়ছে না। সবাই এখন ক্লাসে।

'চুমু খাওয়ার মধ্যে তেমন কিছুই নেই,' বললাম: 'দেখাচ্ছি তোমাকে।' কাঁধ চেপে ধরে একটানে ওকে কাছে নিয়ে এসে ঠোঁটে চুমু খেলাম। ছেড়ে দিয়ে বললাম: 'বুঝলে তো?'

চড় মারার জন্য আবার হাত তুলল ও।

আমিও আমার হাত তুলে নিজেকে বাঁচানোর ভান করলাম। হেসে বললাম: 'না না, আর না!'

মাথা নাড়ল ও: 'না, আর না!'

'এখন তাহলে কী? বন্ধু হয়ে গেলাম?' হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে।

'হ্যাঁ, বন্ধু!' হাতটা ধরল ও।

আন্তরিক ভঙ্গিতে হাত মেলালাম আমরা।

'এবার যেতে হয়,' আমি বললাম। 'আমার ক্লাস আছে, ভুলে গেছ?'

ক্লাসের পথে অর্ধেক চলে গেছি, এ সময় একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম। দেখি, ও কাঁদছে।

'কী হয়েছে, রুথ?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আমি দুঃখিত। তোমার সঙ্গে ওরকম করাটা উচিত হয়নি আমার।'

'না, এমনি!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে জবাব দিল ও। 'একটা মেয়েকে কখন একা থাকতে দিতে হয় বোঝো না কেন, হাঁদা কোথাকার?' ঝটকা দিয়ে ঘুরে দৌড়ে হলের মাথার সিঁড়ির দিকে চলে গেল ও।

'মেয়েগুলো কেমন পাগল!' ভাবতে ভাবতে ক্লাসের দিকে এগোলাম। দেরি করে ঢোকার জন্য ক্ষমা চাইলাম টিচারের কাছে।

একটা জরুরি কাজে আটকে পড়েছিলাম যখন জানালাম মিস্টার ওয়েলসবার্ডকে, তিনি হাসলেন।

'তা তো বটেই!' এতটাই জোরে বললেন তিনি, পিছনের সারিতে যারা বসেছে, তাদের কানেও গেল কথাটা। 'তোমার জায়গায় আমি হলে ওই জরুরি কাজটা সেরে ক্লাসে ঢোকার আগে ঠোঁটের লিপস্টিক মুছে নিতাম। যাও, বোসো।'

আট

ক্লাস শেষে বেরোনোর আগে কে যেন আমার হাত চেপে ধরল। চমকে ফিরে তাকালাম। মিস্টার ওয়েলসবার্ডের খোঁচা দেয়া কথার লজ্জাটা তখনও হজম করে সারতে পারিনি। দেখি, মার্টিন আমার হাত ধরেছে।

'ও, তুই!'

'কেন, তুই কাকে মনে করেছিলি?'

'কাউকে না।'

'শোন, মিসেস স্কটের সঙ্গে অফিসে দেখা করতে গেছে স্যাম। কাকতালীয়ভাবে তুইও তাঁর অফিসে ঢোকার ভান করে ওর সঙ্গে কথা বলার একটা সহজ সুযোগ করে নিতে পারিস এখন।'

'বুদ্ধিটা নিশ্চয় তোর নয়?'

'না, মিসেস স্কটের,' জবাব দিল ও। 'স্যামকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন তোকে দেখা করার সুযোগ দেয়ার জন্যে।'

'কিন্তু আমার ক্লাস আছে যে, স্প্যানিশ ক্লাস, সেটার কী হবে?'

'সেটাও ভেবে রেখেছেন মিসেস স্কট,' মার্টিন জানাল। 'তোর ক্লাসের টিচারকে দিয়ে আসার জন্যে আমাকে নোট দিয়েছেন তিনি, যাতে টিচার তোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন।'

'সব দিক ভেবে রেখেছেন তিনি, তাই না?'

'হ্যাঁ।' ঘুরে হাঁটতে শুরু করল মার্টিন।

নীচতলায় নেমে এলাম। মিসেস স্কটের অফিসের বাইরের ঘরে দরজার সামনে বেঞ্চে বসে আছে স্কট। ওকে দেখে অবাক হওয়ার ভান করলাম।

'আরে, স্যাম! তুমি এখানে?'

'হ্যালো-া, ফ্র্যাঙ্কি,' মলিন হেসে জবাব দিল ও। 'মিসেস স্কটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

আমার বইগুলো টেবিলে রেখে ওর কাছে এসে দাঁড়ালাম। 'আমি কয়েকটা কাগজ নিতে এলাম।' বসে পড়লাম ওর পাশে। 'ওই বুড়ি শকুনিটার কাছে তোমার কী কাজ?'

'বাধ্য হয়ে, বুঝলে। আসতে হয়েছে। একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি।'

'খুব খারাপ কিছু?' জানতে চাইলাম।

'খুবই খারাপ। মনে হচ্ছে এবার আর আমাকে না পাঠিয়ে ছাড়বে না ওরা।' মন খারাপ করেই কথাটা বলল ও, কণ্ঠের উত্তেজনা চাপা থাকল না।

ওর দিকে তাকালাম। 'আমি কিছু করতে পারি?'

'মনে হয় না,' অন্যদিকে চোখ সরাল ও। ভঙ্গি দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

'ইস্, আমার সঙ্গে আগে দেখা করলে না কেন? আমি তোমাদের প্রেসিডেন্ট হয়েছিই তো বিপদে-আপদে সাহায্য করার জন্যে। দেখো, আমি তোমার বন্ধু, এক সময় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল অস্বীকার করতে পারবে না। চলো, দূরে কোথাও গিয়ে বসি। কী হয়েছে আমাকে খুলে বলবে। দেখি কোনও সাহায্য করতে পারি কিনা। কি বলো?'

আমার দিকে ফিরে তাকাল ও। আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখে। উঠে গিয়ে জানালার পাশে বসলাম আমরা।

'শুরুটা হয়েছে গত গ্রীষ্মে,' ও বলল। 'গরমের ছুটিতে একটা কাজের খোঁজ করছিলাম আমি। টাকাটা পেলে বাড়িতে আমাদের পরিবারের কাজে লাগত। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে দুই জায়গায় মেসেঞ্জার বয়ের জন্যে চাকরির দরখাস্ত করলাম। কিন্তু ওরা আমাকে নিল না, কারণ আমি কালো। কুলিটুলির চাকরি হয়তো পেতাম কোথাও, কিন্তু তার জন্যে যতটা বড় হওয়া দরকার, ততটা আমি নই। পুরানো পেশায় ফিরে যেতে পারতাম–জুতো পালিশের কাজ, কিন্তু তাতেও প্রতিযোগিতা অনেক, পয়সা কম। গরমের ছুটিতে অনেক ছেলেই এই কাজে নেমে পড়ে।'

'কাকে আর কী বলছ!' আমি বললাম। 'এতিমখানায় থাকতে আমিও তো এই কাজই করতাম।'

'তুমি করতে?' হাসি ফুটল ওর মুখে। 'তাহলে তো জানোই কতটা কঠিন এই কাজ। যাই হোক, একদিন একটা লোক এসে আমাকে বলল: স্যাম, বাতিল মালের ব্যবসা করছ না কেন? আমি বললাম: লাভ কী? ওতে তো পয়সাকড়ি তেমন নেই। ও বলল: আমরা যেভাবে করি সেভাবে করতে পারলে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: আপনারা কীভাবে করেন? ও বলল: শোনো, তুমি একটা যোগ্য ছেলে। কাজের খোঁজে ঘুরছ। আমি এ-ও জানি, কোন কাজ পাচ্ছ না। কেন পাচ্ছ না তা-ও জানি। কেন, বলব? কারণ, তুমি কালো চামড়া, নিগ্রো, সেজন্যে পাচ্ছ না। সাদারা তোমার চেয়ে অনেক অযোগ্য হয়েও কাজ পেয়ে যায়। এই যে, আমিও তোমার মত কালো, বুককিপিঙে উচ্চ ডিগ্রি নিয়েও ভাল কোন চাকরি পাচ্ছি না...। আমি বললাম: ওসব পুরানো কথা ছাড়ুন। নতুন কিছু জানা থাকলে বলুন। ও বলল: শোনো, আমি একজনকে চিনি, যে পুরানো জিনিস কেনে, জিনিসটা কোথা থেকে এল, জানতে চায় না, কোন প্রশ্ন করে না। তা ছাড়া ভাল টাকা দেয়। ও কী বলতে চায়, বুঝতে পারলাম। চুরি করতে বলছে। জিজ্ঞেস করলাম: যদি ধরা পড়ি? ও বলল: বাঁচানোর ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থাটা কী, জানতে চাইলাম। ও বলল, পুলিশকে ঘুষ দিয়ে। তবে একটা কাজ তোমাকে করতে হবে, যত যা-ই ঘটুক না কেন, মুখ বন্ধ রাখতে হবে। মুখ খুললেই কিন্তু মরেছ, আর বাঁচাতে পারব না। ওর কথা বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু আমি ধরা পড়ার পর ও আমাকে বাঁচাতে পারল না। ও নিজেও বাঁচতে পারল না। দলের সবাই এখন লাল ঘরে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে।'

'তারমানে ভাল ঝামেলায়ই জড়িয়েছ,' আমি বললাম। 'তো, এখন কী করবে?'

'মিসেস স্কটকে বোঝানোর চেষ্টা করব, যাতে আমার পড়াশোনাটা বন্ধ না হয়।'

যা শোনা দরকার শুনেছি। মিসেস স্কটের ঘরে ঢুকলাম। তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন: 'তারপর, ফ্র্যান্সিস?'

স্যাম আমাকে যা যা বলেছে, সব তাঁকে খুলে বললাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে আমার কোনও পরামর্শ আছে কিনা।

'নেই,' সত্যি কথাটাই বললাম।

'তবে আমার আছে,' তিনি বললেন। 'আমি এখনও মনে করি না ও খারাপ হয়ে গেছে। এ যাত্রা ওকে রিফরম্যাটরিতে যাওয়া থেকে বাঁচাতে হবে। ওকে তোমার দলে টেনে নাও, যাতে আর কোনমতেই খারাপদের সঙ্গে মিশতে না পারে। এমন ভাব করো, ওকে বুঝতে দাও, যেন এখন থেকে তুমিই ওর অভিভাবক, ওর সব দায়িত্ব তোমার। বাকিটা আমার কাজ। দেখি, ওর জন্যে কী করতে পারি। তবে আমি যে তোমাকে এ সব বলেছি, ওকে বলবে না।'

'আপনি কি এখন ওর সঙ্গে কথা বলবেন?'

'হ্যাঁ, বলব। কারণ, ও কিন্তু এখনও খারাপ হয়ে যায়নি। শোধরানোর সময় আছে। ওকে বোঝাব, তুমিই ওকে বাঁচিয়েছ। তুমি না থাকলে ওর রক্ষা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তোমার ওপর ভক্তি বেড়ে যাবে ওর।'

'ঠিক আছে, যা ভাল বোঝেন।' উঠে দরজার দিকে এগোলাম আমি।

নয়

অ্যাকাউন্ট সেকশনে স্যামকে অ্যাসিসট্যান্ট ক্যাশিয়ারের একটা চাকরি দেয়া হলো, শুধু লাঞ্চ পিরিয়ডে ওর কাজ। কাজের সময় কাজ করে, টাকা খারাপ পায় না, পড়াশোনায় আবার মন দিতে পারল ও। ক্লাসের হাজিরা বেড়ে গেল, পরীক্ষায় নম্বরের উন্নতি হলো। মাঝে মাঝেই ওর সঙ্গে দেখা করি, ওর খোঁজখবর নিই। আমার মনে হলো, খারাপ রাস্তা থেকে সরে এসেছে ও।

নির্বাচনের সময় এগিয়ে আসছে। আরেকবার প্রেসিডেন্ট হতে রাজি নই আমি। অনেক কাজ এখন আমার। খেলাধূলা ছাড়াও নানারকম সামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়েছি। নিজের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের মাঝে আমার কদর বেড়ে গেছে।

এক সন্ধ্যায় জেনেটের সঙ্গে ওদের বাড়ি গেলাম জরুরি আলোচনা করতে। জেরি ও মার্টিনও গেল আমাদের সঙ্গে। লাউঞ্জে ইজি চেয়ারে বসলাম। ওদের বাড়িতে আমার প্রিয় চেয়ারটায়, জেনেটের বাবার ইজি চেয়ার ওটা, পা তুলে দিলাম সামনে রাখা গদিতে। শুধু যে আরামের জন্য ওই চেয়ারটাতে বসি তা নয়, ওটাতে বসলে মনে হয় সিংহাসনে বসেছি, ঘরের সবার ওপর কর্তৃত্ব করার মনোভাব এসে যায় আমার মধ্যে। আমার উল্টো দিকে কাউচে বসল জেরি ও জেনেট। মার্টিন বসল ডানের একটা ছোট লাউঞ্জ চেয়ারে।

'শোনো,' কথা শুরু করলাম: 'তোমরা সবাই জানো, দ্বিতীয়বার আর প্রেসিডেন্ট হওয়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আরও অনেক কাজ আছে আমার।'

'কিন্তু,' জেরি বলল: 'দাঁড়ালে তুইই জিতবি। তুই ভীষণ জনপ্রিয়।'

'জাহান্নামে যাক জনপ্রিয়তা! ওই কাজটায় কোন বৈচিত্র নেই, কোন মজা নেই। কাজেই আমি আর ওটা চাই না।'

'সে-তো বুঝতেই পারছি,' মার্টিন বলল। 'মিটিঙে যাস না, যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলিস। তোর কাজ সব জেনেট করে দেয়, সমস্ত ঝামেলা ওকেই পোহাতে হয়।'

'তাতে জেনেটের কোন অভিযোগ আছে কিনা আমি ওর মুখ থেকে শুনতে চাই,' জেনেটের দিকে তাকালাম। 'কী, কিছু বলবে?'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল ও। 'না, আমার কোন অভিযোগ নেই।'

'ব্যস, তাহলে তো মিটেই গেল,' মার্টিনের দিকে তাকালাম। 'কাজটাকে যদি এতই বড় মনে হয় তোদের, তোরা কেউ একজন দাঁড়াচ্ছিস না কেন?'

'আমি কুলাতে পারব না তুই ভাল করেই জানিস,' মার্টিন জবাব দিল। 'মিসেস স্কটের কাজ করেই সারতে পারি না।'

'তাহলে আমাকে চাপাচাপি বাদ দে,' রুক্ষস্বরে বললাম। জেরি ও জেনেটের দিকে তাকালাম। 'তোমাদের ইচ্ছেটা কী? তোমাদের একজন হয়ে যাও।'

'জেনেট!' চেঁচিয়ে উঠল মার্টিন। 'মেয়েরা ক্লাস প্রেসিডেন্ট হয় কে কবে শুনেছে!'

'শোনেনি বলেই যে হতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। কী জেনেট, তোমার কী ইচ্ছে?'

'আমার ইচ্ছে অনিচ্ছেতে কিছু হবে না! আমাকে কেউ ভোট দেবে না।' জেরির দিকে তাকাল জেনেট। 'তোমার কী ইচ্ছে?'

পুরো একটা মিনিট চুপ করে বসে থাকার পর হাসল ও। সুন্দর করে হাসে জেরি। বলল: 'হতেই যদি হয়, এক শর্তে হতে পারি।'

'কী শর্ত?' মার্টিন জানতে চাইল।

'জেনেটকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে,' হাসিমুখে ওর দিকে তাকাল জেরি।

'ও নিশ্চয় থাকবে,' জেনেট কিছু বলার আগেই আমি বললাম।

একটা মুহূর্তের জন্য হতাশ মনে হলো জেনেটকে। তবে সেটা আমার বোঝার ভুলও হতে পারে। যা-ই হোক, দূর হয়ে গেল হতাশাটা।

পরদিন বারান্দায় আমাকে দেখতে পেয়ে থামালেন মিসেস স্কট। 'এই, তুমি নাকি আর প্রেসিডেন্ট থাকতে চাও না?'

বুঝলাম, মার্টিন বলেছে ওঁকে। হাসিমুখে জবাব দিলাম: 'খবর খুব দ্রুত ছড়ায়!'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, আমার সঙ্গে শেষবার কথা বলার পর তুমি মত বদলাবে।'

'না, বদলাইনি।'

'স্যামের ব্যাপারে কী ঠিক করলে?'

'ও ঠিকই আছে, ওকে নিয়ে ভাববেন না। জেরিকে বলেছি, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে। ও রাজি হয়ে গেছে।'

'ফ্র্যান্সিস, কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, তোমার ব্যাপারে ভুল ভাবনা ভেবে এসেছি এতদিন।'

'হয়তো। সবাই আমরা ভুল করে থাকি।'

'তবে আমার ধারণা ভুল না হলেই খুশি হতাম। তোমাকে আমি পছন্দ করি।' নিজের অফিসে চলে গেলেন।

জেরি প্রেসিডেন্ট ও জেনেট আবার ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে যাবার পর আমার মাথা থেকে বিরাট বোঝা নেমে গেল। আমার খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় বেশি করে মনোযোগী হতে পারলাম। ক্লাসের চেয়ে জিমনেশিয়ামে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি আমি, কারণ ক্লাসের একই বয়েসের ছেলেমেয়েগুলোকে আমার কেমন ছোট ছোট মনে হয়।

জেনেটের সঙ্গে বেশি মেলামেশাও বন্ধ করে দিলাম। সপ্তায় মাত্র একবার ওকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাই। তারচেয়ে বয়স্ক মেয়েদেরকেই আমার বেশি ভাল লাগে। ওরা অভিজ্ঞ, ওদের সঙ্গে অনেকটাই এগোনো যায়, তাই ওদের সঙ্গে বেশি মিশি।

একদিন স্কুল থেকে বেরিয়েই পড়লাম জেরির সামনে।

'হাই!' আমি বললাম।

'হাই!' জবাব দিল ও। 'আজকাল কী করছিস তুই, বল তো? দেখাসাক্ষাৎ হয় না মোটেও।'

'কাজে ব্যস্ত থাকি।'

'জানি। জেনেট আমাকে সব বলেছে। ও কিন্তু তোর কাজকারবার পছন্দ করছে না।'

'আমি কচি খোকা নই। নিজেকে আমি সামলাতে জানি, সেই সঙ্গে জেনেটকেও।'

'কিন্তু জেনেট...' বলতে গিয়ে থেমে গেল ও। অস্বস্তিভরা চোখে তাকাল আমার দিকে।

'জেনেটের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে।'

আমার হাত ধরে টান দিয়ে আমাকে ওর দিকে ঘুরিয়ে নিল জেরি। গম্ভীর হয়ে গেছে চেহারা। 'ফ্র্যাঙ্ক, তোর মুখ থেকে এই কথাটা শোনারই অপেক্ষা করছিলাম আমি।'

'শুনলি তো। এখন কী করবি?'

'কিছু না।' আমার হাত ছেড়ে দিল ও। রাস্তা ধরে হেঁটে চলে গেল শিস দিতে দিতে।

ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বোঝার চেষ্টা করছি ওর মনে কী রয়েছে। সেদিনই দেখা করলাম জেনেটের সঙ্গে।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ওদের বাড়ির সামনের দরজার বেল বাজালাম। দরজা খুলে দিল ও। আমাকে দেখে হাসল। 'এসো, ফ্র্যাঙ্কি।'

'হ্যালে-া,' ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললাম।

পারলারে ঢুকলাম দুজনে। সেখানে বসে আছে জেরি ও মার্টিন। ওদেরকে ওখানে দেখে অবাক হলেও মুখের ভাবে সেটা প্রকাশ পেতে দিলাম না। ওরাও ভান করল আমি আসার অনেক আগে থেকেই ওখানে আছে।

'এই, কেমন আছো তোমরা!' আমি বললাম।

'বাপরে, আকাশ থেকে দেবতা নেমে এলেন!' মার্টিন বলল জেরির দিকে তাকিয়ে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল: 'সালাম, মহারাজ!'

'ওর কথা কানে নিস না, মার্টিন,' আমি বললাম: 'বড় বড় কথা বলা ওর স্বভাব।'

'তুই এখানে এসেছিস কেন?' মার্টিন জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'জেনেটের সঙ্গে দেখা করতে,' হাসিমুখে জবাব দিলাম। 'তোর কী খবর?'

জরুরি কাজের কৈফিয়ত দিল মার্টিন।

'আহহা, এসে তো তাহলে ভুলই করলাম। তোদের কাজে বাধা দিলাম। যাকগে, তোদের কথা তোরা বল। আমি যে আছি ভুলেই যা।' জেনেটের বাবার ইজি চেয়ারটায় বসে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিলাম। ওকে জিজ্ঞেস করলাম: 'তোমার আব্বা-আম্মা কোথায়?'

'দাদুর বাড়ি গেছে,' জেনেট জানাল। 'দাদুর শরীর ভাল না।'

'তাই নাকি?' সহানুভূতির সুরে বললাম। 'খারাপ কিছু?'

'না, ঠাণ্ডা লেগেছে।'

জরুরি কাজে আসার কৈফিয়তটা দিয়ে ফাঁদে পড়ে গেছে জেরি ও মার্টিন, আসলে কোন আলোচনাই নেই ওদের, তাই উসখুস করে উঠে দাঁড়াল জেরি। 'আমরা যাই। কথা এমনিতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।'

'আমি এসে বাধা দিলাম না তো? তাহলে আমিই যাই,' আড়চোখে তাকালাম দুজনের দিকে।

'না না,' বাধা দিল জেনেট: 'কারোরই যাওয়ার দরকার নেই। রেডিওতে মিউজিক ছেড়ে দিচ্ছি। দেখি, কিছু খাবারেরও জোগাড় করি।'

কিন্তু কিছুতেই আর থাকতে চাইল না মার্টিন ও জেরি। মার্টিন বলল, বাড়িতে জরুরি কাজ ফেলে এসেছে। ওর কথার সুর ধরে একই কৈফিয়ত দিল জেরিও। তাড়াহুড়া করে চলে গেল দুজনে।

দরজা লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল জেনেট। দুজনেই হাসতে লাগলাম আমরা। 'এসো, বেবি, চুমু খাও আমাকে।' দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাছে আসতে ইশারা করলাম ওকে।

কাছে এল ও। চুমু খেলাম ওকে।

জেনেট বলল: 'অনেক দিন দেখা হয় না।'

'খুব ব্যস্ত,' আমি বললাম। 'তবে তোমাকে খুব মিস করি আমি। আরও ঘন ঘন আসা উচিত আমার।'

'মিছে কথা বোলো না, ফ্র্যাঙ্কি,' ও বলল। 'অন্তত আমার সঙ্গে মিথ্যে বোলো না। বলে লাভ হবে না।'

'জানি, বেবি।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, ফ্র্যাঙ্কি।'

আবার ওকে চুমু খেলাম। তবে আমার মন বলছে বেশিদিন আর চুমু খেতে পারব না ওকে, ওর সঙ্গে জেরির...যাকগে, যখন হবে তখন দেখা যাবে। এ মুহূর্তে অন্তত সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইলাম না।

দশ

এর কয়েক সপ্তা পর এক দুপুরে লাঞ্চ খাচ্ছি আমি, এ সময় মার্টিন এসে বসল আমার পাশের সিটে। 'হাই, ফ্র্যাঙ্কি, খবর জানিস?'

'না। তুই বল।'

'সব খবর তো আজকাল তোকে নিয়েই।'

'উঁ।' গুরুত্ব দিলাম না।

'ক্লাস অফিসেও তোর পাত্তা নেই। যাসই না। সবাই বলাবলি করছে তোর নাকি দেমাক বেড়েছে।'

হাসলাম। 'ওদের বলতে দে।'

'মিসেস স্কট অবশ্য এ কথা ভাবেন না।'

'তাই,' কাঁটা চামচের মাথা ঢুকিয়ে দুধের বোতলের মুখ ফুটো করলাম।

'তোর কী হয়েছে, বল তো?'

'কিছু না।' দুধের বোতলে চুমুক দিলাম। 'শোন, ওসব বিচার-আচার করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেছি আমি। আর মিসেস স্কটের কথা বলছিস তো? আমার ধারণা, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন তিনি। কোনদিন এ নিয়ে হয়তো একটা বইই লিখে ফেলবেন।'

আমার দুধের বোতলটা নিয়ে লম্বা এক চুমুক দিয়ে ফিরিয়ে দিল মার্টিন। ওর দিকে তাকালাম। আপেল পাইয়ের পে-টটা ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম: 'নে, খা।'

হাসল ও। 'না না, আমার খিদে নেই।'

'তাহলে কী করতে এলি এখানে, বল তো?'

'সত্যি জানতে চাস? তাহলে শোন, মিসেস স্কট চান, তুই আবার ওপরতলায় গিয়ে আমাদের সঙ্গে অফিসে বসে কাজ করিস। তাঁর ধারণা, এ সব কাজে সবার চেয়ে তোর বুদ্ধি অনেক বেশি।'

'আমিও তাই ভেবেছি, এটা বলতেই এসেছিস তুই,' বলে উঠে দাঁড়ালাম। মার্টিন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। 'ওঁকে গিয়ে বল, অন্য কাউকে জোগাড় করে নিতে। আমি আর পারব না।'

'ও-কে!' আস্তে করে উঠে দাঁড়াল ও। 'বেশ। তুই যখন তাই চাস, আমি তাঁকে বলব। তবে তুই একটা ভুল করছিস।'

'জানি। তবে ও নিয়ে মন খারাপ করিস না। ভুল আমি সারা জনম ধরেই করে এসেছি।'

লাঞ্চরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। আঙিনা পেরিয়ে এসে রাস্তায় নামলাম। রাস্তার অন্যপাশে সারি সারি বেঞ্চ পাতা। একটাতে বসে সিগারেট ধরালাম। জায়গাটা উঁচু,

অনেকটা পাহাড়ের ঢালের মত। সোজাসুজি তাকিয়ে নদীর ওপারে ব্রঙ্কস শহরটা দেখা যায়। সময়টা এপ্রিলের মাঝামাঝি। রোদেলা, উষ্ণ দিন। স্কুলের ক্লাস শেষ হওয়ার ঘণ্টার শব্দ কানে এল। আরেকটা ক্লাস শুরু হবে। জাহান্নামে যাক ক্লাস! যাব না ক্লাসে। অঙ্ক আমার ভাল লাগে না। আরাম করে হেলান দিলাম বেঞ্চের হেলানে। পোড়া সিগারেটের গোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে নতুন আরেকটা ধরালাম।

রাস্তা ধরে কয়েকটা মেয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। জেনেটও রয়েছে ওদের সঙ্গে। মুখ ঘুরিয়ে বসলাম। আশা করলাম, ও আমাকে দেখবে না। তিন সপ্তাহ আগে সেই যে গিয়েছি ওদের বাড়িতে, তারপর আর দেখা হয়নি। কিন্তু আমাকে দেখে ফেলল ও। কাছে এসে দাঁড়াল। রোদ পড়ছে ওর চুলে। দারুণ সুন্দরী দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু আমার কথা বলতে ইচ্ছে করল না। ওর সঙ্গে এখানে এভাবে দেখা না হলেই ভাল হতো।

'হাই, ফ্র্যাঙ্কি,' হেসে বলল ও। হাসিতে এমন কিছু একটা রয়েছে খেয়াল না দিয়ে পারলাম না। ও যেন বলতে চাইছে: দেখো, আমার ওপর রাগ কোরো না। ভুল যদি একটা করেই থাকি, তার জন্যে আমাকে দোষ দিতে পারবে না।

হাসিটা ফিরিয়ে দিলাম। 'হ্যালে-া, জেনেট।'

'তোমার ক্লাস নেই?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আছে, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না। আলসেমি লাগছে। বসন্তজ্বরে ধরেছে আমাকে।'

'দিনটা খুব সুন্দর, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি একটু বসলে কিছু মনে করবে?'

'না। আর এই বেঞ্চগুলো আছেই তো বসার জন্যে।'

বসল ও, আমার কাছ থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে। কিছুটা সময় কোন কথা বললাম না আমরা। চুপচাপ শুধু নদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তবে আমি জানি, কথা আমাকে বলতেই হবে। ও জিজ্ঞেস করবে, এতদিন কেন দেখা করিনি। আমিও সেই একই জবাব দেব, ব্যস্ততা। জিজ্ঞেস করবে, মিসেস স্কটের কথা বলেছে কিনা আমাকে মার্টিন, আমি আবার কাজ করতে যাব কিনা; আমি জবাব দেব যাব না। মিসেস স্কট যে আমকে কতটা পছন্দ করেন, সেটা তখন ইনিয়েবিনিয়ে বলবে ও। জিজ্ঞেস করবে, ক্লাস কেমন চলছে আমার। আমি জবাব দেব, ভালই চলছে, কারণ সব বিষয়েই আশির ওপর নম্বর থাকে আমার। তারপর হয়তো জিজ্ঞেস করবে, আমার টিমের সঙ্গে সাঁতার কাটতে যাব কিনা, জবাব দেব, মনস্থির করতে পারিনি। এমনি আরও হাজারটা সাধারণ কথাবার্তা চলতে থাকবে আমাদের মধ্যে।

আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতে ফিরে তাকালাম। দ্বিতীয় সিগারেটটাও পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। গোড়াটা রেলিঙের ওপাশে ছুঁড়ে ফেললাম। দুজনেই তাকিয়ে রইলাম ওটার দিকে যতক্ষণ না পানিতে পড়ে। তারপর আরেকটা ধরালাম। অবশেষে কথা বলল ও।

'তুমি বদলে গেছ, ফ্র্যাঙ্কি–গত এক বছরে অনেক বদলে গেছ।'

'আমরা সবাই বদলেছি,' জবাব দিলাম। 'কেউই আর এখন ছেলেমানুষ নই আমরা।'

'আমি আসলে সেকথা বলছি না, ফ্র্যাঙ্কি,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয় আমার, মনে হয়, আমি তোমাকে চিনি না, কখনই চিনতাম না। আমি জানি আমরা সবাই বদলেছি–জেরি, মার্টিন, আমি–কিন্তু তোমার বদলানোটা একেবারেই অন্যরকম। তুমি হয়েছ শীতল, কঠিন, স্বার্থপর। আগে এ রকম ছিলে না।'

রুথের কথা মনে পড়ল, সে-ও এই কথাটা বলেছে আমাকে। জেনেটের দিকে তাকালাম। ভোঁতাস্বরে বললাম: 'আমি সব সময়ই এ রকম।'

আবার নীরব হয়ে গেলাম আমরা। নদীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভটভট করতে করতে স্রোতের প্রতিকূলে এগিয়ে চলেছে ওটা। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আর ধরালাম না। মুখের ভিতরটা কেমন বিস্বাদ লাগছে। পিছন থেকে এসে ঝাপটা দিল হালকা বাতাস। জেনেটের দিকে তাকালাম। ওর কোঁকড়া চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। ওর সেই চুল ছুঁতে ইচ্ছে করল আমার। এত কোমল, মখমলের মত মসৃণ আর নরম।

আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'অপরাধ খেয়ে বেতের বাড়ি খাওয়া ছোট্ট একটা ছেলের মত লাগছে তোমাকে এখন,' হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু ফোটাতে পারল না হাসিটা।

জবাব দিলাম না।

'ফ্র্যাঙ্কি, আমাদের বাড়িতে আসো না কেন আর?' ও বলল। এই তো শুরু হলো। ভাবছি, আসল কথাটা জিজ্ঞেস করার সাহস হবে কিনা ওর।

কী জবাব দেব বুঝতে পারছি না। আমি যে কী ভীষণ ব্যস্ত বিড়বিড় করে বলা শুরু করলাম...

'আগেও ব্যস্ত ছিলে তুমি আর এরই মাঝে সময়ও বের করে নিতে,' ও বলল।

জেরির সঙ্গে কী রকম চলছে জিজ্ঞেস করে প্রসঙ্গটা এড়ানোর চেষ্টা করলাম।

'আমি জেরির সঙ্গে তখনই মেলামেশা শুরু করেছি তুমি যখন অন্যদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছ,' ও বলল। 'কী করতে বলো তুমি আমাকে? বাড়িতে তোমার আসার অপেক্ষায় বসে থেকে থেকে হা-হুতাশ করব?' উত্তেজনায় সাদা হয়ে উঠল ওর মুখ।

'কিন্তু জেনেট,' আমি বললাম: 'আমরা এখনও এত বড় হয়ে যাইনি, কী করছি হয়তো বুঝতেই পারছি না...'

'তুমি পারছ না,' কেঁদে ফেলল ও। চোখের কোণে পানি টলমল করে উঠল, রোদে খুদে খুদে হীরার মত চমকাচ্ছে ওগুলো। 'কিন্তু আমি পারছি। আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ভালবাস।' দুই হাতে মুখ ঢেকে নীরবে কাঁদতে থাকল ও।

গলার ভিতরে অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে আমার। কথা বেরোচ্ছে না। অস্বস্তিভরে চারপাশে তাকালাম। কেউ আমাদের দেখছে না দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। 'কিন্তু

জেনেট...' সামনে ঝুঁকে ওর কাঁধে হাত রাখলাম। কী করে বোঝাব ওকে যে আমি ওর মনে কষ্ট দেয়ার জন্য দুঃখিত, হাঁদা মনে হচ্ছে নিজেকে? ইভের কথা ভাবলাম, ওপরের ক্লাসে পড়ে যে মেয়েটা, গত কয়েক সপ্তাহ যার সঙ্গে আমি সম্পর্ক গড়ে তুলেছি, যার চোখের দৃষ্টি, দেহের ভাবভঙ্গি দিয়ে আমাকে আকৃষ্ট করে ফেলেছে। কী করে বোঝাব জেনেটের সরলতাকে আমি ভালবাসি? কী করে বোঝাব, আমি ওকে চাই, অনেক কিছু চাই ওর কাছে।

রাগ করে ঝাড়া দিয়ে আমার হাতটা কাঁধ থেকে ফেলে দিল ও। 'তুমি আমাকে ছোঁবে না। নিজেকে একটা সস্তা মেয়ে মনে হচ্ছে আমার। আমি তোমাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি।'

উঠে দাঁড়িয়ে স্কুলের দিকে দৌড়ে চলে গেল ও। ছোট্ট রুমাল বের করে চোখ মুছতে মুছতে। উঠে দাঁড়িয়ে আমি ওর পিছনে যেতে চাইলাম। কিন্তু মনে পড়ল, স্কুলঘরের জানালা দিয়ে আমাদের দেখা যাচ্ছে। কেউ না কেউ আমাদের দেখছে। সুতরাং চুপ করে বসে থেকে তাকিয়ে রইলাম জেনেটের দিকে।

ও চলে গেলে আবার নদীর দিকে ফিরলাম। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে দিনটা। রোদ মরে গিয়ে কেমন কুয়াশা কুয়াশা ভাব হয়ে আসছে। গায়ে কাঁটা দিল আমার। আবার ঘণ্টা বাজল। একটা ক্লাস শেষ হয়ে আরেকটা শুরু হতে যাচ্ছে। স্বস্তি বোধ করলাম। উঠে রওনা হলাম স্কুলের দিকে। আমার এখন স্প্যানিশ ক্লাস। দোতলায় উঠে জেনেটকে মেয়েদের ঘর থেকে বেরোতে দেখলাম। ওর কাছে গিয়ে বললাম: 'জেনেট।'

মুখ ফিরিয়ে নিল ও। নিচুস্বরে বলল,'কোনদিন আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না তুমি। কোনদিন না।' বরফের মত শীতল ওর কণ্ঠস্বর।

'বেশ,' আমার কণ্ঠও শীতল হয়ে উঠল: 'তুমি যখন চাইছ, তা-ই হবে।'

হল ধরে হেঁটে গেল ও। করিডরে মোড় ঘুরতে দেখলাম ওকে।

'জাহান্নামে যাক!' নিজেকেই যেন বোঝালাম আমি। 'জাহান্নামে যাক এই স্কুল!' এই 'বাচ্চাদের' খেলা আর ভাল লাগছে না আমার।

স্কুল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম জেনেটকে।

এগারো

বাড়িতে ঢুকে দেখলাম ডিনারের আয়োজন করা হচ্ছে। আইরিন ইতিমধ্যেই টেবিলে বসেছে, ইজি ওর মাকে স্টোভের কাছে সাহায্য করছে।

'হাই, কেমন আছো তোমরা!' ঢুকতে ঢুকতে বললাম।

'এত দেরি করলে, ফ্র্যাঙ্কি, কোথায় ছিলে,' আমার মামী বললেন। 'জলদি হাতমুখ ধুয়ে নাও। তোমাকে ছাড়াই আমরা বসে যাচ্ছিলাম।'

মামীর কণ্ঠে উদ্বেগের সুর। তাঁর দিকে তাকালাম। চোখের কোণেও উদ্বেগের ছোঁয়া। 'তুমি তো জানই, মামী,' হেসে রসিকতার চেষ্টা করলাম: 'কখনই ঠিক সময়ে হাজির হতে পারি না।'

হেসে উঠল মেয়েরা। 'ও ঠিকই বলেছে, মমি,' ইজি বলল। 'কখনও সময়মত হাজির হতে পারে না।'

পারলারে গেলাম। জানালার কাছে ইজি চেয়ারটায় বসে আছেন মামা। মনে হলো শূন্যে তাকিয়ে আছেন, কেমন উত্তেজিত ভঙ্গিতে চেয়ারের হাতলে হাত দুটো রাখা। 'মামা, তুমি! এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে! আমি তো ভেবেছি আসইনি।'

'হ্যালে-া, ফ্র্যাঙ্কি,' হাসার চেষ্টা করলেন তিনি। হাসিটা ফুটল না। 'ক্লান্ত লাগছে।'

হাত ধুতে বাথরুমে ঢুকলাম। ওখান থেকেই বললাম: 'খেতে যাও। খাবার দেয়া হয়ে গেছে।'

কোনমতে তাঁর জবাবটা শুনলাম, এতই আস্তে বললেন: 'আমার খিদে নেই।'

কিছু একটা ঘটেছে, মনে হলো আমার। বাতাসে উত্তেজনা টের পাচ্ছি। কারণটা কী? আমি কি কোন ভুল করলাম? তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে রান্নঘরে গেলাম খাওয়ার জন্য। চুপচাপ খাওয়া শেষ করলাম আমরা। মামা এলেন না। বাসনপেয়ালা ধুতে ইজিকে সাহায্য করলাম আমি। ও ধুয়ে দিচ্ছে, আমি মুছে মুছে রাখছি। তারপর রেডিও শুনতে গেলাম আমরা। আটটা বাজলে শুতে গেল বাচ্চারা। সাড়ে ন'টায় আমি বললাম, আমিও যাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছিল, মামা-মামী কথা বলতে চাচ্ছেন, আমি তার মধ্যে বাধা হয়ে আছি। নীরব, বিষণ্ন একটা সন্ধ্যা। এমনিতে মামা-মামী খুব হাসিখুশি থাকেন, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন। কিন্তু আজ ওঁরা নীরব হয়ে আছেন। বাচ্চারা শুতে যাবার আগে যখন চুমু খেল, গাল পেতে দিলেন দুজনেই, কিন্তু নিজেরা ওদেরকে চুমু খেলেন না। আমার ঘরে ঢুকে কাপড় খুলতে শুরু করলাম। বন্ধ দরজার ভিতর দিয়েই নিচু স্বরে মামা-মামীকে কথা বলতে শুনলাম। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথা রাখলাম দুই হাতের তালুতে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। দীর্ঘ একটা ক্লান্তিকর দিন গেছে আমার জন্য। অদ্ভুত এক বিষণ্নতার মাঝে যেন তন্দ্রা নামল আমার চোখে। হঠাৎ চমকে জেগে গেলাম। আমার দরজার ঠিক বাইরে বারান্দায় কথা বলছেন

মামা-মামী। ড্রেসারের ওপর রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালাম; রেডিয়াম ডায়ালে দেখা যাচ্ছে প্রায় দুটো বাজে। কান পেতে শুনছি।

মামী কাঁদছেন। মামা বলছেন: 'এত দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ডাক্তার কী বলেছেন শুনেছ। অ্যারিজোনায় গিয়ে বছর দুই কাটালেই আমি সুস্থ হয়ে যাব। আমার ভাগ্য ভাল শুরুতেই ধরা পড়েছে। ডাক্তার বলেছেন এখনও পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য, শুনলেই তো।'

বাচ্চাদের কথা কিছু বললেন মামী। আমার নামটা বলতে শুনলাম। তবে কী বললেন, বুঝতে পারলাম না। মনে হলো আমার বয়েস এখনও ষোলো হয়নি, সেটাই যেন বলছেন।

'ওসব নিয়েও ভেবো না,' মামা বললেন। 'যেখানে যাচ্ছি সেখানেও ভাল স্কুল আছে। ফ্র্যাঙ্কিও আমাদের সঙ্গে যাবে। ষোলো হতে আর মাত্র চার মাস বাকি আছে ওর, ওদেরকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে। আমি শিওর, ওরা বুঝবে।'

আরও কিছু বলতে শুনলাম মামীকে। তারপর ওঁদের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে এল। ভাবতে লাগলাম, অ্যারিজোনায় কেন যাবেন ওঁরা, আর আমার ষোলো বছর হওয়া না হওয়াটাই বা এমন কী ব্যাপার। আবার ঘুমিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কথাটা যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল আমাকে। বিছানায় উঠে বসলাম। যক্ষ্মার কথা বলেছেন মামা! সারাটা শীতকাল ধরে কেশেছেন সেকারণেই। আমি ভেবেছিলাম ঠাণ্ডা লেগেছিল। আসলে যক্ষ্মা হয়েছে তাঁর!

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে বাথরোব পরে নিলাম। বেরিয়ে এলাম বারান্দায়। ওঁদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে টোকা দেয়ার আগে সামান্য দ্বিধা করলাম। তারপর বললাম: 'আমি! ভিতরে আসব?'

'এসো,' মামা ডাকলেন। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। 'এতরাতে?' মামা জিজ্ঞেস করলেন।

'তোমাদের কথা আমি শুনে ফেলেছি,' বললাম। 'কী হয়েছে, মামা?'

পরস্পরের দিকে তাকালেন মামা-মামী। মামা বললেন: 'আমরা এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবছি, আর কিছু না।'

'জানি। অ্যারিজোনায়। কিন্তু কেন?'

এ কথার জবাব দিলেন না তাঁরা।

'যাচ্ছো, তাঁর কারণ তুমি অসুস্থ,' মামাকে বললাম।

আমার দিকে তাকালেন তিনি। 'এটাও শুনেছ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি। তবে তোমার কী হয়েছে, সেটা আমি অনুমানে বুঝেছি। আমি এখন আর ছোট নই, মামা।'

'হুঁ, তারমানে তুমি বুঝে ফেলেছ।'

'মামা,' এগিয়ে গিয়ে বিছানায় বসলাম। 'ব্রডওয়ের ব্যাংকে আমার একটা অ্যাকাউন্ট আছে। তাতে কিছু টাকা আছে আমার। তোমার দরকার হলে বোলো।'

মামা হাসলেন। 'না, লাগবে না। টাকা আমরা জোগাড় করে ফেলেছি। তোমার টাকা তোমার কাছেই থাক।'

'কিন্তু কত টাকা তুমি জানো না। কাজে লাগবে তোমার, সত্যি বলছি। পনেরোশো ডলার।'

অবাক হলেন মামা। 'পনেরোশো! অনেক টাকা তো! এত টাকা কোথায় পেলে?'

'কাজ করে,' উঠে দাঁড়ালাম। 'সময় হোক, সব বলব তোমাকে। তবে টাকাটা তুমি নিয়ো। যখন দরকার হবে, বোলো।'

'না, বাবা, লাগবে না,' কোমলকণ্ঠে মামা বললেন। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, মামী আমাকে কাছে ডাকলেন। 'এসো। আমাকে চুমু খেয়ে গুড নাইট বলে যাও।'

কাছে গিয়ে নিচু হয়ে মামীর গালে চুমু খেলাম। 'তুই একটা লক্ষ্মী ছেলে,' আদর করে হেসে বললেন মামী। 'যা, গিয়ে শুয়ে পড়। কোন চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানায় শুলাম। আমার ষোলো বছর বয়েস নিয়ে কী আলোচনা করছিলেন ওরা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করার কথা ভাবলাম একবার। তারপর মনে হলো, না থাক, আর গিয়ে বিরক্ত করে লাভ নেই, সকালেই জিজ্ঞেস করব। তবে টাকাপয়সার কোন ব্যাপার হলে নির্দ্বিধায় ওঁদের দিয়ে দেব। দিয়ে খুশি হব। ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

বারো

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেল আমার। প্রায় ছুটে বেরোলাম বাড়ি থেকে। ক্লাসে যখন ঢুকলাম, ঘণ্টা পড়ে গেছে। স্টাডি পিরিয়ডে জেরির সঙ্গে দেখা। কয়েক মিনিট কথা বলে সরে এলাম। লাঞ্চটাইমে দেখা রুথের সঙ্গে। ওর কাছাকাছি বসলাম।

'কেমন আছো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ভাল। তবে প্রচুর খাটাখাটনি যাচ্ছে। এই টার্মেই আমি গ্র্যাজুয়েশন নেব, জানই তো।'

'জানি।'

'থাকো কোথায় আজকাল? অনেক দিন মার্টিনর সঙ্গেও দেখা করতে আসো না। ঝগড়া করেছে নাকি?'

'না। তবে কাজে ব্যস্ত আমরা, একেকজন একেকভাবে।'

'বাড়িতে এসো একদিন। আব্বা-আম্মা খুশি হবে।' ও চলে গেল।

লাঞ্চরুমের চারপাশে তাকালাম। কেন যেন স্কুলটা আজ অন্যরকম লাগছে আমার কাছে। হয়তো আর বেশিদিন থাকব না এখানে, অ্যারিজোনায় চলে যেতে হবে, তাই।

বাস্কেটবল প্র্যাকটিস শেষ করেই সেদিন বাড়ি ফিরে চললাম। বাচ্চারা খেলতে বেরোচ্ছে। পারলারে বসে পত্রিকা পড়ছেন মামী। আমি বসতে মুখ তুলে তাকালেন। 'আজকে এই এখন পত্রিকায় চোখ বোলানোর সুযোগ পেলাম,' তিনি বললেন।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। তিনি যা বললেন সেটা নিয়ে সামান্যমত মাথা না ঘামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: 'মামী, কখন যাচ্ছি আমরা?'

'জানি না,' জবাব দিলেন তিনি। 'কিছু কাজকর্ম আছে আমাদের। এই বাড়ি বিক্রি করে দেবেন তোমার মামা। অ্যারিজোনায় থাকার জন্যে একটা জায়গা লাগবে আমাদের, তোমার আর বাচ্চাদের নতুন স্কুলের ব্যবস্থা করতে হবে। খুব হিসেব করে টাকা খরচ করতে হবে এখন।'

'আমি কাজ করতে পারি।'

'আমার মনে হয় না তার দরকার হবে। আমি চাই স্কুল শেষ করে তুমি কলেজে যাও। ভবিষ্যতে কি করবে এ নিয়ে কখনও ভেবেছে?'

'না।'

'আমি ভেবেছি। তুমি ডাক্তার হতে পারো, উকিল হতে পারো। তাতে তোমারও ভাল হবে, আমরাও খুশি হব।'

'কী জানি। তবে ভাবার তো এখনও অনেক সময় আছে। আমাকে সত্যি কথাটা বলো, মামী। ডাক্তার কী বলেছেন?'

'ভাগ্যটা আমাদের ভালই বলতে পারো। তোমার মামার যক্ষ্মা হয়েছে, তবে খুব

প্রথম দিকে ধরা পড়েছে। ডাক্তার বলেছেন, সাবধানে চললে ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাহলে তো ভালই। কিন্তু মামী, আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।'

তিনি হাসলেন। 'কাল শোনার পর আমারও খুব খারাপ লেগেছিল, দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, আজ অনেকটা ভাল লাগছে।'

'আমি জানি। তুমি আর মামা কথা বলছিলে, শুনেছি।'

আবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন মামী। 'খুব কম কথাই তোমার শোনার বাকি থাকে, তাই না, ফ্র্যাঙ্কি?'

জবাবে আমিও হাসলাম।

'তুমি একটা আজব ছেলে। বয়েসের তুলনায় অনেক বড় লাগে তোমাকে, অথচ বাচ্চা বাচ্চা ভাবটা ঠিকই আছে। তোমাকে আমি পছন্দ করি।'

তাঁর চেয়ারের কাছে গিয়ে দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বললাম: 'আমিও তোমাকে পছন্দ করি।'

আদর করে আমার গাল চাপড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: 'দুধ খাবে এক গ-াস? বাড়ন্ত বয়েস তোমার, খাবার খুব দরকার।'

'সঙ্গে কয়েকটা কুকিসও দেবেন।'

এই সময় মামা এলেন। উঠে গিয়ে তাঁর গালে চুমু খেলেন মামী। 'সব ঠিক আছে তো, মরিস?'

'আছে,' আমাকে হ্যালে-া বললেন মামা। 'জায়গাটার জন্যে আমাকে পনেরো হাজার দেবে ওরা। ভাল দাম। বেশ কিছুদিন চলতে পারব আমরা। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার বুরোতে গিয়েছিলাম কর্তৃপক্ষকে জানাতে আমরা স্টেট ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ওরা জানতে চাইল, কেন। বললাম। ওরা বলল, ফ্র্যাঙ্কিকে আমরা নিতে পারব না।'

কথাটা শুনে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। 'কেন?'

আমার দিকে ফিরলেন মামা। 'এতিমখানার কিছু নিয়মকানুন আছে। কেউ যদি কোনও এতিমকে পোষ্য করে নিয়ে যায়, আর সেই অভিভাবকের যদি মারাত্মক ছোঁয়াচে কোনও রোগ হয়, তাহলে সেই এতিম আপনাআপনি আবার এতিমখানার সদস্য হয়ে যায়। তোমাকে হয়তো আবার কিছুদিনের জন্যে এতিমখানায় ফিরে যেতে হবে। তবে এত সহজে ছাড়ছি না আমি। আমার উকিলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি আশা দিয়েছেন, সব ঠিক করে দিতে পারবেন।'

'এত ঝামেলার দরকার নেই। আমি আবার এতিমখানায়ই ফিরে যাব,' আমি বললাম।

'না, তুমি যাবে না, ফ্র্যাঙ্কি,' মামা বললেন। 'আমি তোমাকে যেতে দেব না।'

এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। আমাদের বাড়ির খুব ব্যস্ত একটা সপ্তাহ। অ্যারিজোনায় টুসনের কাছে থাকব আমরা। বাঁধাছাদায় ভীষণ ব্যস্ত আমার মামী। আর দুই সপ্তাহের মধ্যেই রওনা হব আমরা। সেটা ছিল শনিবারের বিকেল। আমি ওকে কাজকর্মে সাহায্য

করলাম। মে মাস। সবাই আমরা উত্তেজিত। বাচ্চাদের মুখে যেন যাওয়া ছাড়া আর কোন কথা নেই।

দুটোর দিকে বাড়ি এলেন মামা। ক্লান্ত। লিভিং রুমে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। চা করে দিয়ে এলেন মামী। আমি রান্নাঘরে কয়েকটা বাসন কাগজে মুড়ে পিপায় ভরছি। আমাকে ডাকলেন তিনি। গেলাম।

আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন মামী। মামা আমাকে বললেন: 'বসো।' কাউচে বসলাম। মামী বসলেন আমার পাশে। আমার একটা হাত তুলে নিলেন নিজের হাতে।

'ফ্র্যাঙ্কি, কথাটা কীভাবে বলব তোমাকে বুঝতে পারছি না,' ধীরে ধীরে বললেন মামা। 'তবে আজ হোক কাল হোক তোমাকে তো বলতেই হবে, তাই আজই বলি। তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারছ না।'

কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মামী আমার হাতে চাপ দিয়ে চুপ করতে ইশারা করলেন। 'তোমার মামাকে কথা শেষ করতে দাও।' চুপ হয়ে গেলাম।

'শোনো,' মামা বললেন: 'আমার উকিল অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। আর আমাদের কিছুই করার নেই। এতিমখানার আইন সেটা ঠিকই হোক আর ভুলই হোক, ওটাকে আমরা অমান্য করতে পারব না। কর্তৃপক্ষের অনেকের সঙ্গে দেখা করেছি আমি, অনেক অনুরোধ করেছি, কিন্তু কেউ শুনল না। আমাকে বলে দিল, তোমার আঠারো বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে এতিমখানায়ই থাকতে হবে। তার পর তুমি আমাদের কাছে যেতে পারবে।'

গলার কাছে যেন একটা দলা আটকে গেল আমার। কেঁদে ফেলব যেন। আমার মনে হচ্ছিল মামা কিছু একটা ব্যবস্থা করে ফেলতেই পারবেন, আমি তাঁদের সঙ্গে যেতে পারব। জোর করে কান্না আটকালাম। কিছু বললাম না।

আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু, মোলায়েম স্বরে মামী বললেন: 'এক হিসেবে ভালই হলো, ফ্র্যাঙ্কি। এখানে থেকে তুমি স্কুল শেষ করতে পারবে। তোমার বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়তে হবে না। ব্রাদার বার্নহার্ডের সঙ্গে কথা বলেছেন তোমার মামা–ব্রাদার তোমাকে ভীষণ পছন্দ করেন–তোমার প্রতি তিনি বিশেষ নজর রাখবেন কথা দিয়েছেন তোমার মামাকে। কিছুদিনের মধ্যেই স্কুলের পড়া শেষ হয়ে যাবে তোমার। তখন তুমি আমাদের কাছে চলে আসতে পারবে। ওখানে কলেজে পড়বে। ভাল ভাল ইউনিভার্সিটি আছে ওখানে। তুমি যখন এখানে থাকবে, আমরা ওখানে থেকে মনকে বোঝাব তোমাকে পড়ার জন্যে বাইরে পাঠিয়েছি, শীঘ্রি ফিরে এসে কলেজে পড়বে আর আমাদের সঙ্গে থাকবে।'

'কিন্তু ওসব ভান-ভণিতা আমার ভাল লাগবে না,' ভোঁতা স্বরে বললাম। 'আমার বন্ধুদের নিয়েও ভাবি না। আমি ওদের মিস করব না। আমি মিস করব তোমাদেরকে, আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই, তোমাদের সঙ্গে থাকতে চাই।'

'আমিও তো তোমাকে নিতে চাই,' কান্না জড়ানো গলায় বললেন মামী। 'কতটা চাই, সে-তুমি বুঝবে না। তোমাকে ভীষণ পছন্দ করি আমরা, সাংঘাতিক ভালবাসি।

কিন্তু কিছুই করার নেই আমাদের। আইন যা আছে, মানতেই হবে। আর কোনও উপায় নেই।'

মামা-মামী দুজনের দিকেই তাকালাম। তপ্ত অশ্রু ঠেলে উঠে আসছে আমার চোখে। কথা বলার চেষ্টা করেও পারলাম না। ওঁদের দিকে জলভরা চোখে তাকিয়ে আছি। গরম পানি চোখ থেকে বেরিয়ে গাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে আমার। আমার দিকে তাকিয়ে আছেন দুজনে। নীরব। কোন কথা বলতে পারছেন না। আমার মামীর চোখেও পানি। উঠে দৌড়ে এসে ঢুকলাম আমার ঘরে। ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিছানায়।

দরজার বাইরে মামা-মামীর পায়ের শব্দ শুনলাম। মামী বললেন মামাকে: 'ওকে বোঝানো দরকার। ওর চোখের তাকানো দেখেছ, চেহারার ভাব দেখেছ? যেন বাচ্চা একটা ছেলে ও, ঘরে তালা দিয়ে রেখে আমরা চিরকালের জন্যে চলে যাচ্ছি।'

'না,' মামা বললেন: 'বুঝিয়ে লাভ হবে না। ওকে ওর মত থাকতে দাও। নিজে নিজে সামলে নিক। ওর ক্ষমতা আছে, আমি জানি, সত্যিকারের একজন পুরুষ মানুষ।' চলে গেলেন ওঁরা।

মামার কথাটা ভেবে দেখলাম আমি। 'সত্যিকারের পুরুষ মানুষ'। হ্যাঁ, তাই তো। তবে বাচ্চা ছেলের মত যে আচরণ করছি, তা-ও ঠিক। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম। কান্না থামিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুলাম। তারপর রান্নাঘরে এলাম।

টেবিলে বসে আছেন মামা-মামী। আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন দুজনে। 'এখন কিছুটা ভাল লাগছে?' মামা জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝালাম 'হ্যাঁ'। কথা বলতে ভয় পাচ্ছি। নিজের কণ্ঠস্বরকে বিশ্বাস করতে পারছি না এখনও।

'বোসো। এক কাপ চা খাও,' মামী বললেন।

চা নিলাম। আমার খুব খারাপ লাগছে। এতিমখানায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

অ্যারিজোনায় চলে যাচ্ছি আমরা–এ কথাটা যে কাউকে জানাইনি ভেবে স্বস্তি পেলাম। এতিমখানায় ফিরে যাবার কথাও কাউকে বলব না ঠিক করলাম। কেউ আমার জন্য আহা-উহু করে দুঃখ প্রকাশ করুক, এটা ভাল লাগবে না আমার।

তেরো

সেটা ছিল শুক্রবার, মে ১৩, ১৯২৭ সাল। আমার জিনিসপত্র সব বাঁধাছাঁদা শেষ। মামা আমাকে এতিমখানায় নিয়ে যাবেন। পরদিন চলে যাবেন তাঁরা। না যাওয়া পর্যন্ত আমি এতিমখানায় থাকব না, শুধু মালপত্রগুলো রেখে আসতে যাব।

'হয়েছে?' ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মামা।

'হ্যাঁ,' জানালাম। আমার ব্যাগ তুলে নিয়ে নীচে গাড়িতে রাখলাম। শহরতলীর দিকে যাওয়ার সময় কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম আমরা।

'আমি কল্পনাই করিনি এমন কিছু ঘটবে,' অবশেষে মামা বললেন এমন ভঙ্গিতে যেন দোষটা তাঁর, আমার কাছে মাপ চাইছেন।

জবাব দিলাম না। আসলে কী বলব বুঝতে পারছি না। এতিমখানায় পৌঁছে আমার ব্যাগটা গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলাম। মামার সঙ্গে ঢুকলাম ব্রাদার বার্নহার্ডের অফিসে। প্রথমে মামার সঙ্গে হাত মেলালেন ব্রাদার, তারপর আমার সঙ্গে।

হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করছেন তিনি। 'ভালই হলো, ফ্র্যাঙ্কি, আবার পুরানো জায়গায় ফিরে এলে। তোমার মালপত্র নিয়ে গিয়ে রেখে আসা যাক।'

আমার পুরানো ঘরটায় ঢুকলাম। আমার পুরানো বিছানার ওপর ব্যাগটা রেখে খুললাম। কয়েকটা ছেলে এসে কৌতূহলী হয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলে গেল। ওদের আমি চিনি না। হয়তো নতুন এসেছে। আরেকটা পরিচিত ছেলে ঢুকল, জনি ইগান। বিছানার কাছে এল। আমি যতটা দেখে গেছি তারচেয়ে অনেক লম্বা হয়েছে ও। প্রায় আমার সমান হয়ে গেছে।

'হ্যালে-া, ফ্র্যাঙ্কি,' ও বলল: 'ফিরে এলে?'

'হ্যাঁ,' বললাম।

ও আর কিছু না বলে কয়েকটা মুহূর্ত চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বেরিয়ে গেল।

ড্রেসারের ড্রয়ার খুলে সুটকেস থেকে জিনিসপত্র বের করে সেখানে রাখলাম। কোট ঝোলালাম আলমারিতে। জুতোও রাখলাম তাতে। কয়েক মিনিটেই কাজ শেষ হয়ে গেল আমার। তারপর সুটকেস বন্ধ করে মামাকে বললাম: 'এটা বাড়ি নিয়ে যাই।'

'না,' তিনি বললেন: 'এটা এখানেই থাক। আমাদের কাছে যখন যাবে, তখন এটার দরকার হবে।'

নীচতলায় চললাম ব্রাদার বার্নহার্ডের অফিসে। মামাকে কয়েকটা কাগজপত্র সই করতে হবে। কাজ শেষ করে ব্রাদারের সঙ্গে হাত মেলালেন তিনি।

'ফ্র্যাঙ্কিকে নিয়ে চিন্তা করবেন না, মিস্টার কেইন,' ব্রাদার বার্নহার্ড বললেন। 'আমি ওর খেয়াল রাখব

'আমি জানি আপনি রাখবেন,' মামা বললেন। 'কাল বিকেলে চলে আসবে ফ্র্যাঙ্কি। আমাদেরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে সোজা চলে আসবে এখানে।'

'ক'টা সময়?' ব্রাদার বার্নহার্ড জানতে চাইলেন।

'তিনটা,' মামা বললেন। 'একটা সময় যাব আমরা।'

'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব। দোয়া করি আপনি শীঘ্রি ভাল হয়ে উঠুন।'

আবার হাত মেলালেন তিনি।

'কাল বিকেলে দেখা হবে, ফ্র্যাঙ্কি,' ব্রাদার বললেন আমাকে।

'আচ্ছা, সার,' জবাব দিলাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। সিঁড়ি বেয়ে নেমে জিমনেশিয়ামের ভিতর দিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। জিমনেশিয়ামে কয়েকটা ছেলেকে বাস্কেটবল খেলতে দেখলাম। সামান্যতম বদলায়নি পুরানো এই জায়গাটা।

বাড়ি ফিরে এলাম চুপচাপ।

মামার বাড়িতে সবচেয়ে বিষণ্ন সন্ধ্যা কাটল আমাদের সেদিন। তাড়াতাড়ি বিছানায় গেলাম যাতে সকাল সকাল উঠতে পারি।

সকালবেলা মালপত্র বহনের গাড়ি ও লোক এল। সাড়ে দশটা নাগাদ অ্যাপার্টমেন্ট খালি করে ফেলল। তারপর আমরা নীচে গেলাম নাস্তা খেতে। মামাদের সঙ্গে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে এলাম। বারোটার সামান্য আগে ট্রেন এল। মালপত্র ট্রেনে তোলা হলো। মনে হলো যেন মাত্র কয়েকটা মিনিট পেরিয়েছে, তারপরই আমার ট্রেন থেকে নামার সময় হয়ে গেল।

আমার মামাত বোনদের গালে চুমু খেয়ে গুড-বাই জানালাম। দুজনের হাতে দুই বাক্স ক্যান্ডি দিলাম, ওদের জন্যই কিনে রেখেছিলাম।

'তোমার জন্যে আমার খুব কষ্ট হবে, ফ্র্যাঙ্কি,' আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল বড় বোনটা, আইরিন।

'আমারও হবে,' ওর চুলে হাত চালিয়ে আদর করে দিলাম। তারপর ফিরলাম মামার দিকে। হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। হাত মেলাতে মেলাতে বললাম: 'গুড-বাই, মামা। আশা করি খুব তাড়াতাড়িই সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি।'

মামা হাসলেন। 'সো লং, ফ্র্যাঙ্কি। ভাল ছেলে হয়ে থেকো। দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।'

এরপর মামীর বিদায় জানানোর পালা। আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন: 'তুই আমাদের সঙ্গে আসতে পারলে খুব খুশি হতাম, ফ্র্যাঙ্কি।'

'আমিও হতাম।' ভীষণ কান্না পাচ্ছে আমার। কিন্তু কাঁদলাম না, তাতে আরও বেশি দুঃখ পাবে ওরা। 'আমার জন্যে অনেক করেছ তোমরা, ধন্যবাদ।'

'না না, ফ্র্যাঙ্কি!' আবার আমাকে চুমু খেলেন মামী। 'ধন্যবাদ দিসনে আমাদের। কিছুই করতে পারিনি আমরা। তোকে আমি ভীষণ ভালবাসি। তোর জন্যে প্রচণ্ড কষ্ট হবে আমার।'

জবাব খুঁজে পেলাম না। এই সময় পোর্টার আমার কাঁধে আলতো টোকা দিয়ে বলল: 'এবার নামতে হবে তোমাকে। যে কোন সময় ট্রেন ছেড়ে দেবে।'

ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম। মামী আমাকে ছেড়ে দিলেন। ওদের সবার দিকে তাকিয়ে বললাম: 'যাই তাহলে।' চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলাম না। ওরা যাতে না দেখে সেজন্য তাড়াতাড়ি নেমে এলাম ট্রেন থেকে।

প-্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওদের দিকে হাত নাড়লাম। জানালার কাঁচে কপাল ঠেকিয়ে আমাকে দেখছে আমার মামাত বোনেরা। মামা আমাকে কিছু বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বদ্ধ জানালার জন্য কথাটা কানে এল না আমার। ট্রেন ছেড়ে দিল। জানালার কাঁচ তুলে দিলেন মামা। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে থাকলাম আমি।

'ভেবো না, ফ্র্যাঙ্কি,' মামা বললেন: 'দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।'

ট্রেনের গতি বাড়ছে, আমি দৌড়ের গতি বাড়াচ্ছি। জানালা দিয়ে হাত বের করে নাড়ছে ওরা, জোরে চিৎকার করে বলছে: গুড-বাই! গুড-বাই! হাঁপাচ্ছি আমি। দম আটকে আসছে। প-্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। দাঁড়িয়ে গেলাম। এত নিঃসঙ্গ জীবনে বোধ করিনি।

প-্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলাম উজ্জ্বল সূর্যালোকে। ধীরে ধীরে হেঁটে চললাম শহরের ভিতর দিয়ে। এতিমখানায় পৌঁছুলাম। ঢোকার আগে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে দেখলাম খানিকক্ষণ।

ধূসর, বিষণ্ন, পুরানো একটা বিল্ডিং, পাশে স্কুল, এককোণে গির্জা, রাস্তার ওপারে হাসপাতাল। মনে পড়ল খাবারের জন্য ঘন্টা বাজবে। একসঙ্গে খেতে বসবে সমস্ত এতিমরা। খাওয়ার আগে দোয়া করা, একঘেয়ে ধর্মোপদেশ শোনা! উফ্! আমি জায়গাটাকে ঘৃণা করি। আমি আর ফিরে যেতে পারব না ওখানে। পারব না।

ঘড়ি দেখলাম। দুটো বাজে। দৌড়ে চলে এলাম ব্যাংকে। পকেট থেকে ব্যাংকের চেক বই বের করলাম। দুশো ডলার তুলে নিলাম।

সাবওয়ে ধরে ফিরে এলাম গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে। পরের ট্রেনটা ধরেই টুসনে চলে যাব আমি। টিকেট কাউন্টারের দিকে এগোতে এগোতে ভাবছি, আমাকে ওখানে কেউ খোঁজার কথা কল্পনাতেও আনবে না। আমি পালাচ্ছি। চোখ তুলে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল: বাল্টিমোর অ্যান্ড ওহাইয়ো রেলরোড। গোলমুখো একজন নিগ্রো পোর্টারের মস্ত একটা ছবি হাসিমুখে তাকিয়ে আছে লেখাটার একপাশে। ট্রেনের লিস্ট দেখলাম। তিনটা দশ মিনিটে একটা ট্রেন আছে, বাল্টিমোরে যাবে।

'আমাকে একটা বাল্টিমোরের টিকেট দিন,' কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে টিকিট বিক্রেতা লোকটাকে বললাম।

তৃতীয় পর্ব

এক

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে কেমন আজব মনে হলো ঘরটাকে। আধো জাগরণের মধ্য দিয়ে অলস ভঙ্গিতে তাকালাম ছাতের দিকে। ধীরে ধীরে চারপাশে চোখ বোলাতে বোলাতে মনে পড়ল কোথায় রয়েছি আমি: বাল্টিমোরে। পালানোর ইচ্ছে ছিল না আমার। ফিরে যাওয়ার কথা ভাবলাম। পুরোপুরি জেগে গেছি এতক্ষণে। বিছানা থেকে নামলাম। কোণের ছোট্ট বেসিনে হাত ধুতে ধুতে ভাবলাম নিউ ইয়র্কে ওরা এখন কী করছে। আমাকে ফিরতে না দেখে নিশ্চয় আমার আত্মীয়দের টেলিগ্রাম করেছেন ব্রাদার বার্নহার্ড। তাঁদের জবাব পাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেবেন। রেলস্টেশনে খোঁজ করতে গিয়ে আগে হোক পরে হোক পুলিশ জানতে পারবেই আমি বাল্টিমোরের টিকেট কিনেছি। খুব বেশিদিন ওদের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে থাকতে পারব যদি ভাবি তো বোকার স্বর্গে বাস করা হবে। সবচেয়ে ভাল হয় এখনই এই হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে শহরের লোকারণ্যে হারিয়ে যাওয়া।

পোশাক পরা শেষ করে, শেষবারের মত ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নীচে নেমে এলাম। ডেস্কে এসে ক্লার্ককে ঘরের চাবি দিয়ে বললাম আমি রুম ছেড়ে দিচ্ছি। কিছু বলল না ও, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে পিছনের টেবিলে চাবিটা ছুঁড়ে ফেলে আবার কাগজ পড়ায় মন দিল। লবির সিগার স্ট্যান্ড থেকে একটা পত্রিকা কিনে বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটু দূরে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে কমলার রস, ডিম ও কফির অর্ডার দিলাম, পঁচিশ সেন্টেই খাওয়া হয়ে যাবে। খবরের কাগজটা খুলে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখতে লাগলাম। আমার বয়েসীদের জন্য কিছু চাকরির বিজ্ঞাপন আছে: অফিসের পিয়ন, দোকান-সহকারী, এই ধরনের কাজ। খেতে খেতে পেন্সিল দিয়ে বিজ্ঞাপনগুলোতে দাগ দিলাম।

লাঞ্চের সময় পর্যন্ত ঘুরে বেরিয়েও একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলাম না। ইতিমধ্যে দু'একবার পথ হারিয়েছি, পথচারীকে জিজ্ঞেস করলে গম্ভীর মুখে দেখিয়ে দিয়েছে কোনদিকে যেতে হবে। নিউ ইয়র্কের মত নয় এখানকার মানুষ, যেখানে কাউকে রাস্তা জিজ্ঞেস করলে কোনরকম দ্বিধা না করে দেখিয়ে দেয় ঠিকই, কিন্তু কোথায় যেন মানুষগুলোর মনে একধরনের কুটিলতা কিংবা তাচ্ছিল্য কাজ করে।

ঘুরতে ঘুরতে ভাবলাম সবার আগে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই জোগাড় করতে হবে। আবার পত্রিকা খুলে 'ঘর ভাড়া'র বিজ্ঞাপনগুলো দেখলাম। সবগুলোর ঠিকানা মোটামুটি একই জায়গায়। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে লাঞ্চ সারলাম। ওখানেই জিজ্ঞেস করে কোনদিকে যেতে হবে জেনে নিলাম। খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম। চলে এলাম স্ট্যাফোর্ড স্ট্রিটে। শহরের মাঝামাঝি জায়গার একটা পুরানো অংশ এটা। ধূসর ও বাদামী পাথরে তৈরি বাড়িগুলো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তা ঘেঁষে, প্রায় প্রতিটি

বাড়ির জানালাতেই ছোট ছোট সাইনবোর্ড টানানো রয়েছে, কোনটাতে লেখা 'ঘর খালি আছে', কোনটাতে 'ঘর ভাড়া হবে'। নোংরা বাড়িগুলোর সামনে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সবচেয়ে পরিষ্কার যেটা মনে হলো আমার কাছে সেটার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল বাজালাম। জবাব নেই। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে আবার বাজালাম। এবারও জবাব নেই। বারন্দা থেকে নেমে আসার জন্য সিঁড়ির দিকে ঘুরতে যাব এই সময় ভিতর থেকে কানে এল পায়ের শব্দ। দরজা খুলে গেল। ঘুরে তাকালাম। দাঁড়িয়ে আছে একজন বৃদ্ধা। অদ্ভুত রঙের ফিতে দিয়ে বাঁধা মহিলার চুল।

'দুপুরবেলা মানুষের ঘুম ভাঙানোর অর্থটা কী?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল মহিলা। কাঁপা কাঁপা, কর্কশ, রুক্ষ কণ্ঠস্বর।

'সাইনবোর্ড দেখলাম, ম্যা'ম,' হাত তুলে জানালার দিকে দেখালাম। 'ঘর ভাড়ার।'

'আমাকে ম্যা'ম বলবে না,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মহিলার কণ্ঠ; তারপর জানালার দিকে তাকিয়ে বলল: 'ও, ওটা!'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'ঘরটা কি আছে?'

'না, গতকাল ভাড়া হয়ে গেছে। জানালা থেকে বোর্ডটা নামাতে ভুলে গেছি।'

'ও! বিরক্ত করলাম, সরি।' সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালাম আবার। অর্ধেক যেতেই ডাক শোনা গেল পিছন থেকে।

'দাঁড়াও, ইয়াং ম্যান,' মহিলা বলল: 'এদিকে এসো।'

ফিরে এলাম। 'বলুন, ম্যা'ম।'

'বললাম না আমাকে ম্যা'ম ডাকবে না; আমি পছন্দ করি না,' মহিলা বলল।

'সরি।'

ভাল করে আমাকে দেখল মহিলা। 'এই শহরে তুমি নতুন, তাই না?'

হতাশ হলাম। দেখেই যদি কেউ এত সহজে বলে দিতে পারে আমি এখানে নতুন, কীভাবে লুকিয়ে থাকব? জবাব দিলাম: 'হ্যাঁ। কিন্তু তাতে আপনার কী?'

'কিছু না। কোনখান থেকে এলে, নিউ ইয়র্ক?'

'সেটা জানার দরকার নেই আপনার!' মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার। 'আমি ঘর ভাড়ার জন্যে এসেছিলাম। পুলিশের জেরা শুনতে হবে ভাবিনি। চললাম।' ঘুরে দাঁড়ালাম আবার।

'এক মিনিট,' মহিলা বলল। 'আমি এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম। শোনো, তোমার ঘর দরকার না? ভিতরে এসো। দেখি, কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

দরজা দিয়ে ঢুকে মহিলার পিছন পিছন ভিতর-বারান্দা ধরে এগোলাম। বারান্দার ডানপাশে দুই পাল-ার মস্ত একটা দরজা। ঠেলা দিয়ে দরজা খুলল মহিলা। বিশাল একটা ঘরে ঢুকলাম তার সঙ্গে। অনেকগুলো কাউচ আর চেয়ার রয়েছে ঘরে। এককোণে একটা বড় আকারের বেবি গ্র্যান্ড পিয়ানো। পিয়ানোর ওপর কয়েকটা খালি হুইস্কির বোতল পড়ে আছে। সারা ঘরে সিগারেটের গোড়া ছড়ানো; অ্যাশট্রেতেও আছে, ঘরের প্রান্তের পুরানো ধাঁচের ফায়ারপে-সের সামনের মেঝেতেও আছে। সিগারেটের ধোঁয়া ও

হুইস্কির বাসি গন্ধ বাতাসে, সেই সঙ্গে মিশে আছে আরেক ধরনের গন্ধ, এতিমখানার জানালা খোলা থাকলে হাসপাতাল থেকে ভেসে আসত।

'উঁহ্, জঘন্য গন্ধ!' নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে গিয়ে একটা জানালা খুলে দিল মহিলা। জানালাটা ঘরের পিছন দিকে। পর্দা লাগানো। রাস্তার দিকে মুখ করা। তাজা বাতাস ঘরে ঢুকতে আরম্ভ করল।

'বসো, বসো,' একটা কাউচ দেখাল মহিলা। ছোট একটা কেবিনেট থেকে জিনের বোতল বের করে গ-াসে ঢেলে এক চুমুকে গিলে নিল চোখের একটা পলকও না ফেলে, এত সহজ ভঙ্গিতে যেন পানি খেল। ওখানেই দাঁড়িয়ে তাজা বাতাস টেনে নিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ছাড়ল: 'আহ্, গন্ধ গেছে! এখন অনেক ভাল।' পরনে কিমোনোর মত এক ধরনের পোশাক, ফিতেয় বাঁধা ধূসর চুলের ছোট্ট খোঁপা, জানালার আলোর পটভূমিতে কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে মহিলাকে। ধীরে ধীরে গালের রঙ ফিরতে শুরু করেছে। কিছু না বলে তাকিয়ে আছি আমি। হাসি পাচ্ছে। পুরো দৃশ্যটাই কেমন যেন।

একটা কাউচে বসে আমার দিকে তাকাল মহিলা। কয়েকটা মিনিট চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। অস্থির হয়ে উঠছি ক্রমেই।

'তোমার বয়েস কত?' এই সময় জিজ্ঞেস করল মহিলা। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে কণ্ঠ।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলাম। সেটা লক্ষ করল মহিলা। সরাসরি মিথ্যে বললাম: 'উনিশ।'

'হুঁম্! নিউ ইয়র্ক থেকে চলে এলে কেন?'

'আপনার জানার দরকার নেই, আগেই বলেছি আপনাকে! আমি এসেছিলাম ঘর ভাড়া নিতে।' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে গেলাম।

'এক মিনিট, এক মিনিট,' হাত নেড়ে আবার আমাকে বসতে ইশারা করল মহিলা। 'এত উত্তেজিত হবার তো কিছু নেই।'

'বেশ,' বসলাম আবার। ওই বুড়িটা কী চায় ঠিক বুঝতে পারছি না। জায়গাটাকে একটা পতিতালয় মনে হচ্ছে আমার কাছে। দুর্গন্ধ, সেই সঙ্গে বিশ্রী পরিবেশ। আমি এখানে থাকতে চাই না।

'কোন মেয়ের সঙ্গে গোলমাল পাকিয়েছিলে নাকি?' আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মহিলা।

মাথা নাড়লাম।

'পুলিশের তাড়া খেয়েছ?' মহিলার চোখের দৃষ্টির পরিবর্তন হলো না।

এটা একদিক থেকে সত্যি, ভাবলাম। ব্রাদার বার্নহার্ড অবশ্যই থানায় রিপোর্ট লেখাবেন। মহিলার প্রশ্নের জবাবে কাঁধ ঝাঁকালাম। কথা বললাম না।

'ও,' হাসি ফুটল মহিলার মুখে। নিজের অনুমান সঠিক হওয়ার আনন্দেই বোধহয়। 'জানতাম। তা বাল্টিমোরে কী করবে?'

'চাকরি করব,' জবাব দিলাম। 'এখানে না পেলে অন্য কোথাও দেখব।'

জোরে হেসে উঠল মহিলা। 'অন্য কোথাও?' হাসিটা আচমকা থামিয়ে দিয়ে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল: 'আমাকে ধমক দিয়ো না। তুমি জানো, কদ্দুর যেতে পারবে? তোমাকে ধরতে একটুও সময় লাগবে না ওদের, তারপর কখন যে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে গেছ আবার টেরও পাবে না।'

নীরবে তাকিয়ে রইলাম। উত্তেজনায় আমার সামনে দিয়ে পায়চারি শুরু করল মহিলা।

একটু পরে আবার বলল: 'অতিরিক্ত কথা বলার স্বভাব তোমার, তাই না?'

'আমি যা বলি সোজসুজিই বলি,' জবাব দিলাম। 'তবে আপনি একটু বেশিই বলে ফেলছেন।'

আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার বাহু ধরে পেশি পরীক্ষা করল মহিলা। মনে হলো কিছু বোঝার চেষ্টা করছে। পেশি শক্ত করে ফেললাম। 'শক্তি আছে,' মহিলা বলল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবার হেঁটে গেল কেবিনেটের কাছে। আবার গ-াসে মদ ঢেলে চোখের একটা পলকও না ফেলে গিলে নিল। বলল: 'তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হয়েছে তোমার চোখের কঠিন, কুটিল দৃষ্টি। তোমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারি আমি।'

'কী চাকরি?' জিজ্ঞেস করলাম। বেশ্যার দালালি করতে রাজি নই আমি।

'এখানে আমি কী ব্যবসা করি অনুমান করতে পারো?' হাত ঘুরিয়ে ঘরটা দেখাল মহিলা।

'হ্যাঁ।'

'হুঁ। আমার একটা লোক দরকার, পুরুষ মানুষ, খদ্দেররা শয়তানি করার চেষ্টা করলে যে শায়েস্তা করতে পারবে। খুব বেশি কিছু করতে হবে না তোমাকে। মাতালদের সামলানো কঠিন কিছু না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। ভাব দেখাবে, যেন সাংঘাতিক কিছু তুমি। তাতেই চলবে। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দোকানে যাবে। ওরা দেখে ভাববে, আরেকজন ঘর সামলানোর লোক জোগাড় করে নিয়েছি আমি। মুখ বন্ধ রাখবে। কোন কথাই বলবে না। সপ্তাহে তিরিশ ডলার বেতন দেব আমি তোমাকে। থাকা খাওয়া ফ্রি। কি বলো?'

'শুনতে তো ভালই লাগছে,' জবাব দিলাম। 'তবে কাজটা আমার লাইনে পড়ে না।'

'তোমার লাইনটা কী ছিল? ছিঁচকে চুরি? ডাকাতি? তাতে আখেরে লাভটা কী হতো। পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরতে।' কাছে এসে আমার দিকে ঝুঁকল মহিলা। নিঃশ্বাসে জিনের গন্ধ।

'বেশ্যার দালালি করতে পারব না কিন্তু,' আমি বললাম।

'ন, তা করতে হবে না,' মহিলা বলল। 'যে সে হুট করে ঢুকে পড়তে পারে না এখানে। সবাইকে ঢুকতে দিই না, বেছে বেছে ঢোকাই।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়ালাম। 'কখন থেকে শুরু করতে হবে?'

'এখন থেকে,' হাসল মহিলা। 'একটা কথা মনে রেখো, মেয়েদের দিকে নজর

দেয়া চলবে না। কখনও-সখনও ইচ্ছে হলে ওদের কাউকে বিছানায় নিতে পারবে না তা বলছি না, তবে প্রেমটেম করা চলবে না। আমি চাই না, মেয়েদের মধ্যে তোমাকে নিয়ে রেশারেশি শুরু হয়ে যাক।'

'বুঝলাম।'

আমার আরও কাছে এসে দাঁড়াল মহিলা। 'নিজের কাজ করে যাবে, অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবে না, পুলিশ তোমার ছায়াও খুঁজেও পাবে না।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'তাহলে চাকরিটা তোমার হয়ে গেল,' কেবিনেটের কাছে গিয়ে আরেকবার মদ গিলল মহিলা। ফিরে তাকাল আমার দিকে। 'তোমার নাম কী?'

'ফ্র্যাঙ্কি,' জবাব দিলাম। 'ফ্র্যাঙ্ক কেইন। আপনার?'

'সবার কাছেই আমি শুধু গ্র্যান্ডমা,' জবাব দিয়ে আবার গ-াসে মদ ঢালল মহিলা।

দুই

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল গ্র্যান্ডমা। তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে ডাকল: 'মেরি, মেরি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে এল আবার আমার কাছে। জিজ্ঞেস করল: 'তোমার মালপত্র কই?'

'কীসের মালপত্র?' প্রশ্ন করলাম।

'তারমানে খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিলে,' হেসে উঠল বৃদ্ধা। 'তোমার মত অল্পবয়েসীদের এটাই সমস্যা। খালি তাড়াহুড়া। কী লাগবে না লাগবে সেটা ভাবারও দরকার মনে করো না।'

জবাব দিলাম না।

'হুঁ, যা ভেবেছি!' হাসল বৃদ্ধা, খুব মজা পাচ্ছে যেন। 'তোমার চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম। তারমানে ধরেই নিতে পারি ঘর ভাড়া দেয়ার মতও টাকা নেই তোমার পকেটে।'

আমার পকেটের ১৮৫ ডলারের কথা ভেবে মনে মনে হাসলাম।

'বেশ,' বৃদ্ধা বলল: 'আজ বিকেলে তোমাকে নিয়ে বাজার করতে যাব। তোমার কাপড়-চোপড় লাগবে: একটা সুট, কাঁধের নীচে তুলোর পোঁটলা ভরে দিতে বলব–যাতে তোমার কাঁধটা বড় দেখায়–আর কিছু রঙিন শার্ট।' দরজার কাছে গিয়ে আবার মেরির নাম ধরে ডাক দিল। 'ওরা কিছু না করলে কিন্তু তুমি কিছু করতে যাবে না,' ফিরে এসে আমাকে বলল। 'আর হ্যাঁ, কাপড়ের দাম তোমার পয়লা সপ্তাহের বেতন থেকে কেটে নেব।'

বিশালদেহী কালো চামড়ার একটা মেয়ে ঘরে ঢুকল। বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল: 'ডাকছেন কেন?'

'আমার নাতি এইমাত্র নিউ ইয়র্ক থেকে এল,' আমাকে দেখিয়ে মেয়েটাকে বলল বৃদ্ধা। 'তিনতলার খালি ঘরটা দেখিয়ে দাও ওকে, ওখানেই থাকবে।'

সন্দিহান চোখে আমার দিকে তাকাল মেয়েটা। ও কী ভাবছে বুঝতে পেরে ধমকে উঠল বৃদ্ধা: 'কী হলো? কী বললাম শোননি–আমার নাতি! কেন, আমার কোন নাতি থাকতে পারে না? অন্য মেয়েমানুষদের মতই আমিও মেয়েমানুষ। আশপাশের সবার যদি ছেলেমেয়ে থাকতে পারে আমারও না থাকার কোন কারণ নেই।'

নাক সিঁটকাল মেয়েটা। 'ছয় বছর ধরে আপনার সঙ্গে আছি, মিসেস ম্যান্ডার। একবারও নাতির কথা বলতে শুনিনি।'

'সাধে কী আর নিগার বলে।' আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল বৃদ্ধা। 'এদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলেই লাই পেয়ে যায়।' আবার মেয়েটার দিকে ঘুরল ও। বিকট স্বরে চিৎকার করে উঠল: 'এই হতচ্ছাড়ী কালো চামড়ী কোথাকার! আমি বলেছি ও আমার নাতি। ওর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ, আমার সঙ্গে মিল আছে কিনা। ওর চোখের দিকে তাকা।

একেবারে আমার মত।'

আমার দিকে তাকাল কালো মেয়েটা। দ্বিধা করতে দেখলাম ওকে। বলল: 'ঠিক আছে, মিসেস ম্যান্ডার, আপনি যখন বলছেন।'

খুশি হয়ে নাক দিয়ে ঘোঁতঘোঁত করল বৃদ্ধা। 'আসলে তোকে পরীক্ষা করলাম। ও আমার কেউ না। আজ থেকে এখানে কাজ করবে, সবার কাছে ও আমার নাতি, বুঝলি।' আমার দিকে তাকিয়ে বলল: 'মেরিকে ধোঁকা দিতে পারনি। আমার সঙ্গে বহুদিন ধরে আছে। তোমাকে আমরা বোকা বানাতে পারব না, তাই না, মেরি?'

'না, মিসেস ম্যান্ডার,' হাসি ফুটেছে এখন মুখে।

'যাও, ওকে ওর ঘর দেখিয়ে দাও,' মিসেস ম্যান্ডার বলল। 'তারপর দোহাই লাগে তোমার, আমাকে কিছু নাস্তা এনে দাও। আর তারপর এই ঘরটাকে সাফ করো। কী দুর্গন্ধ!' দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। 'এই, ফ্র্যাঙ্কি, তুমি খেয়েছ?'

'হ্যাঁ, দাদু,' জবাব দিলাম।

'ঠিক আছে,' বৃদ্ধা বলল আমাকে: 'তোমার ঘরে যাও। এক ঘণ্টার মধ্যেই ডেকে পাঠাব। বাজারে যেতে হবে।' ঘর থেকে বেরিয়ে ভিতরবারান্দা ধরে গটমট করে হেঁটে গেল ও, সিঁড়ির পিছনের দরজার ওপাশে হারিয়ে গেল।

মেরির পিছু পিছু সিঁড়ির কাছে এলাম আমি। বাড়িটা শান্ত, নীরব। বারান্দাটাকে নোংরাই বলা চলে, ম-ান আলো জ্বলছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে একটা দরজার সামনে দাঁড়াল ও। দরজা খুলে ছোট একটা ঘরে ঢুকল। আমি ঢুকলাম ওর পিছনে। রাস্তার দিকে মুখ করা ঘর। জানালায় মোটা পর্দা লাগানো। ছোট একটা বিছানা পাতা দেয়াল ঘেঁষে। এক কোণে হাত-মুখ ধোয়ার ওয়াশ স্ট্যান্ড।

'বারান্দার শেষ মাথায় টয়লেট,' হাত তুলে দেখিয়ে দিল মেরি। 'আর ওই যে ঘরটা, ওটা মিসেস ম্যান্ডারের। আমারটা ওপরতলায়। আর মেয়েরা সব থাকে নীচে, দোতলায়।'

'থ্যাংকস,' আমি বললাম।

আমার দিকে তাকাল মেরি। 'তুমি সত্যি নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম।

'এখানে কোন আত্মীয়-স্বজন নেই?'

'না।'

বেরিয়ে গেল সে। দরজাটা লাগিয়ে দিলাম। গায়ের জ্যাকেট খুলে একটা চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেললাম। টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ক্লান্ত লাগছে খুব, অস্থিরতা তো আছেই। চাকরি খোঁজা যে কী কঠিন কাজ তখনও বুঝতে পারিনি আমি। ছাতের দিকে তাকালাম। তারপর দেয়ালের দিকে। চোখ বোজার চেষ্টা করে দেখলাম, জ্বালা করে। বিছানা থেকে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ভাল করে টেনে দিলাম ভারি পর্দাগুলো। ঘর অন্ধকার করে দিয়ে এসে আবার চিত হলাম বিছানায়।

বুড়িটা আমার সম্পর্কে যা খুশি ভাবুকগে! তবে একটা কথা ঠিকই বলেছে, পুলিশ এখানে আমাকে খুঁজে পাবে না। সময় যাক। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে চলে যাব মামা-মামীর কাছে। পরিবারটার কথা ভাবলাম। কেমন আছে তারা? কল্পনায় পরিষ্কার দেখতে পেলাম ব্রাদার বার্নহার্ডের পাঠানো টেলিগ্রামের কাগজের ওপর মামীর ঝুঁকে থাকার দৃশ্যটা—মামা তাঁকে বার বার উদ্বিগ্ন না হতে বলছেন। আর ব্রাদার বার্নহার্ড খেপে নিশ্চয় বোম হয়ে গেছেন। মিসেস ম্যান্ডার আমাকে খুব কঠিন ছেলে ভাবছে। পুলিশ...বাল্টিমোর...গ্র্যান্ডমা...পতিতালয়...

তন্দ্রা এসে গিয়েছিল আমার। দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল মিসেস ম্যান্ডার। পোশাক পরে এসেছে, ভাল পোশাক, আর দশজন বৃদ্ধা মহিলার মতই। পুরোপুরি জেগে গেছি আমি। উঠে বসলাম।

'চলো, ফ্র্যাঙ্কি,' বৃদ্ধা বলল: 'বাজারে যাব।'

বিছানা থেকে নেমে জ্যাকেট গায়ে দিলাম। 'চলুন। আমি রেডি।'

বেরিয়ে এলাম দুজনে। প্রথম যে দোকানটার সামনে থামলাম, সেটা কসাইয়ের। সেখান থেকে গেলাম মুদি দোকানে। নগদ টাকা দিয়ে মাল কিনছে বৃদ্ধা। সবশেষে আমাকে দরজির দোকানে নিয়ে গেল ও।

ছোটখাট একজন ইহুদি এগিয়ে এল আমাদের দিকে। 'হ্যাঁ, ম্যা'ম, আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'ভাল সেকেন্ডহ্যান্ড সুট আছে আপনার কাছে?' বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল।

'আমাকে জিজ্ঞেস করে সেকেন্ডহ্যান্ড সুট আছে কিনা?' নাটকীয় ভঙ্গিতে দুই হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল দরজি। কাপড় ভর্তি কয়েকটা তাকের দিকে দেখাল। 'ওগুলো কী। এক্কেবারে নতুন, পরেইনি প্রায়।'

'আমার নাতির জন্যে একটা সুট দরকার,' বৃদ্ধা বলল।

আমাকে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে কাপড় দেখল সে। একটা সুট দেখিয়ে বলল: 'পরে দেখো।'

'কী সাংঘাতিক, ভদ্রমহিলা কাপড় চেনেন,' তোয়াজের সুরে দরজি বলল: 'আমার দোকানের সবচেয়ে ভাল পোশাকটাই বের করে নিয়েছেন। ওটা তো আমার নিজের জন্যে রেখেছিলাম।' বলতে বলতে তাক থেকে সুটটা নামিয়ে হাত দিয়ে ডলে মসৃণ করতে লাগল সে। ধূসর রঙের সরু স্ট্রাইপের কাপড়। পরে নিলাম। কাঁধ আর হিপ কিছুটা ঢিলে হয়। হাতা ঠিক আছে।

'বাহ্, দারুণ ফিট করেছে,' আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল দরজি। কাঁধটা একটু মেরামত করে দিলেই খাপে খাপে বসে যাবে। এ ছাড়া বাকি সব—একদম ঠিক।'

'কত?' মিসেস ম্যান্ডার জিজ্ঞেস করল।

'সাড়ে বারো,' দরজি বলল: 'শুধু আপনার জন্যে।'

দরাদরি করে নয় ডলারে রফা হলো।

'কী আর করা,' দরজি বলল। 'এ সুটটা আমি বেচতে চাইনি। কিন্তু আপনি ঠিকই

কিনে নিলেন। এখন এটাকে ঠিক করতে হবে। কাঁধ সামান্য ছোট করে দিতে হবে।'

'না,' বৃদ্ধা বলল: 'কাঁধের ভিতর তুলোটুলো কিছু গুঁজে দিন। বড় কাঁধই চাই আমি।'

'বেশ, আপনি যা ভাল মনে করেন,' দরজি বলল: 'জিনিসটা আপনার।'

আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। পনেরো মিনিটেই রেডি হয়ে গেল সুটটা।

'পরে দেখো, ফ্র্যাঙ্ক,' মিসেস ম্যান্ডার বলল।

'ও-কে, গ্র্যান্ডমা,' আমি বললাম। সুটটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। ঠিকই আন্দাজ করেছে বুড়ি। কাঁধ চওড়া হয়ে যাওয়াতেই যেন কয়েক বছর বয়েস বেড়ে গেছে আমার। বুড়িকে কিছু বুঝতে না দিয়ে অসন্তুষ্ট হবার ভান করে রইলাম।

পোশাকটা প্যাকেট করে দিল দরজি। বাসায় ফিরে এলাম আমরা। প্রায় ছ'টা বাজে। বাড়ির বাকি সবাই কেমন কে জানে। দরজা খুলে দিল মেরি। ভিতরে ঢুকলাম আমরা।

'সাড়ে-ছ'টায় খেতে বসব,' মিসেস ম্যান্ডার জানিয়ে দিল আমাকে: 'দেরি করবে না।'

'না, করব না,' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে জবাব দিলাম: 'গ্র্যান্ডমা।'

তিন

কিছুক্ষণ পরে ঘণ্টার শব্দ শুনলাম। নিশ্চয় ডিনারের ঘণ্টা। নীচে রান্নাঘরে নেমে এলাম। বন্ধ দরজার ওপার থেকে বহুকণ্ঠের কথা শোনা গেল। সবাইকে ছাড়িয়ে গেল মিসেস ম্যান্ডারের তীক্ষ্ণ উচ্চকিত কণ্ঠস্বর। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে টেনেটুনে টাইটা ঠিক করলাম। তারপর রান্নাঘরের দরজার পাল-া ঠেলে খুলে ভিতরে পা রাখলাম।

থেমে গেল কলরব। সবগুলো চোখ ঘুরে গেল আমার দিকে। বেশির ভাগ চোখেই কৌতূহল। ভাবলাম আমাকে নিয়েই কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। চুপচাপ দাঁড়িয়ে টেবিল ঘিরে বসা মুখগুলো দেখলাম। মিসেস ম্যান্ডারের উল্টো দিকে একটা চেয়ার খালি। আমার জন্য রাখা হয়েছে। এগিয়ে গিয়ে তাতে বসলাম।

'ফ্র্যাঙ্ক,' মিসেস ম্যান্ডার বলল: 'নিজে নিজে তুলে খাও।'

জবাব না দিয়ে হাত বাড়িয়ে টেবিলের এক প্রান্তে রাখা মাংসের বাটিটা টেনে এনে নিজের পাতে মাংস তুলে নিতে লাগলাম।

মেয়েদের দিকে ফিরল মিসেস ম্যান্ডার। 'ওর নাম ফ্র্যাঙ্ক কেইন,' পরিচয় করিয়ে দিল বৃদ্ধা। 'এখানে কাজ করবে ও–সবকিছু দেখাশোনা করবে।' টেবিলের নীচে হাত নিয়ে মেঝে থেকে এক বোতল জিন তুলে আনল সে। গ-াসে ঢেলে ঢকঢক করে গিলে ফেলল পানির মত। আমার দিকে ফিরল। 'ফ্র্যাঙ্ক, তোমার পাশে যে মেয়েটা বসে আছে ওর নাম মেরি, ওর পাশে যে, সে বেলি।' এ ভাবে প্রতিটি মেয়ের নাম জানাল আমাকে। বড়, ছোট, নানা আকারের ফিগার ওদের, বয়েস পঁচিশ থেকে চলি-শ। পোশাকও নানা রকম, কেউ পরেছে হাউস কোট, কেউ কিমোনো কিংবা অন্য কিছু। কারও মুখে কড়া মেকাপ, কেউ নিয়েছে শুধু হালকা পাউডার-লিপস্টিক ও সামান্য তুলির আঁচড়। আর কারও কারও মুখে কোন মেকাপই নেই, ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওদের, জোর করে যেন ঘুম থেকে তুলে আনা হয়েছে। তবে সবারই একটা ব্যাপারে মিল আছে: চোখের দৃষ্টি ও ঝুলে পড়া ঠোঁটের কোণে স্বার্থপরতার ছাপ।

মেরিকে মেয়েদের নেত্রী মনে হলো। বিশালদেহী, নোংরা ধূসর চাদরে মোড়া দেহ, অস্বাভাবিক বড় বুক, মোটা মোটা বাহু, সাদাটে-সোনালি চুল। আমার দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সে। এমন ভান করে খেতে লাগলাম, যেন ওর তাকানোটা বুঝতেই পারছি না আমি। অবশেষে বলল: 'মিসেস ম্যান্ডার, ওর মত একটা খোকাকে এই গুরুদায়িত্ব দিতে ডেকে এনেছেন কেন?' খাবারের বাসনের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকাল, আমি কী বলি শুনতে চাইছে। কিছুই বললাম না।

খুকখুক করে হেসে আবার খানিকটা মদ গলায় ঢালল মিসেস ম্যান্ডার। সে-ও কিছু বলল না।

উঠে দাঁড়াল মেরি। আমরা কেউ জবাব না দেয়াতে নিজের মন্তব্যের ব্যাপারে

আরও নিশ্চিত হলো যেন সে। 'ও হলো একটা কচিখোকা। জলদি ওকে বিদেয় করুন, হাউমাউ করে কেঁদে ফেলার আগেই। তাকিয়ে দেখুন না ওর দিকে। কেঁদে ফেলতে চাইছে।'

আমার ছুরি-কাঁটা রেখে মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। কম করে হলেও একশো সত্তর পাউন্ড ওজন হবে মেরির, লম্বা পাঁচ ফুট নয়। কথা বললাম না। মেয়েরা সব তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বুঝতে পারছি এখুনি কিছু একটা করা দরকার, নইলে পরে আর আমাকে মানতে চাইবে না। মেরির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে-ও আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চেয়ারে বসে পড়ল। কাত হয়ে ঝুঁকে এসে আদর করে গাল টিপে দেয়ার ভঙ্গিতে দুই আঙুলে চিমটি কেটে বলল: 'আরে দেখো দেখো, খোকাবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখো!' হাতটা সরিয়ে নিল ও। যেখানে চিমটি কেটেছে সেখানটা ব্যথা করছে।'

আবার আমার দিকে ঝুঁকল ও। 'চোখ ডলতে ডলতে বাড়ি চলে যাচ্ছ না কেন, খোকা?' নিষ্ঠুর, কর্কশকণ্ঠে বলল ও।

হাতটা তুলেও নামিয়ে নিলাম আমি।

'কী, কথা হারিয়ে ফেললে?' ভুরু নাচাল ও।

চেয়ার থেকে না উঠেই হাত চালালাম আমি। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে এতজোরে গালে থাপ্পড় মারলাম চেয়ার নিয়ে মেঝেতে উল্টে পড়ে গেল মেরি। চিত হয়ে পড়ে থেকে এক হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরল। বোকা হয়ে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। বাকি মেয়েগুলো আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরাল মেরির দিকে।

মেরিকে বললাম: 'কথা খুব বেশি বলো তুমি।' আবার খাওয়া শুরু করলাম যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে। চেয়ারে হাত রেখে নিজেকে তোলার চেষ্টা করল সে। গায়ের চাদর সরে গিয়ে বুকের একপাশ বেরিয়ে পড়েছে। উঠে বসে চেয়ারটা সোজা করল। ওটাতে বসবে কিনা দ্বিধা করতে লাগল। আমি বুঝলাম, আমাকে ভয় পাচ্ছে ও।

গায়ের চাদরটা ঠিকঠাক করে নিয়ে চেয়ারে বসল অবশেষে।

'কী, তোমাকে বলেছিলাম না!' খুকখুক করে হেসে বলল মিসেস ম্যান্ডার। 'ওকে এড়িয়ে চলতে বলেছিলাম।' আবার হাসল বুড়ি।

এক এক করে খাওয়া শেষ করে উঠে চলে গেল মেয়েরা। এই ঘটনার পর আর বিশেষ কথা বলল না কেউ। টেবিলে রইলাম শুধু আমি ও মিসেস ম্যান্ডার। ও এখন আধমাতাল। 'উটের পিপাসা বুড়ির,' মনে মনে বললাম। 'এত গিলে জায়গা করছে কোথায়!'

'ফ্র্যাঙ্কি, আমার খোকা,' হেসে বলল ও: 'আমার সব সময়ই মনে হতো এতগুলো মেয়ের মাঝে একটা পুরুষ মানুষ থাকা দরকার। নইলে মানায় না।'

সাড়ে সাতটায় মেয়েরা সব নেমে এসে পারলারে গিয়ে ঢুকল। সবাই এখন ওরা চকচকে হয়ে এসেছে, ঝলমলে সাজে সজ্জিত। কালো মখমলের পোশাক পরা। দেখেই বুঝলাম অন্তর্বাস পরা নেই কারোরই। চেয়ারে বসে দরজার ঘণ্টা বাজার অপেক্ষা করতে

লাগল ওরা। নিচুস্বরে কথা বলছে। বিগ মেরি নেমে এল ওপর থেকে। আমার পাশ কাটানোর সময় সামান্য মাথা ঝাঁকাল, যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবে। ওকে বিগ মেরি ডাকা হয় তার কারণ মেরি নামে আরেকটা নিগ্রো মেয়ে আছে, চাকরানির কাজ করে ও। কয়েক মিনিট পর নেমে এল মেয়েটা। উজ্জ্বল রঙের প্রিন্টের ফুলওয়ালা পোশাক পরেছে ও। অন্যান্য মেয়েদের পোশাক, এমনকী ওর নিজের গায়ের চামড়ার সঙ্গেও রঙটা বেমানান লাগছে। পিয়ানোর সামনে বসে পিয়ানো বাজিয়ে মৃদুস্বরে গান গাইতে শুরু করল। সন্ধ্যাবেলায় এটাই ওর কাজ।

বাড়িটার পেটের গভীরের কোনও একখান থেকে যেন বেরিয়ে এল মিসেস ম্যান্ডার। এত মদ খাওয়ার পর কীভাবে এত শান্ত রয়েছে ভেবে পেলাম না। আমরা খাবার টেবিল ছেড়ে যাওয়ার সময়ও এত টলা টলছিল, প্রায় হাঁটতেই পারছিল না। সুন্দর করে পোশাক পরে এসেছে। চুল আঁচড়ে পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে খোঁপা করা। মুখে হালকা পাউডার ঘষা। চশমাটা নাকের মাঝামাঝি জায়গায় বসানো।

আমাকে বলল: 'শোনো, অগ্রিম টাকা নিয়ে নেবে মক্কেলদের কাছ থেকে। পাঁচ ডলার। যদি সারারাত থাকতে চায়, পঁচিশ ডলার। টাকা না নিয়ে কিছুতেই ওপরতলায় যেতে দেবে না। এখানেই থাকবে, এই বারান্দা থেকে নড়বে না। মক্কেলদেরকে ভিতরে ঢোকানোর দায়িত্ব আমার। যা পাওয়ার তা থেকে যদি বেশি চায় কেউ, আমি তোমাকে জানিয়ে দেব, ওর কাছ থেকে কত বেশি নিতে হবে।' বলে ভিতরে চলে গেল বৃদ্ধা।

একটা লিকার কেবিনেট খুলে বোতল বের করতে দেখলাম ওকে। পিয়ানোর ওপর সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল বোতলগুলো, পাশে রাখল গ-াস। আবার ভিতরবারান্দায় ফিরে এল। 'কোন মাতালকে ঢুকতে দেবে না,' আমাকে সাবধান করে দিল বৃদ্ধা। 'ওগুলো ঝামেলা করে।' দরজার ঘণ্টা বাজল। 'যাও, খোলো,' বলে পার্লারে ঢুকে গেল সে। মেয়েদেরকে নড়েচড়ে বসতে দেখলাম। চোখেমুখে উত্তেজনা। যেন প্রতিযোগিতা শুরু হতে যাচ্ছে।

দরজার ফুটো দিয়ে বাইরে তাকালাম। ছোটখাট একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হলো কোনও ব্যাংক কিংবা দোকানের ক্লার্ক। 'মিসেস ম্যান্ডার?' ডাক দিল ও। দরজা খুলে ওকে ভিতরে ঢুকতে দিলাম। সোজা পারলারে গিয়ে ঢুকল লোকটা। কয়েকজনকে 'হ্যালো' বলল। কয়েক মিনিট পর বিগ মেরিকে নিয়ে ভিতরবারান্দায় বেরিয়ে এল ও। মেরির মুখে খুশির ছাপ, প্রথম মক্কেলটা সে-ই ধরতে পেরেছে। পকেট থেকে টাকা বের করে আমার হাতে দিল লোকটা। তিন ডলার। ঘরের ভিতরে মিসেস ম্যান্ডারের দিকে তাকিয়ে আমি তিন আঙুল তুলে বোঝালাম। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল বৃদ্ধা।

'ও-কে!' চাপা গর্জন করে উঠলাম, বুঝলাম নিয়মিত খদ্দের লোকটা।

আবার দরজার ঘণ্টা বাজল। আরেকজন খদ্দের এল। ঢুকতে দিলাম। প্রথম লোকটার মতই সোজা পার্লারে চলে গেল ও। এরপর আরও খদ্দের আসতে থাকল। গ-াসের ঠোকাঠুকি, হাসির শব্দ, আর মৃদু বাজনা ভেসে আসছে পার্লার থেকে। খদ্দের

নিয়ে কয়েকটা মেয়ে যার যার ঘরে চলে গেল। ছোটখাট লোকটাকে নিয়ে নেমে এল মেরি। কোট গায়ে দিতে সাহায্য করল।

'আগামী সপ্তায় দেখা হবে,' লোকটাকে বলল ও।

'নিশ্চয় হবে!' লোকটা বলল। ওকে দরজার বাইরে বের করে দিয়ে এলাম।

পারলারে ঢুকে গেছে ততক্ষণে মেরি।

*

কোনরকম অঘটন ছাড়াই রাত গড়াতে থাকল। নানারকম শব্দ যেন বিদ্ধ করে চলেছে রাতটাকে: গ-াসের ঠোকাঠুকি, পিয়ানোর বাজনা, টয়লেটের ফ্লাশ টানার শব্দ, দরজা খোলার ক্যাঁচকোঁচ, মিসেস ম্যান্ডারের কর্কশ কণ্ঠ, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, আসছে, যাচ্ছে, হ্যালো, গুড-বাই, কাপড়ের খসখস, বিছানার মচমচ, রাতের শব্দ, নোংরা শব্দ। গড়াতে থাকল রাত।

তিনটার দিকে মিসেস ম্যান্ডার বেরিয়ে এল। আমাকে জিজ্ঞেস করল: 'ওপরে আর কেউ আছে?'

'না,' জবাব দিলাম।

'তাহলে বন্ধ করে দাও,' ও বলল। দরজায় তালা লাগিয়ে দিলাম। রান্নাঘরে ফিরে এলাম। ছোট একটা সেফ রয়েছে ওখানে। আইসবক্সের পাশে দেয়ালে গেঁথে লাগানো। 'তিনশো পনেরো ডলার হওয়ার কথা,' আমাকে বলে একটা কাগজ বের করল, তাতে লিখে রেখেছে ও। ওটার দিকে তাকালাম। মেয়েদের নাম লিখে পাশে ক'জন খদ্দের, কত টাকা করে দিয়েছে, সব লেখা রয়েছে। পকেট থেকে টাকা বের করে গুনলাম। একদম ঠিক, নিখুঁত হিসেব। কিছু টাকা মেরে দেবার চিন্তাটা মাথা থেকে উধাও করে দিলাম, সাময়িকভাবে।

টাকাগুলো গুনে নিয়ে সেফে রেখে দিল বৃদ্ধা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সরে এসে একটা আলমারি খুলে জিনের বোতল বের করল। 'খাবে?' বোতলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

'না, ধন্যবাদ, গ্র্যান্ডমা,' জবাব দিলাম।

গ-াসে মদ ঢালল বৃদ্ধা। এক চুমুকে গিলে ফেলে আমার দিকে তাকাল: 'না, খেয়ো না। ছুঁয়োও না কখনও। একেবারে বিষ।'

তাকিয়ে আছি।

'আজ রাতে এই প্রথম খেলাম,' শব্দ করে হাসল বৃদ্ধা। 'কাজের সময় কক্ষণো মদ খাই না আমি।'

আবার গ-াসে মদ ঢালল।

'যাও, ঘুমাতে যাও, ফ্র্যাঙ্ক,' গ-াসের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকাল বৃদ্ধা। 'কাজটা তুমি পারবে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের বেডরুমে চলে এলাম। অন্ধকারেই কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেললাম চেয়ারে। তারপর বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

বিছানায় চিত হয়ে অন্ধকারে ছাতের দিকে তাকিয়ে আছি। অস্থিরতায় ছটফট করছি। ক্লান্তিতে চোখ ব্যথা করছে, তারপরেও ঘুম আসছে না। অন্ধকারেই সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলাম।

আমার ভিতরে কিছু একটা হয়ে গেছে, কোন গোলমাল। জীবনে এই প্রথম আমি ঘুমাতে পারছি না, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলাম: অজানা ভয়, একা থাকার ভয়, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া, ব্রাদার বার্নহার্ডকে ছাড়া, ভবিষ্যৎ বড় ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। বালিশে মাথা রেখে নীরবে কাঁদতে লাগলাম।

কেমন নোংরা লাগছে নিজেকে, ভয়ানক নোংরা, ময়লা যেন আমার চামড়া ভেদ করে হাড়ের মজ্জায় ঢুকে গেছে–এতই ময়লা মনে হচ্ছে ধুয়ে সাফ করা যাবে না।

আফসোস হচ্ছে ভেবে, কেন আমি পালিয়েছিলাম?

চার

সারারাত ঘুমাতে পারলাম না সেদিন। জানালা দিয়ে ভোরের আলো ঢুকল ঘরে। আলো বাড়লে জানালার কাছে গিয়ে সিগারেট ধরালাম। রাস্তাটা শূন্য, শুধু একটা দুধের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর মাঝেসাঝে তাড়াহুড়া করে হেঁটে যাচ্ছে দু'একজন লোক, নিশ্চয় কাজে যাচ্ছে। একে একে নিভে যেতে শুরু করল রাস্তার বাতিগুলো। ওয়াশস্ট্যান্ডে এসে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ভরলাম ওটা, মাথায়, মুখে ভাল করে পানি দিতে লাগলাম। পরনের কাপড় বদলে নতুন কাপড় পরলাম, নতুন অন্তর্বাস, নতুন শার্ট। যে অন্তর্বাস পরে শুয়েছিলাম, সেগুলো বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেললাম। ঘর থেকে বেরিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে চললাম নির্জন বারান্দা ধরে। কোন ঘর থেকেই কোন শব্দ আসছে না। চুপচাপ বাড়িটা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলাম। হেঁটে চললাম মোড়ের দিকে। রাস্তার ওপাড়ে একটা পার্ক। ওটাতে ঢুকে একটা বেঞ্চে বসলাম। আমার কাছেই সকালের বাতাসে যেন সমানে পানি ছিটিয়ে চলেছে একটা ফোয়ারা, অনেক ওপরে উঠছে পানি, সকালের রোদে ঝলমল করছে ফোঁটাগুলো। কিচির মিচির করে কান ঝালাপালা করছে এক ঝাঁক চড়ুই।

ফোয়ারার ওপাশে আরেকটা বেঞ্চে ঘুমিয়ে আছে একজন নাবিক। এক হাত চোখের ওপর ফেলে রোদ আড়াল করেছে। বেঞ্চের পাশে মাটিতে পড়ে আছে ওর সাদা ক্যাপটা। পার্কের গেট দিয়ে ঢুকল একজন পুলিশম্যান, নাবিকের কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে ডেকে তুলল। কিছু বলল, আমি শুনতে পেলাম না। নাবিকও জবাবে কিছু বলে, মাটি থেকে ক্যাপটা তুলে নিয়ে চলে গেল। পার্কে টহল দিতে লাগল পুলিশম্যান। কেটে পড়া দরকার বুঝতে পারছি, কিন্তু পরোয়া করলাম না। ধরা পড়লে পরব! যা হয় হোক! বরং ধরা পড়লেই যেন ভাল হয়। আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে এতিমখানায় ফেরত পাঠিয়ে দেবে। যে কাজ করেছি, তারপরে আর নিজে নিজে ফেরত যেতে পারব না ওখানে, যাওয়ার মুখ নেই। ভুল করেছি, তা-ও বলতে পারব না। তবে পুলিশে নিয়ে গিয়ে যদি ফেরত পাঠায়...

'সুন্দর সকাল, তাই না?' পুলিশম্যান বলল আমাকে।

সিগারেট ধরালাম। 'গুড মর্নিং,' জবাব দিলাম। ভাবছি, আমার গলার কাঁপুনি টের পেল কিনা।

'দারুণ সকাল,' বুক ভরে তাজা বাতাস টেনে নিতে নিতে পার্কের চারপাশে চোখ বোলাল সে। 'খুব সকাল সকাল এলে, তাই না?'

'ঘুমাতে পারছিলাম না,' সত্যি কথাটাই বললাম।

'হ্যাঁ, অতিরিক্ত গরম, মে মাসে এমনই হয়,' হেসে বলল পুলিশম্যান। লালচে চুল, নীল চোখ ওর। 'এখানেই থাকো নাকি?'

'হ্যাঁ,' আমিও হেসেই জবাব দিলাম। 'আমার গ্র্যান্ডমার সঙ্গে থাকতে এসেছি। রাস্তার ওপারে তার বাড়ি।' হাত তুলে বাড়িটা কোনদিকে দেখালাম। 'নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছি।'

'হুঁ, নিউ ইয়র্ক, দারুণ জায়গা!' পুলিশম্যান বলল। 'আমার ভাই থাকে ওখানে। পুলিশেই চাকরি করে, সার্জেন্ট ফ্ল্যাহার্টি। চেনো নাকি?'

মাথা নাড়লাম। 'নিউ ইয়র্ক অনেক বড় জায়গা।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। যাই, ডিউটি করি।' আমার দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে 'গুড-বাই' বলে টহল দিতে চলে গেল সে।

তাকিয়ে রইলাম। হাতের লাঠিটা দোলাতে দোলাতে চলে গেল পুলিশম্যান। বেঞ্চের হেলানে মাথা রেখে হেলান দিলাম। আমার চুলে রোদ পড়ছে। ভাল লাগছে আমার। মনে হচ্ছে আমাকে পরিষ্কার করে দিচ্ছে ওই রোদ। আরামে জড়িয়ে এল চোখ।

হঠাৎ চমকে জেগে গেলাম। একটা কুকুর ঢুকেছে পার্কে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। ঘড়ি দেখলাম। আটটা বেজে গেছে। খিদে পেয়েছে আমার। উঠে পার্ক থেকে বেরিয়ে এলাম। কয়েক ব-ক দূরে রাস্তার পাশে কয়েকটা দোকান। সেদিকে এগোলাম।

একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে নাস্তা সারলাম। দশটা নাগাদ ফিরে এলাম বাসায়। ছোট মেরি দরজা খুলে দিল।

'এত সকালে উঠে গেছ?' ও বলল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম।

'নাস্তা খেয়েছ?'

'খেয়েছি, রেস্টুরেন্টে,' জবাব দিয়ে পার্লারে ঢুকলাম। মাথায় কাপড় জড়িয়ে ঘর পরিষ্কার করছে ও। জানালাগুলো খোলা। ঘরে বাতাস ঢুকছে। কাউচে বসে পত্রিকা পড়তে শুরু করলাম, আসার সময় কিনে এনেছি। এমন জায়গায় বসেছি, সিঁড়ি দিয়ে কেউ নেমে এলে খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পাব। ঘণ্টাখানেক পর রান্নাঘর থেকে মাংস ভাজার গন্ধ নাকে এসে লাগল। আরও অনেকেরই নাকে গেছে সেই গন্ধ, সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে লাগল তারা।

সবার আগে নামল বিগ মেরি। রান্নাঘরের দিকে এগোনোর সময় আমার দিকে এক পলক তাকাল। কয়েক মিনিট পর দরজার কাছে এসে ডাক দিল: 'আমি আসতে পারি?' অনুগত ভঙ্গিতে বলল ও।

'এসো,' পত্রিকা থেকে মুখ না তুলে বললাম।

'কালকের কথা মনে রাখনি তো?' আমার উল্টো দিকে বসতে বসতে কেমন কুঁই-কুঁই করে বলল ও। এমন করে পা ছড়িয়ে দিল, ওর বিশাল মোটা ঊরু চোখে পড়ছে আমার।

'না,' জবাব দিলাম: 'ওটা একটা ভুল বোঝাবুঝি ছিল।' পত্রিকার পাতা ওল্টালাম।

'আসলেই তাই, ভুল বোঝাবুঝি।'

'হ্যাঁ।'

'আসলে আমি তেমন করে বলতে চাইনি। আমি কি বলছি বুঝতে পারছ?' দুই হাঁটু আরেকটু ফাঁক করল ও।

ও কী বলতে চায়, ঠিকই বুঝতে পারলাম।

'যদি কখনও কিছু চাও...' কী চাইতে পারি পা ফাঁক করে দেখিয়ে ভালমতই বুঝিয়ে দিল আমাকে ও।

'না,' সাফ জবাব দিয়ে দিলাম: 'আমি কিছু চাই না। যা ঘটেছে, ভুলে যাও। আর গোলমাল চাই না আমি।'

উঠে দাঁড়াল ও। 'না, ভোলার দরকার নেই। এখন না চাইলেও অন্য কোনও সময় চাইতে পারো। চলি।' নাস্তা করতে রান্নাঘরে চলে গেল ও।

কয়েক মিনিট পর মিসেস ম্যান্ডার নামল। সোজা মদের আলমারির কাছে গিয়ে বোতল বের করে মদ ঢালল গ-াসে। আমার দিকে ঘুরল।

'গুড মর্নিং। খুব সকালে উঠলে। রাতে ঘুমাওনি?'

'আমি সব সময় সকালেই উঠি,' জবাব দিলাম।

'খেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

নাস্তা করতে চলে গেল বৃদ্ধা।

সবার শেষে এল জেনি। ওর পরনেই একমাত্র ভাল পোশাক। বাকি সবাই কেউ বা গাউন পরেছে, কেউ বা অন্য কিছু। জেনির পরনে একটা ধূসর প্রিন্টের পোশাক। গলায় ঝোলানো একটা ক্রুস।

পার্লারে ঢুকল ও। 'গুড মর্নিং।'

'হ্যালে-া,' জবাব দিলাম।

'নাস্তা খেয়েছ?' আমাকে জিজ্ঞেস করল জেনি।

'হ্যাঁ।'

নিতম্ব দুলিয়ে আমার কাছে হেঁটে এল ও। শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল: 'আমি গির্জায় প্রার্থনায় যাব। তুমি যাবে?'

'না।' এ রকম একটা জায়গায় বাস করেও গির্জায় যেতে পারে কেউ ভেবে অবাক লাগল আমার।

'কেন যাবে না?' জেনি বলল: 'গেলে তোমার ভাল হবে।'

জ্বলে উঠলাম: 'আহ্, আমাকে একা থাকতে দাও তো! তুমি কোথায় যাচ্ছ তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই আমার। যাও, সরো আমার সামনে থেকে!'

হেসে উঠল ও। তারপর ঘুরে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। 'আমি জাহান্নামে যাব, আর তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাব,' হাসতে হাসতে বলল ও: 'দেখো।' বেরিয়ে গেল জেনি।

রান্নাঘর থেকে ফিরে এল মিসেস ম্যান্ডার। দড়াম করে বন্ধ হলো সামনের দরজা।

আমাকে জিজ্ঞেস করল বৃদ্ধা: 'কী বলছিলে তোমরা?'

'জাহান্নামে যাওয়ার কথা, গ্র্যান্ডমা,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলাম।

'ও!' গ-াসে মদ ঢেলে গিলে নিল বৃদ্ধা। 'জেনি সব সময় জাহান্নামের ভয় পায়। তুমি কী ক্যাথলিক, ফ্র্যাঙ্ক?'

'না,' জবাব দিলাম।

গ-াস তুলে ঠোঁটে ঠেকিয়ে কী মনে পড়তে থেমে গেল মিসেস ম্যান্ডার। 'ও, একটা কথা, কাল রাতে গোঙানি শুনলাম। মেয়েটা ওকে পিটানোর জন্যে তোমাকে ডেকে নিয়ে যায়নি তো?'

'না তো!' জবাব দিলাম।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল মিসেস ম্যান্ডার। মনে হলো অবাক হয়েছে। 'তা ঠিক, তুমি যাওনি; সারারাতের খদ্দের নিয়েছিল ও।' গ-াসের মদ ছুঁড়ে ফেলে দিল বৃদ্ধা। 'শোনো, তোমাকে যদি কখনও বলে ও,' ধীরে ধীরে বলল মিসেস ম্যান্ডার, কণ্ঠে তীব্র ঘৃণা, আশা করি তুমি ঠিকভাবেই সামলাতে পারবে–ওই বিকৃত রুচির কুত্তিটাকে।' কথাগুলো যেন থুতু ফেলার মত করে মুখ দিয়ে বের করে দিল মহিলা। মিসেস ম্যান্ডারের দিকে তাকানোর সময় মুখটাকে নির্বিকার করে রাখার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। জঘন্য এই জায়গাটার প্রতি আমার ঘৃণা আরও তীব্রতর হয়ে উঠল।

পাঁচ

আমি কী করব এই সিদ্ধান্তে এলাম মঙ্গলবার রাতে। মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই পার হয়ে গেছে গত কয়েকটা রাত। বাড়ির সবাই আমাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। আমি থাকি আমার মত, ওরা ওদের মত। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ নাক গলাই না। ঠিক বুঝতে পারি না, এই কাজটা আমার উপযুক্ত কিনা।

মঙ্গলবার বিকেলে পারলারে বসে পত্রিকা পড়ছি আর সিগারেট টানছি। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। বিষণ্নতায় ভরা জঘন্য বৃষ্টি। মিসেস ম্যান্ডার একটা মেয়েকে নিয়ে সিনেমায় গেছে। আমি আগের দিন দেখে এসেছি ছবিটা। নাম সেভেন্থ্ হেভেন। ছবির পিয়ানোর বাজনা আমার মনকে ফুরফুরে করার চেয়ে আরও বিষণ্ন করে দিয়েছিল। মন খারাপ করে রাস্তা পেরিয়ে একটা কোক খেতে একটা দোকানে যাচ্ছিলাম। এই সময় নেভির রিক্রুটিং স্টেশনটা চোখে পড়েছে। জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়েছি। লম্বা একজন অফিসার একজন নতুন রিক্রুটকে কী যেন বোঝাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ দেখে আস্তে করে সরে এসেছি জানালার কাছ থেকে।

আগের দিনের কথাগুলো মনে পড়তে পত্রিকাটা নামিয়ে রাখলাম। নীল সাগর আমার মনকে টানছে। ছোট মেরি এসে পিয়ানোয় বসে বাজনা বাজানো শুরু করল। তাতেও মন ভাল হলো না আমার। বরং করুণ বাজনা শুনে আরও খারাপ হয়ে গেল। বাড়ির কথা, মামা-মামী, মামাত বোনদের কথা ভাবতে লাগলাম। আমি পালিয়ে আসার পর কী কী ঘটেছে কল্পনা করলাম।

পিয়ানোর শব্দ আমার স্নায়ুতে চাপ দিচ্ছে।

'দোহাই তোমার,' চেঁচিয়ে উঠলাম: 'বন্ধ করো ওটা, বন্ধ করো!'

জবাব দিল না ও। বাজনা থামিয়ে উঠে চলে গেল।

'কী হয়েছে, ফ্র্যাঙ্ক?' জেনি জিজ্ঞেস করল, ভিতরবারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ও। পরনে কাজের পোশাক: কালো মখমলে তৈরি পোশাকে ওর সাদা চামড়াকে আরও সাদা লাগছে, পোশাকের নীচে অন্তর্বাস পরেনি। সোনার ছোট্ট ক্রুসটা গলায় পরা। ঘরে ঢুকল ও।

'কিছু না!' ধমকে উঠলাম।

আমার চেয়ারের হাতলে বসে পড়ল ও। আমার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পত্রিকাটার দিকে তাকাল।

ভাঁজ করে রেখে দিলাম, যে জায়গাটা পড়ছিলাম যাতে দেখতে না পারে। 'যাও, ভাগো।'

শান্ত চোখে আমার দিকে তাকাল ও। অদ্ভুত অনুভূতি হলো আমার–অসুস্থ লাগছে, বমি পাচ্ছে।

'তুমি যাচ্ছ না কেন?' হেসে পাল্টা প্রশ্ন করল আমাকে জেনি।

জবাব দিলাম না। জবাব নেই, দেব কী।

আমার হাতটা নিয়ে নিজের পেটে ডলল জেনি। 'তুমি চলে যাচ্ছ না কেন?' ওর চামড়া উষ্ণ লাগল আমার হাতে। 'তুমি খুব ভাল ছেলে। আমাদের মত হতে চাও? বখে যেতে চাও?' আমার হাতটা নিয়ে শরীরের অন্যান্য জায়গায় বোলাতে লাগল সে।

হাতটা টেনে নিয়ে ঠাস করে চড় মারলাম ওর মুখে। চেয়ারের হাতল থেকে মেঝেতে পড়ে গেল ও। আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল ও, চোখে রাগ নেই, বরং এক ধরনের আনন্দ। ও যা চেয়েছে আমি তা-ই করেছি। চেয়ার থেকে ওঠার চেষ্টা করলাম না।

'তোমার গায়ে ভীষণ জোর,' মোলায়েম গলায় বলল ও।

জবাব দিলাম না। চেয়ার থেকে উঠে ওকে ডিঙিয়ে পেরিয়ে যেতে চাইলাম। আমার পা চেপে ধরল ও। পা ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। আমার হাত ধরার চেষ্টা করল ও। আবার ওকে চড় মারলাম। তাকিয়ে আছি ওর দিকে। আধবোজা হয়ে গেছে ওর চোখ। আমি আবার পা বাড়াতে যেতেই পা চেপে ধরল। অন্য হাতে স্কার্টের নীচের অংশ ওপরে তুলে আনছে।

গোঙাচ্ছে। ধীরে ধীরে নিতম্ব মোচড়চ্ছে।

গোলাপি মাদুরে চিত হয়ে পড়ে আছে ও।

'এসো, ফ্র্যাঙ্ক, এসো!' আমার পা ধরে টান দিল ও।

ওর নিতম্বে কষে লাথি মারলাম। আমার পা ছেড়ে দিল ও। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ালাম। বৃষ্টি পড়ছে। সিগারেট ধরালাম। মিনিটখানেক পর আমার পাশে এসে দাঁড়াল জেনি।

'তুমি যেতে পারবে না,' কঠিন কণ্ঠে বলল ও। 'তুমি ভীতু।'

হঠাৎ করেই ভাল লাগতে আরম্ভ করল আমার। আমার মনের গভীরে যে ভাবনাটা লুকিয়ে ছিল, সামনে চলে এল সেটা। এতক্ষণে হাসলাম।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর। চট করে হাত উঠে এল মুখের ওপর, ঠেকানোর জন্য, ও ভেবেছে আবার ওকে মারব আমি। একটা সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। 'তুমি উন্মাদ,' ফিসফিস করে বলল: 'বদ্ধ উন্মাদ!' ঘুরে দাঁড়িয়ে দৌড়ে ঘরের ভিতর চলে গেল ও।

বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে হা হা করে হাসতে লাগলাম। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নর্দমায়।

*

বাকি দিনটা যেন উড়ে চলে গেল। বার বার নিজেকে বলতে থাকলাম: আমি ভীতু! আমি ভীতু! আমি ভীতু! যতবার বললাম, তত নিজের ভিতরে সাহস মাথাচাড়া দিতে থাকল, ভাল বোধ করলাম আমি। কেন এই কাজটা নিয়েছিলাম বুঝতে আরম্ভ করেছি। নিজেকে যতটা বুদ্ধিমান ভাবি আসলে তত বুদ্ধিমান আমি নই, বৃদ্ধা মহিলা আমার সঙ্গে চালাকি

করেছে। প্রথমে আমাকে পুলিশের ভয় দেখিয়ে আমার জান উড়িয়ে দিয়েছে, তারপর কাজের প্রস্তাব দিয়েছে–জানে, আমি না বলতে পারব না। বুঝতে পেরে মনে মনে হাসলাম। যাই হোক, ভয় যা পাওয়ার পেয়েছি, আর আমি ভয় পাচ্ছি না।

সে-রাতে দরজায় দাঁড়িয়ে জায়গাটাকে ভিন্ন চোখে দেখলাম। সস্তা, নোংরামিতে ভরা একটা জায়গা।

মাঝরাতে একজন নাবিক এল। ভঙ্গিতে মনে হলো আগেও এসেছে। জেনিকে নিয়ে ওপরে চলে গেল ও, আধঘণ্টা পর ফিরে এল। বেরোনোর আগে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে রসিকতা করল।

আমিও হেসে ওর রসিকতার জবাব দিলাম।

থমকে দাঁড়াল ও। আমার দিকে ভাল করে তাকাল। 'তোমার বয়েস তো কম, এ রকম একটা জায়গায় আসার উপযুক্ত নও।'

'থাকব না,' জবাব দিলাম: 'শীঘ্রি চলে যাব।'

'সেটাই ভাল,' বলে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

আমি ওর পিছন পিছন গেলাম। ডাক দিলাম: 'শুনুন।'

রাস্তায় নেমে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'কী?'

'নেভিতে ওরা যা বলে, তা কি সত্যি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কী সত্যি?'

'জাহাজে জাহাজে ঘুরে পৃথিবী দেখা যায়, শিক্ষা নেয়া যায়–' উত্তেজিত শোনাল আমার কণ্ঠ।

বাধা দিয়ে নাবিক বলল: 'তা তো যায়ই। নেভিতে ঢুকতে চাও?'

'যদি আমাকে নেয়।'

খিক করে হাসল লোকটা। 'নেবে তো বটেই। তবে নিজে না গেলে কিছু বুঝবে না।'

'মানে?'

আবার হাসল ও। 'বলছি, যোগাযোগ করে দেখো। না গেলে বুঝবে কীভাবে?'

ওর কণ্ঠের শে-ষটা বুঝতে পারলাম না। বললাম: 'যাব। কালই যাব।'

'হ্যাঁ, যেয়ো। সারা পৃথিবী ঘুরে দেখতে পারবে পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে।' হাঁটার জন্য পা বাড়াল সে।

খপ করে ওর হাত চেপে ধরলাম। 'আপনি ঠাট্টা করছেন?'

আমার দিকে তাকাল ও। গম্ভীর মুখে তাকাল সিঁড়ির মাথায়, বাড়িটার দিকে। হঠাৎ হাসি ফুটল মুখে। 'হ্যাঁ, খোকা, আমি ঠাট্টা করছিলাম। আমাকে দেখো। সারা পৃথিবী ঘুরেছি–ইয়োরোপ, চিন, দক্ষিণ সাগর। কোথায় না গেছি। সাংঘাতিক এক জীবন।' আবার মুখ তুলে বাড়িটার দিকে তাকাল ও। 'এখানকার চেয়ে অনেক ভাল।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল ও।

রাস্তা ধরে চলে যেতে দেখলাম ওকে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে এসে বাড়িতে

ঢুকলাম। মনস্থির করে ফেলেছি আমি।

প্রতিদিনের মতই রাত তিনটেয় তালা লাগিয়ে দিতে বলল মিসেস ম্যান্ডার। টাকা গুনতে গুনতে আচমকা প্রশ্ন করল আমাকে: 'ওই নাবিকটার সঙ্গে এত কথা কী বললে?'

একটা সেকেন্ডের জন্য আমার মনে হলো শুনে ফেলেছে মিসেস ম্যান্ডার, তারপর বুঝলাম, না শুনতে পারার কথা নয়, ওই সময় পার্লারে বসা ছিল সে, আর পিয়ানো বাজছিল।

'কিছু না,' জবাব দিলাম। 'টাকার ব্যাগটা ফেলে যাচ্ছিল, আমি পেয়ে দিয়ে এসেছি।'

একটা মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধা। হাত বাড়াল জিনের বোতলের দিকে। 'এ কারণেই তোমাকে আমি পছন্দ করি, ফ্র্যাঙ্ক। তুমি সৎ।' মদ গিলে নিয়ে বলল: 'ওসব ছিঁচকে চুরি একটা বাড়ির সুনামকে দুর্নামে পরিণত করে।'

ছয়

পরদিন সকাল দশটায় বাল্টিমোরের শহরতলীতে নেভি রিক্রুটিং স্টেশনে চলে গেলাম আমি। অফিস খোলেনি তখনও। সুতরাং পাশের একটা দোকানে এক কাপ কফি নিয়ে বসলাম। একজন ম্যারিন সার্জেন্টকে দরজা খুলতে দেখলাম। তাড়াতাড়ি কফি শেষ করে রাস্তায় নেমে এলাম।

অফিসের দরজা দিয়ে উঁকি দিলাম ভিতরে। সার্জেন্ট তখন সবে একটা ডেস্কে বসেছে। ওকে বললাম: 'আমি যোগ দিতে চাই।'

'ম্যারিন না নেভি?' জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট।

'নেভি,' জবাব দিলাম।

দেয়ালের কাছ ঘেঁষে রাখা একটা চেয়ার দেখাল ও। 'বসো। লেফটেন্যান্ট ফোর্ড এই এল বলে।'

বসে বসে দেয়ালে লাগানো পোস্টারগুলো দেখতে থাকলাম। তারপর একটা পুস্তিকা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টালাম। নেভি-জীবনের প্রচুর ছবি রয়েছে ওটাতে, সাগরের ছবি, সাগরতীরের ছবি, বিভিন্ন জায়গার ছবি। এ সময় অফিসার এলেন।

দাঁড়িয়ে গিয়ে খটাস করে স্যালুট ঠুকল সার্জেন্ট। 'এই ছেলেটা রিক্রুট হতে চায়, সার।'

লেফটেন্যান্ট একজন অল্পবয়েসী তরুণ। ডেস্কে বসে আমাকে কাছে যেতে বললেন। তাঁর ডেস্কের সামনে আরেকটা চেয়ারে বসলাম আমি। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কয়েকটা ফর্ম বের করলেন। ডেস্কে রাখা দোয়াত থেকে কলমে কালি ভরে আমার দিকে তাকালেন।

একের পর এক প্রশ্ন করে চললেন তিনি আর আমি সেগুলোর জবাব দিতে লাগলাম।

'নাম?'

'ফ্র্যাঙ্ক কেইন।'

'মিডল নেম?'

'ম্যান্ডার,' মাথায় যে নামটা প্রথম এল বলে দিলাম, কারণ আমি ভাবলাম নেভিতে ঢুকতে হলে একটা মিডল নেম লাগেই।

'ঠিকানা?'

আমার বর্তমান ঠিকানাটা বললাম।

'জন্ম তারিখ?'

'মে ১০, ১৯০৯।'

'তারমানে আঠারো, ঠিকই আছে,' অফিসার বললেন। 'তোমার বাবা-মা'র

অনুমতিপত্র লাগবে।'

'আমার বাবা-মা মারা গেছে।'

'তাহলে তোমার অভিভাবক?'

'আমার গ্র্যান্ডমাদার। আমি তার সঙ্গেই থাকি।'

'হুঁ, চলবে,' অফিসার বললেন। 'অনুমতিপত্রের ফর্ম আমরা তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।'

এটা আশা করিনি। তবে আমি জানি ফর্মে কী লেখা আছে দেখে ফেলার আগেই মিসেস ম্যান্ডারকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে পারব। বাড়ির দরজা খোলার দায়িত্ব আমার ওপর। ফর্মগুলো আমার হাতেই দেবে পিয়ন। প্রশ্ন চালিয়ে গেলেন অফিসার। প্রশ্ন করা শেষ হলে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

'তোমার গ্র্যান্ডমা'র সই করা হয়ে গেলে কাগজগুলো এখানে নিয়ে এসো,' অফিসার বললেন। 'তিন দিন পরার মত কাপড়-চোপড়ও নিয়ে এসো। তোমার মেডিক্যাল ইগজ্যামিনেশন করা হবে। সেটাতে পাস করে গেলে শপথ বাক্য পাঠ করানোর পর সাথে সাথে তোমাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে বুট ক্যাম্পে।'

'থ্যাংক ইউ,' আমি বললাম।

হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'গুড লাক।'

তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। বাড়ি ফিরে এলাম। এত হালকা লাগছে মাথাটা যেন মেঘের দেশে উড়ছি।

*

সোমবার সকালে এল নেভির চিঠি। আমার আগেই সেটা পিয়নের কাছ থেকে নিয়ে অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে ভিতরবারান্দার টেবিলে রেখে দিল মেরি। খামের বাঁ দিকে ওপরের কোণায় লেখা "ইউ.এস.নেভি, অফিশিয়াল বিজনিস'। খামটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। খুলে দেখলাম ফর্মের এক কোণে ক্রস চিহ্ন দিয়ে দিয়েছেন অফিসার সই করার জন্য। আমার হাতের লেখা অন্য রকম করে মিসেস ম্যান্ডারের নাম সই করে দিলাম। ভরে রাখলাম আমার নীল সুটটার পকেটে, পুরানোটার।

ও বাড়িতে আমার শেষ রাতটা খুব সাদামাঠাভাবে কাটল। রাত তিনটায় তালা লাগিয়ে এসে মিসেস ম্যান্ডারের সঙ্গে বসলাম। টাকা গোনা শেষ হলে চেয়ারে হেলান দিয়ে তার দিকে তাকালাম।

প্রতিদিনের মতই মদ খেতে লাগল বৃদ্ধা। অন্যদিন আমি উঠে নিজের ঘরে শুতে চলে যাই। কিন্তু সেদিন আমাকে বসে থাকতে দেখে মুখ তুলে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল।

'কী হয়েছে তোমার, ফ্র্যাঙ্ক?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমি চলে যাচ্ছি,' জবাব দিলাম: 'আগামী কাল।'

'গিয়ে কী করবে?'

জবাব দিলাম না।

'বেশ, সেটা তোমার ব্যাপার!' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর। আবার মদ ঢালল

গ-াসে। 'তোমাকে যে কাপড়গুলো কিনে দিয়েছিলাম সেগুলোর কী হবে?'

'রেখে দিন। ওই কাপড় পরার আর কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

'তোমার কী ইচ্ছে সেটা নিয়ে আমারও কোন মাথাব্যথা নেই! তবে অনেক টাকা দিয়ে কাপড়গুলো কিনেছি।'

'তাতে কী!' আমি বললাম।

একটা সেকেন্ড নীরব হয়ে রইল বৃদ্ধা। তারপর কথা বলল আবার। 'আমি তোমার বেতন দশ ডলার বাড়িয়ে দিচ্ছি।'

'লাভ নেই!' জবাব দিলাম। 'এই কাজটার ওপরই ঘেণ্না ধরে গেছে আমার।'

'শোনো,' বোঝানোর চেষ্টা করল মহিলা: 'লেগে থাকলে এই ব্যবসায় ভাল কামাতে পারবে তুমি। বলা যায় না, কয়েকদিন পরেই হয়তো আমার আয়ের একটা ভাগও তোমাকে দিয়ে দিতে পারি। থেকে যাও। ভাল থাকব আমরা।'

'আমি যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়ালাম।

আমার দিকে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধা। 'দেখো, রক্তের সম্পর্কের কেউ নেই আমার। এদিকে প্রচুর টাকা জমে গেছে। আমি বুড়ি হয়েছি। ব্যবসাটা দেখাশোনার জন্যে একজন বিশ্বস্ত লোক দরকার। তুমি আমার বিশ্বাস অর্জন করেছ। লেগে থাকো, ধনী হয়ে যাবে।'

বৃদ্ধা মহিলার জন্য মায়া হলো আমার। জীবনটা নিশ্চয় তার জন্য খুব কঠিন হয়ে উঠেছে। 'সরি,' স্বর নরম করে বললাম: 'কিন্তু আমি যে থাকতে পারছি না।'

জ্বলে উঠল বৃদ্ধা। টেবিলের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল: 'জাহান্নামে যাও!' গলা কাঁপছে তার।

কোন কথা না বলে দরজার দিকে এগোলাম।

'ফ্র্যাঙ্ক,' পিছন থেকে ডাক দিল মহিলা।

'বলুন,' ফিরে তাকালাম।

'তোমার টাকা দরকার?' কোমল হয়ে এসেছে বৃদ্ধার স্বর।

মাথা নাড়লাম।

টাকার বান্ডিল থেকে কয়েকটা নোট নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'নাও। আমার অনেক আছে। এত আছে খরচ করে শেষ করতে পারব না।'

টাকাগুলো নিয়ে পকেটে ভরলাম। 'থ্যাংকস।'

'এক মিনিট এসো এদিকে,' কাছে ডাকল আমাকে বৃদ্ধা।

গেলাম তার কাছে। আমার হাত ধরল সে। 'তুমি খুব ভাল ছেলে, ফ্র্যাঙ্ক। তোমার মধ্যে এক ধরনের বন্যতা আর কাঠিন্য রয়েছে, যেটাকে নরম করা দরকার। তবে তোমার মধ্যে ভাল আর উজ্জ্বল কিছুও রয়েছে। যে কাজই করো না কেন, এটাকে নষ্ট হতে দিয়ো না।' হাসল বৃদ্ধা। 'আমি আসলে বুড়ো হয়ে গেছি, সে-কারণেই এত আবেগ বেরোচ্ছে।' আবার গ-াসে মদ ঢালল সে।

চুপ করে রইলাম। বৃদ্ধা আমাকে ভালবেসে ফেলেছে বুঝতে পারছি।

'কিছু বলবে?' বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল।

'গুড-বাই,' বলে আচমকা ঝুঁকে টুক করে চুমু খেলাম ওর গালে। বুড়ো, শুকনো, খসখসে চামড়া, পুরানো কাগজের মত।

অবাক হয়ে নিজের গালে হাত রাখল বৃদ্ধা। জোরে জোরে যেন মনের ভাবনাগুলো প্রকাশ করল: 'বহুকাল আমার গালে কেউ–' কথাগুলো হারিয়ে গেল শেষ দিকে এসে।

বেরিয়ে এসে আমার পিছনে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম। চলে এলাম নিজের ঘরে।

পরদিন সকালে ইউনাইটেড স্টেটস নেভিতে যোগ দিলাম আমি। মেডিক্যাল ইগজ্যামিনেশন সহজেই পাস করে গেলাম। ডাক্তার হেসে বললেন: 'লেগে পড়ো, খোকা। তুমি এখন নেভির লোক।'

অফিসে আরও তিনজন লোক রয়েছেন, তাঁদের একজন লেফটেন্যান্ট ফোর্ড। বললেন: 'দেখি, ডান হাতটা দাও তো তোমার।'

বুকের ভিতর দুরুদুর করছে আমার। হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। সেটা ধরে বললেন: 'এখন আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো, আমি শপথ করিতেছি যে–'

তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে বললাম: 'আমি শপথ করিতেছি যে–'

চতুর্থ পর্ব

এক

ডিসেম্বর ৩০, ১৯৩১ সাল। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নেভাল স্টেশনের দিকে তাকালাম। স্যান ডিয়েগো বে থেকে আসা বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। জ্যাকেটের কলার তুলে দিয়ে সিগারেট ধরালাম। চাকরি থেকে আমাকে অব্যাহতি দেয়ার কাগজপত্রগুলো আমার পকেটে ভরা। পায়ের কাছে পড়ে আছে নেভি থেকে পাওয়া ডাফল ব্যাগ।

বেরিয়ে আসতে পেরে আমি খুশি। নেভির চাকরি খারাপ এ কথা বলছি না, তবে ওই কড়া নিয়ম-কানুনের মধ্যে থাকতে আমার ভাল লাগেনি। এ যেন আরেক এতিমখানা, আরেক বন্দিশালা।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে মেইন গেটের দিকে এগোলাম।

গেটের কাছে ডিউটিরত পেটি অফিসারকে কাগজপত্র বের করে দিলাম। হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে আবার ফিরিয়ে দিল আমাকে। 'ও কে, সেইলর,' বলে হাসল ও: 'সো লং।'

'সো লং না কচু!' আমি বললাম। 'বরং গুড-বাই বলছি। নরক থেকে বেরিয়ে এসেছি আমি।'

'সবাই তাই বলে,' হাসি মুছল না ওর। 'আবার ফিরে আসতে হবে তোমাকে। সবাই ফিরে আসে।'

'আমি সবাই নই। আসব না, দেখো। আমি বাড়ি যাচ্ছি।' গেট থেকে বেরিয়ে বাস স্টপে এলাম। বাস এল। তাতে উঠে বসলাম।

বাস চলতে শুরু করতেই শেষবারের মত ফিরে তাকালাম নেভাল স্টেশনের দিকে। তারপর হেলান দিলাম সিটে।

আমাকে দেখে খুশি হবে আমার আত্মীয়-স্বজনরা। শেষবার ওদের চিঠি লেখার কথাটা ভাবলাম। নিউ ইয়র্ক থেকে লিখেছিলাম। বন্দরে ভিড়েছিল আমাদের জাহাজ। চব্বিশ ঘণ্টার ছুটি পেয়ে শহর ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। সারাটা সকাল ঘুরে ঘুরে কখন যে জেরিদের বাড়ির সামনে চলে গিয়েছিলাম বলতে পারব না। কোনরকম ভাবনাচিন্তা না করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বেল বাজিয়েছিলাম।

দরজা খুলে দিয়েছিল একজন খানসামা।

'জেরি আছে?' জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'না। মাস্টার জেরি এখন কলেজে। এলে কিছু বলতে হবে?'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জবাব দিয়েছিলাম: 'না।' বলে চলে এসেছিলাম।

বাড়ির জন্য মন খারাপ লাগছিল তখন, হোমসিক বলে যাকে। এই শহর, যেখানে বড় হয়েছি আমি, একটা পরিচিত মুখ নেই যার সঙ্গে আমি দেখা করে দুটো মনের কথা বলতে পারি। খুব খারাপ লাগছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা হোটেলে চলে গিয়েছিলাম। ওখানে বসেই চিঠিটা লিখেছিলাম :

প্রিয় মামা-মামী, আইরিন ও ইজি,
আমি ভাল আছি তোমাদের জানানোর জন্যই এ চিঠি লিখছি। আশা করি মামা সুস্থ হয়ে গেছেন। পালিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে অশেষ মনোকষ্টে রাখার জন্য দুঃখিত। তোমাদের কাছ থেকে চলে গিয়ে এতিমখানায় থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই চলে গিয়েছিলাম। এখন আমি ভাল আছি। চাকরি করছি। আমার বয়েস যখন পূর্ণ হবে, এতিমখানায় আর ফিরে যেতে হবে না, তখন তোমাদের কাছে ফিরে যাব। তোমরা আর দুশ্চিন্তা কোরো না।
আমার ভালবাসা নিয়ো। আর ভাল থেকো।
–ফ্র্যাঙ্কি।

চিঠিটা লিখতে লিখতে আরেকটা বুদ্ধি এসেছিল আমার মাথায়। ব্যাংকে গিয়ে আমার অ্যাকাউন্টে যত টাকা ছিল সেটার একটা চেক লিখে চিঠির সঙ্গে পোস্ট করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর জাহাজে ফিরে গিয়েছিলাম। নিউ ইয়র্কে এর বেশি আর কিছু ছিল না আমার জন্য।

প্রায় দুই বছর আগের ঘটনা এ সব। এখন আমার বয়েস পুরো হয়েছে। অ্যারিজোনায় পরিবারের কাছে ফিরে যাচ্ছি। স্যান ডিয়েগোর শহরতলীতে এসে বাস থেকে নামলাম। একটা হোটেলে উঠলাম। রুমে যাওয়ার আগে টেলিগ্রাফ ডেস্কে গেলাম।

একটা পেন্সিল আর একটা টেলিগ্রাফ ফর্ম আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ওখানে কর্মরত মেয়েটা। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে লিখতে আরম্ভ করলাম। মনে খুব ফুর্তি হচ্ছে। এতদিনে সব আবার ঠিকঠাক হতে যাচ্ছে। এখন থেকে আর আমাকে আমার প্রিয় বাড়ি থেকে কেউ বের করতে পারবে না। পকেটে টাকাও আছে, দুশো ডলার।

মিস্টার মরিস কেইন, ২২১ লিংকন ড্রাইভ, টুসন, অ্যারিজোনা.
নেভি থেকে আজ চাকরি ছেড়ে দিলাম। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের কাছে চলে আসছি। সপ্তাহ শেষে এখান থেকে রওনা হবার ইচ্ছে। আমি ওখানে কোন দিন পৌঁছালে সুবিধে হবে জানালে খুশি হব। তোমাদের দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছি।
ভালবাসা,
ফ্র্যাঙ্ক।

বয়ের সঙ্গে ওপরতলায় গেলাম যে আমাকে আমার রুমটা দেখিয়ে দিল। ডাফল ব্যাগের জিনিসপত্র খুলে ড্রেসারে রেখে আবার নীচে নেমে এলাম। ভাল কাপড় কোন দোকানে পাওয়া যাবে ডেস্ক ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করলাম। গ্র্যান্ড অ্যাভেনিউর একটা দোকানের ঠিকানা দিল ও। প্রতিটি উনিশ ডলার করে তিনটি খুব ভাল সুটের অর্ডার দিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই সেগুলো তৈরি করে দেবে বলল দোকানদার। তাড়াতাড়ি দেয়ার তাগাদা দিলাম। ও বলল, শনিবারের মধ্যেই হয়ে যাবে, নিউ ইয়ারের পরদিন। তারপর পাশের আরেকটা দোকানে গিয়ে এক ডলার পঁচিশ সেন্ট দামের ছয়টা শার্ট কিনলাম। কিছু আন্ডারওয়্যার, মোজা আর টাইও কিনলাম। ছয় ডলার দিয়ে কিনলাম একটা চামড়ার ব্যাগ। জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। সুটগুলো পেলেই রওনা হতে পারব।

গড়িয়ে গড়িয়ে কাটল কয়েকটা দিন। নিউ ইয়ারস ইভের প্রায় পুরো দিনটাই হোটেলে আমর রুমে কাটালাম। সারারাতে কয়েকটা পার্টি হয়ে গেল হোটেলে, বদ্ধ দরজার ভিতর দিয়েও হই-চইয়ের শব্দ শুনতে পেলাম। অদ্ভুত ব্যাপার, তাতে খারাপ লাগল না আমার। আমার মন জুড়ে রয়েছে নানারকম সুখের ভাবনা। আমার টেলিগ্রাম পেয়ে পরিবারের লোকেরা কী খুশিই না হবে, অধীর আগ্রহে আমার যাওয়ার অপেক্ষা করবে। আমি জানি, বাচ্চাদের দেখে এখন আর চট করে চিনতে পারব না। এতদিনে অনেকটাই বড় হয়ে গেছে ওরা।

পরদিন দোকানে গিয়ে আমার সুটগুলো নিলাম। নেভির ইউনিফর্ম খুলে নিয়ে বাদামী টুইডের সুটটা পরলাম। আয়নার ভিতরে তাকিয়ে নিজেই নিজেকে চিনতে পার-লাম না। এবার গিয়ে টিকেট কাটা যায়। পরদিন সকালের টুসনগামী একটা ট্রেনের টিকেট কাটলাম। তারপর হোটেলে ফিরে এলাম। বিল দিয়ে রুম ছেড়ে দেবার জন্য ডেস্কের দিকে এগোচ্ছি এ সময় দেখলাম আমার মেইল বক্সে কী যেন ঢোকাতে যাচ্ছে ক্লার্ক। কাছে গিয়ে জিনিসটা আমাকে দিতে বললাম।

জিনিসটা টুসন থেকে আসা একটা টেলিগ্রাম। ওখানে খুললাম না; ভীষণ উত্তেজিত আমি। আমার টেলিগ্রামের জবাব দিয়েছে ওরা, ভাবলাম। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ছুটলাম খুলে পড়ার জন্য। ঘরে ঢুকেই এক মুহূর্ত দেরি না করে খুলে ফেললাম।

আমি যে তারটা পাঠিয়েছিলাম সেটার কপির সঙ্গে একটা বাড়তি কাগজ লাগানো। তাতে লেখা: আপনার ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৩১-এ পাঠানো টেলিগ্রামটা ডেলিভারি দেয়া যায়নি। কী কারণে দেয়া যায়নি সেটা পেন্সিলে লিখে দেয়া হয়েছে: যাঁর নামে পাঠানো হয়েছে, তাঁকে পাওয়া যায়নি; কোন ঠিকানায় গেলে পাওয়া যাবে, তা-ও জানিয়ে যাননি।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিছুই যেন মাথায় ঢুকল না আমার। চেয়ারে নেতিয়ে পড়েছে আমার দেহটা, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে। দুটো মিনিট ওইভাবেই পরে থাকলাম, বোধহীন অবস্থায়। এরপর কী করব জানি না। আমাকে না

জানিয়ে এভাবে চলে যাবে ওরা কল্পনাই করতে পারিনি। পরে ভাবলাম, জানানোর উপায় ছিল না ওদের। আমি কোথায় ওরা জানত না। আবার সেই অনুভূতিটা ফিরে এল আমার মাঝে–নিঃসঙ্গ, সব হারানো এক অনুভূতি। রাস্তার শব্দ আসছে জানালা দিয়ে। ভিতর বারান্দায় একজন মহিলার হাসি শোনা গেল। ঘরটা যেন চেপে আসছে আমার ওপর। সিগারেট ধরালাম। বাতাস ধোঁয়ায় ভরে গেল। আর্মচেয়ারে ওভাবে কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না, তবে যখন চোখ তুলে তাকালাম দেখি বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। আস্তে করে উঠে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। শহরের রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। লক্ষ্যহীনভাবে ঘরের মধ্যে হেঁটে বেড়াতে থাকলাম। কোন কিছুতেই আর মনোনিবেশ করতে পারছি না।

নীচতলায় ডাইনিং রুমে নেমে এলাম। খাবারের অর্ডার দিয়ে বসে রইলাম। খাবার এল। কিছুই না খেয়ে বিল দিয়ে বেরিয়ে চলে এলাম। লাউঞ্জে বসে তাকিয়ে রইলাম শূন্য দৃষ্টিতে। মানুষজন আসছে যাচ্ছে, কিছুই চোখে পড়ছে না যেন আমার। মগজে ভাবনাগুলোও যেন থেমে গেছে, এক অদ্ভুত শূন্যতায় ভরা। টেলিগ্রাফ ডেস্কের দিকে তাকালাম। উঠে এসে দাঁড়ালাম সেখানে। মুখ তুলে তাকাল মেয়েটা।

পকেট থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে বাড়িয়ে ধরলাম। 'এটার সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

কাগজটার দিকে তাকাল ও। 'না, মিস্টার কেইন। পাওয়ামাত্র ডেস্কে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ওরা কি ভুল করতে পারে না?'

'মনে তো হয় না,' মেয়েটা জবাব দিল। 'খুব সাবধানে এ সব জিনিস চেক করে ওরা।'

'থ্যাংকস,' বলে সরে এলাম সেখানে থেকে। লক্ষ করলাম আমার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ডেস্কের পাশ থেকে এক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে টেলিফোন লাউঞ্জে। লবির চেয়ে ওখানে ভিড় কম। কাজেই আমি সেখানে চলে এলাম। পুরোপুরি একা হতে চাই না, আবার অতিরিক্ত ভিড়ও সহ্য করতে পারছি না। ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না অনুভূতিটা। ফোন বুথের পাশের একটা চেয়ারে বসলাম। আধ ঘণ্টা পর টেলিগ্রাফ ডেস্কের সেই মেয়েটা এসে ফোন বুথে ঢুকল। দরজা বন্ধ করল। মেশিনে কয়েন ফেলার শব্দ শুনলাম না। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এল ও। দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে অবাক হওয়ার ভান করল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে সাড়া দিলাম; হাসতে ইচ্ছে করল না।

পার্স থেকে সিগারেট বের করল ও। হেসে বলল: 'ধরিয়ে দেবেন, মিস্টার কেইন?'

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে কাঠি ধরিয়ে বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। আমার পাশে বসল ও। আমি কিছুটা সরে ওকে বসার জায়গা করে দিলাম। 'থ্যাংকস,' বলল ও।

'ও কে,' আমি বললাম।

'নতুন কাপড় বুঝি?' আমার সুটের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

'কী?' জিজ্ঞেস করলাম। একটা মুহূর্ত বুঝতে পারলাম না ও কী বোঝাতে চাইছে। তারপর মাথা ঝাঁকালাম। 'আজই নিয়েছি।'

'নেভি থেকে বেরিয়ে এসে কেমন লাগছে?' ও জিজ্ঞেস করল।

'ভালই, মনে হয়,' জবাব দিলাম।

'কেমন খাপছাড়া, আমার ধারণা।' আগ্রহী দেখাল ওকে।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম: 'তবে ঠিক হয়ে যাবে।'

'খুব খারাপ লাগছে আমার, মানে, ওই টেলিগ্রামটার ব্যাপারে,' সহানুভূতির সুরে বলল ও।

'এ রকম কিছু ঘটতে পারে আগেই ভাবা উচিত ছিল আমার,' আমি বললাম। কিছুটা ভাল বোধ করতে আরম্ভ করেছি। এই হতচ্ছাড়া জায়গায় এই মেয়েটাই একমাত্র আমার প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছে। ওর দিকে ভাল করে তাকালাম। বেশ সুন্দরী; কালো চুল, নীল চোখ, নিখুঁত শরীর। ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। 'আমার দুঃখের কথা বলে আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। আমার যেটুকু খোঁজ-খবর নিলেন তাতেই আমি খুশি।'

'আরে না না, ও কিছু না,' মেয়েটা বলল। 'আমার একজন নিকট আত্মীয় নেভিতে ছিল, মাঝে মাঝেই ভেবে অবাক হই নেভি থেকে বেরিয়ে এলে ওর কেমন লাগবে।'

'খুব খারাপ লাগবে না,' আমি বললাম: 'যদি মনস্থির করে নেয়া যায়, এরপর কী করা হবে।'

'আপনি কী করবেন?'

একটা সিগারেট ধরালাম। কী করব? আমি জানি না–এ নিয়ে কিছু ভাবিনি। 'সত্যিই আমি জানি না। হয়তো একটা চাকরি খুঁজে নেব।'

'বিশেষ কোন চাকরি?'

'না, হাতের কাছে যা পাই,' জবাব দিলাম।

'আজকাল চাকরি পাওয়া খুব কঠিন,' মেয়েটা বলল।

'কী জানি,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলাম। 'আমার কখনও কাজ পেতে অসুবিধে হয়নি।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম আমরা। তারপর উঠে দাঁড়াল ও। 'আমার যাওয়া দরকার। আর দেরি করলে বাড়িতে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।'

তাকালাম ওর দিকে। 'বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দিন না আপনার দেরি হবে? মানে, আমার সঙ্গে বেড়াতে চলুন না? আমাকে আপনি শহরটা ঘুরিয়ে দেখাবেন। এখানকার কিছু চিনি না আমি।'

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। 'কথাটা মন্দ বলেননি, মিস্টার কেইন। তবে আমাকে সত্যি বাড়ি যেতে হবে।'

কেন যেন মনে হলো আমার মত ওরও বাড়ি নেই। তবে সেটা না বলে বললাম: 'পি-জ, চলুন। আমার খুব ভাল লাগবে। আজব এই শহরে খুব নিঃসঙ্গ লাগছে আমার।'

একটা মুহূর্ত ভেবে দেখার ভান করল ও। 'বেশ, চলুন, মিস্টার কেইন। তবে আগে আমাকে বাড়িতে ফোন করতে হবে, মিস্টার কেইন।'

বার বার 'মিস্টার কেইন' বলার ইঙ্গিতটা আমি ধরতে পেরে বললাম: 'শুধু ফ্র্যাঙ্ক।'

'হ্যাঁ, ফ্র্যাঙ্ক,' হাসল ও। 'আমার নাম হেলেন।'

ফোন বুথে ঢুকল হেলেন। আমি বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। আবার ও কোন ফোন না করেই বেরিয়ে এল। মনে মনে হাসলাম।

একটা নাইটক্লাবে চলে গেলাম আমরা। ওখানে খাবার খেলাম, মদ খেলাম। সাধারণত খুব একটা মদ খাই না আমি, কিন্তু সেদিন পরোয়া করলাম না। এত খাওয়া খেলাম, মেজাজ ফুরফুরে হয়ে গেল। খাওয়ার পর নাচলাম আমরা। আবার মদ খেলাম। কখন যে উড়ে গেল সময়, দুটো বেজে গেল, টেরই পেলাম না। ক্যাবারে থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ডাকলাম।

'চলো, তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসি,' আমি বললাম।

'এ ভাবে এত রাতে বাড়ি যেতে পারব না আমি,' হাসল ও। 'বাবা নরক গুলজার করে ফেলবে।'

'তাহলে থাকবে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হোটেলেই। রাতে ডিউটি থাকলে ওখানেই থাকি।'

ট্যাক্সিতে চড়লাম আমরা। ড্রাইভারকে বললাম: 'বার্কলে হোটেলে যাও।' চলতে শুরু করল ট্যাক্সি। মাথার ভিতরের ঘোলাটে ভাবটা জানালা দিয়ে আসা তাজা বাতাসে পরিষ্কার হয়ে গেল। সিটে হেলান দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকালাম। সিটের কোণে বসে আছে ও। আমাকে তাকাতে দেখে হাসল।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলাম।

আবার হাসল ও। 'কেমন যেন লাগছে।'

'তাই নাকি?' ওর গলা জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে আনলাম।

আমার গায়ের সঙ্গে চেপে রইল ও। বেয়াড়াভাবে ওর গায়ে ঘুরে বেড়াতে থাকল আমার হাত। বাধা দিল না ও। ওকে চুমু খেলাম।

'এখনও কি কেমন লাগছে?' আবার চুমু খেলাম ওকে। এবার সে-ও পাল্টা চুমু খেল। আগুন ধরে গেছে যেন ওর ঠোঁটে, এত গরম।

'আর না,' টান দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল ও। 'চুমু খেতে পারো বটে তুমি।'

'শুধু এই না, আরও অনেক কিছু পারি,' মাথা ঝিমঝিম করছে আমার। আবার চুমু খেলাম ওকে। তারপর ওর গলায় চুমু খেলাম। শক্ত করে আমাকে চেপে ধরে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিল ও।

'হোটেলে এসে গেছি!' ফিসফিস করে আমার কানের কাছে বলল। হোটেলের

সামনে থেমে গেল ট্যাক্সি। ওকে ছেড়ে দিলাম। টেনেটুনে কাপড় ঠিক করল ও। বেরিয়ে এসে ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে দিলাম।

হেলেনের হাত ধরে টান দিলাম: 'চলো, ভিতরে যাই।'

হাত ছাড়িয়ে নিল ও। 'তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। চাকরি যাবে আমার, গেস্টদের সঙ্গে মেলামেশা নিষেধ। এখানেই তোমাকে গুড নাইট জানাতে হচ্ছে।'

ওর দিকে তাকালাম। এখানেই গুড নাইট! পাগল নাকি ও? এভাবে বাইরে থেকে বেরিয়ে এসে, এত টাকা খরচ করে এখন খালিমুখে রাস্তা থেকেই বিদায়, এ হতে পারে না। আবার তাকালাম ওর দিকে। জিজ্ঞেস করলাম: 'এই হোটেলে তোমার রুম আছে নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

'বেশ,' আমি বললাম: 'গুড নাইট।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হেঁটে গিয়ে লবিতে ঢুকলাম। মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। শয়তান মেয়ে! ফাঁকিবাজ! কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকে হাসতে শুরু করলাম। আর যা-ই হোক, আমার মনের ভারটা তো কাটিয়ে দিয়েছে ও।

ঘরে ঢুকে জ্যাকেট ও টাই খুলে নিলাম। ওয়ালেট বের করে টাকা কত আছে গুনলাম। একশো দশ ডলারের মত অবশিষ্ট আছে। আগামীকাল হোটেলের ভাড়া মিটিয়ে এই রুম ছেড়ে দিয়ে আরেকটা সস্তা হোটেলে উঠব। সোমবারে বেরোব চাকরির সন্ধানে। শার্ট খুলে রেখে বেসিনে গিয়ে হাতমুখ ধুলাম। তারপর বিছানার কিনারে বসে সিগারেট ধরালাম। দরজায় টোকার শব্দ হলো। এতই মৃদু, কোনমত শোনা গেল। লাফ দিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে টাকাগুলো তুলে ড্রেসারে ভরে রাখলাম। তারপর গিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

হেলেন দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হয়ে গেলাম। 'কী হলো, ভিতরে আসতে বলবে না?'

'ও, এসো, এসো,' বিড়বিড় করে বলে পাশে সরে ঢোকার জায়গা করে দিলাম।

ঘরে ঢুকল ও। দরজা লাগিয়ে দিলাম। 'আমাকে এতটা সময় আনন্দ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি তোমাকে, সেকারণেই এলাম।'

'আমারও ধন্যবাদ দেয়া উচিত,' মোলায়েম গলায় বললাম। আমি জানি, শুধু ধন্যবাদ দেয়ার জন্য আমার ঘরে আসেনি ও। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলাম। শুধু বেড ল্যাম্পটা জ্বলে রইল।

আধো অন্ধকারে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হঠাৎ এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল ও। ওর হাত চেপে ধরলাম। 'কী, ব্যাপার, বেবি?' কাছে টেনে আনলাম ওকে।

'আমার ভয় লাগছে,' ও বলল। 'কখনও আর এটা করিনি।'

ওর পোশাকের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলাম। দম আটকে ফেলল ও। টেনে নিয়ে এলাম ওকে বিছানার কাছে। বললাম: 'প্রথমবার বলে একটা কথা আছে, বেবি।'

হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলাম।

দুই

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমার। ঘরের মধ্যে কোন কিছুর নড়াচড়াতেই বোধহয়। পাশে হাত বাড়িয়ে দেখি হেলেন চলে গেছে। লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। বিছানা থেকে নেমে গিয়ে ড্রেসার খুলে দেখি টাকাগুলো নেই। কাপড় পরতে পরতে নিজেকেই বকতে লাগলাম এই বোকামির জন্য। মাত্র দশটা ডলার অবশিষ্ট আছে আমার কাছে, প্যান্টের পকেটে যেটা রেখেছিলাম। বারান্দায় বেরোতে বেরোতে ঘড়ির দিকে তাকালাম। পাঁচটা প্রায় বাজে। এলিভেটরে চড়ে নীচে নামলাম।

ডেস্কে এসে জিজ্ঞেস করলাম: 'টেলিগ্রাফ অপারেটরকে দেখেছেন?'

'না,' ক্লার্ক জবাব দিল। 'কার কথা জানতে চাইছেন?'

'দিনের বেলা যে কাজ করে,' আমি বললাম। 'হেলেন।'

'ও, ওই মেয়েটা। ও তো বদলি অপারেটর। মাত্র এক দিনের জন্যে নেয়া হয়েছিল। আমাদের নিয়মিত অপারেটর অসুস্থ। কেন, কিছু হয়েছে?'

হয়েছে মানে? অনেক কিছুই হয়েছে! আমাকে ভিখিরি বানিয়ে ফেলেছে। হোটেলেরই পাওনা এখনও বিশ ডলার বাকি, আর লোকটা জিজ্ঞেস করছে কিছু হয়েছে কিনা। 'না,' জবাব দিলাম। 'হঠাৎ করেই মনে পড়ল, একটা তার পাঠানো দরকার। যাকগে, পরে পাঠালেও চলবে।'

ফিরে এলাম নিজের ঘরে। আমার সর্বস্বান্ত হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। শুনেছি, নাবিকরা এসে টাকাপয়সা নিয়ে হোটেলে উঠে, তারপর ঠগবাজ কিংবা চোরের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হয়। আমার নিজের বেলায়ও যে ঘটবে, কল্পনা করিনি। একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে বসলাম এরপর কী করব।

সকাল দশটায় নেমে এলাম টেলিগ্রাফ ডেস্কে। একজন অপারেটর বসে আছে সেখানে। ওকে জিজ্ঞেস করলাম: 'হেলেন কোথায় থাকে জানেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। 'আমি কী করে জানব? আমি অসুস্থ থাকার সময় অফিস ওকে একদিনের কাজ দিয়ে পরখ করতে চেয়েছিল। ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব?'

'পারবেন? তাহলে তো খুবই ভাল হয়। পি-জ, করুন না, খুব জরুরি।'

তারের সাহায্যে সেন্ট্রাল অফিসে যোগাযোগ করল মেয়েটা। জবাবে মেসেজ এল: না। একদিনের জন্য কাজ দেয়া হয়েছিল। পাওনা নিয়ে চলে গেছে। কোন ঠিকানা রেখে যায়নি।'

তারমানে আমার শেষ আশাটুকুও গেল। ওখান থেকে ডেস্কে এসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। অফিসটা দেখিয়ে দেয়া হলো আমাকে। মাঝারি উচ্চতার, শান্তকণ্ঠ, একজন ধূসর চুলের মানুষ তিনি।

'আপনার জন্যে কী করতে পারি, মিস্টার কেইন?' মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস

করলেন তিনি।

সব কথা তাঁকে খুলে বললাম। তিনি শুনলেন। সারাক্ষণ বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখলেন হাত দুটো। আমার কথা শেষ হলে জানতে চাইলেন তিনি কী করতে পারেন।

'আপনি কী করতে পারেন আমি জানি না,' আন্তরিকভাবেই জবাবটা দিলাম।

'আমি নিজেও জানি না কী করতে পারব,' বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'গেস্টরা যাতে তাদের টাকাপয়সা ও মূল্যবান জিনিসপত্র রাখতে পারে এজন্যে একটা সেফ রেখে দিয়েছি আমরা। ভাল করে দেখলে দেখতে পাবেন: আমরা লিখে দিয়েছি টাকাপয়সা ও দামি জিনিসপত্র হোটেল কর্মচারীর হাতে দিয়ে যদি রশিদ বুঝে না নেন তো হোটেল কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। আপনার মত এভাবে সবাই এসে যদি তাদের দুর্ভাগ্যের গল্প শোনায়, কী করতে পারি আমরা বলুন? লোকে জুয়া খেলে কিংবা অন্য কিছু করে সমস্ত টাকাপয়সা খুইয়ে এসে আমাদের বলে কিছু একটা করতে। এই হোটেল আমাদের ব্যবসা, এর আয় থেকে আমাদের বেতন আসে। লোকের উপকার করতে গিয়ে লোকসান দিতে থাকলে চাকরি খোয়াব। যাকগে, হোটেলের বিল পরিশোধ করার মত টাকা আছে আপনার কাছে?'

'না,' জবাব দিলাম। 'আপনাকে তো বলেছি, কুত্তিটা আমাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেছে।'

মাথা নাড়তে নাড়তে আফসোস করে বললেন তিনি: 'বড়ই দুর্ভাগ্য।'

'জানি,' আমি বললাম। 'আমি একটা চাকরি জোগাড় করে যতদিন না আপনাদের বিল পরিশোধ করতে পারি, ততদিন সময় দিতে পারেন আমাকে? কথা দিচ্ছি, প্রতিটি পাই শোধ করে দেব আমি।'

হেসে উঠলেন তিনি। 'চাকরি পাওয়া যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার, জানা আছে আপনার, মিস্টার কেইন? আর আপনি যে রুমে উঠেছেন, ওটা যথেষ্ট দামি রুম। প্রতিদিনের ভাড়া সাড়ে তিন ডলার। না, আপনাকে সময় দিতে মালিক কোনমতেই রাজি হবেন না।'

'তাহলে কাজ দিন আমাকে, শ্রম দিয়ে শোধ করে দিই,' বললাম।

'উঁহুঁ, তা-ও সম্ভব না,' তিনি বললেন। 'এমনিতেই আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় কর্মচারী বেশি। এ সপ্তাহেই কয়েকজনকে ছাঁটাই করতে হবে আমাকে।'

'হুঁ,' আমি বললাম: 'তাহলে আমার বোঝা দরকার কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। কী করতে হবে আমাকে?'

'জানি না,' তিনি বললেন। 'তবে অবস্থা যা বুঝতে পারছি, তাতে এক্ষুণি ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে আপনাকে। আপনার কাপড়-চোপড় সব রেখে যেতে হবে, পরনের কাপড় বাদে বাকি সব। বিল মেটাতে যদি না পারেন, ওগুলো বিক্রি করে দেব আমরা।'

প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। উঠে দাঁড়ালাম। রাগের চোটে গালি বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। বললাম: 'বাহ্, সাহায্য চাইতে আসা একজন মানুষের সঙ্গে আচরণের কী ছিরি। আপনাকে ঠকাতে চাইলে জিনিসপত্র নিয়ে স্রেফ বেরিয়ে যেতে পারতাম, তারপর যা বোঝার আপনি বুঝতেন। আমি আসলে সে-রকম ঠগবাজিটা করতে চাইনি, তাই

সুযোগটা পেয়ে গেলেন।'

আমাকে থামানোর চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু আমি চেঁচিয়ে উঠলাম: 'আমার জিনিসপত্র নিয়ে আমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাচ্ছি, দেখি আপনি কী করে ঠেকান! বাধা দেয়ার চেষ্টা যদি করেন, সারা শহরে বদনাম গেয়ে বেড়াব আপনার হোটেলের, বলব কীভাবে টেলিগ্রাফ অপারেটর দিয়ে এখানকার গেস্টদের সর্বস্বান্ত করা হয়।' বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এগোলাম।

দরজার কাছে আমাকে ঠেকালেন তিনি। 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, মিস্টার কেইন। এত উত্তেজিত হবেন না। ধরা যাক, আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আপনাকে চলে যেতে দিলাম, তারপর সব ভুলে গেলাম আমরা!'

'যাব তো বটেই!' আমার রাগ সামান্য কমলেও একেবারে গেল না। 'ভুললে আপনি ভুলবেন, আমি না!' দড়াম করে পিছনে লাগিয়ে দিলাম দরজাটা। আমার ঘরে গিয়ে জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলাম। সবকিছু নিয়ে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম, এলিভেটরে করে নেমে এলাম নীচে।

বেরিয়ে এলাম হোটেল থেকে। কোণের নিউজস্ট্যান্ডের কাছে থামলাম। একটা পত্রিকা কিনলাম। বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলাম: 'সস্তায় ভাল কোনও রুমিং হাউসের খোঁজ দিতে পারেন?'

'পারি,' বলে এক টুকরো কাগজে আমাকে একটা ঠিকানা লিখে দিল লোকটা। ওখান থেকে মাত্র কয়েক ব-ক দূরে। হেঁটে চললাম। সপ্তাহে সাড়ে তিন ডলার ভাড়ায় একটা ঘর নিলাম। দুই সপ্তাহের ভাড়া অগ্রিম দিতে হলো। গুনে দেখলাম খুচরো-টুচরো মিলিয়ে আমার কাছে আর তিন ডলার আশি সেন্ট বাকি আছে। আমার জিনিসপত্র সব ড্রেসারে ভরে রাখলাম। হোটেলের ঘরটার তুলনায় এটাকে একটা আস্তাকুড় বলা যায়। তবে আগামী দুই সপ্তাহের জন্য মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পেলাম এটা ভেবেই সন্তুষ্ট আমি।

পরদিন সকালে উঠেই চাকরি শিকারে বেরোলাম। আমার ভাগ্য ভাল। সেন্টার স্ট্রিটের বড় বাজারটায় একটা কাজ পেয়ে গেলাম, মুদি আর মাংস ডেলিভারি দেয়ার কাজ, সপ্তাহে চোদ্দ ডলার বেতন। পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরলাম। বিছানায় ছড়িয়ে দিলাম দেহটা। বিভিন্ন জায়গা থেকে মালের অর্ডার নিয়ে সেগুলো সরবরাহ করার জন্য চরকির মত পাক খেয়ে ফিরতে হয়েছে সারাটা দিন, অথচ গত কয়েক মাস শরীরটাকে তেমন খাটাইনি। বিছানা থেকে নেমে হিসেব করতে বসলাম যে টাকা পাব তাতে কীভাবে চলবে। এক টুকরো কাগজ নিয়ে পেন্সিল দিয়ে লিখলাম: ভাড়া ৩ ডলার + খাবার ৭ ডলার = ১০ ডলার। বাকি থাকে ৪ ডলার।

১ ডলারেই সারাদিনের খাবার হয়ে যাবে। সকালের নাস্তা কফি ও একটা রোল। লাঞ্চে স্যান্ডউইচ ও কফি, কিংবা সুপ ও কফি। আর রাতের খাবার কোনও ক্যাফেটিরিয়ায় সেরে নিতে পারব। আবার শুয়ে পড়লাম বিছানায়। উদ্বেগ চলে গেছে। চালিয়ে নিতে পারব।

কিন্তু একটা জিনিস আমি হিসেবে আনিনি।

তিন

সকাল সাতটায় কাজে আসি আমি। আমার প্রথম কাজ হলো সকালের অর্ডারগুলো সাপ-াই দেয়া। আগের রাতেই তালিকা করে রাখে ক্লার্ক, আমি সেই তালিকামত মাল ঠেলাগাড়িতে নিয়ে বেরোই, জায়গামত পৌঁছে দিই। চাকরিটা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। টিকে থাকা যাচ্ছে, সেইসাথে চার ডলার করে জমাতে পারলে কিছুদিনের মধ্যেই পূর্ব অঞ্চলে যাওয়ার মত টাকা আমি জমিয়ে ফেলতে পারব। আমার বিশ্বাস, ওখানেই আমার আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজে পাওয়া যাবে।

কিন্তু দুদিন পরেই কেঁচে গেল পুরো ব্যাপারটা। ঠেলাগাড়িতে মাল নিয়ে বেরোনোর সময় অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম, মাথা ঝিমঝিম করছে। অনুমান করলাম খাবারেই সমস্যা ছিল। মনে হলো কাত হয়ে যাচ্ছে ফুটপাত। ক্রমেই নিজেকে খাড়া রাখা শক্ত হয়ে উঠল। ঠেলাগাড়ির হাতল হাত থেকে ছুটে গেল। একটা বাড়ির দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালাম। বোকার মত তাকিয়ে দেখছি ঠেলগাড়ি থেকে ডিমগুলো পড়ে ভেঙে গেছে, দুধের বোতল ছড়িয়ে আছে সারা রাস্তায়। আমি ঘামছি। গায়ে বল পাচ্ছি না। মরিয়া হয়ে নিজেকে খাড়া রাখলাম। মাটিতে পড়া চলবে না। বনবন করে মাথা ঘুরছে। রাস্তাটা ওঠানামা করছে চোখের সামনে।

দৌড়ে এল মালিক। মালগুলোর দিকে তাকাল। তারপর তাকাল আমার দিকে। আমার মুখ নিশ্চয় সাদা হয়ে গেছে। কপালের ঘাম বিন্দু বিন্দু হয়ে চোখের পাতা বেয়ে পড়ছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে কোনরকম সাহায্য করল না ও। কথা বলার চেষ্টা করলাম। দুর্বোধ্য কিছু শব্দ বেরোল শুধু।

'ভিতরে এসে বোসো, শান্ত করো নিজেকে,' বলে ঘুরে আবার দোকানের দিকে রওনা হলো বস।

অসহায় দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। আবার কথা বলার চেষ্টা করলাম। এবারও পারলাম না। দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে অসহায়ভাবে বসে থাকতে থাকতে আশা করলাম জ্ঞান না হারালেই হয় এখন। রাগ, লজ্জা, অবমাননা আমার ভিতরটাকে যেন জ্বালিয়ে দিতে লাগল। ওই বস কুত্তার বাচ্চাটা ভেবেছে আমি মাতাল! কাঁদতে ইচ্ছে করছে আমার। কিন্তু সময় নেই। নিজেকে বাঁচাতে হবে। রাস্তার ওই ওঠানামা বন্ধ করতে হবে চোখের সামনে থেকে। সার্কাসের দড়ির ওপর দিয়ে যেন হাঁটছি আমি, সামান্য এদিক ওদিক হলেই মাটিতে পড়ে যাব। ধীরে ধীরে বসে পড়লাম মাটিতে। দুই হাতের ওপর মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে লাগলাম। চোখ বুজলাম যাতে রাস্তার ভয়ানক ওঠানামাটা দেখতে না হয়। ওটার কথা ভাবতে চাইলাম না, ভাবতে চাইলাম না কোন কিছুই।

অবশেষে কেটে গেল আঘাতটা। সামান্য ভাল বোধ করলাম। মাথা সোজা করে

চোখ মেললাম। চেপে রাখা আবেগ গরম পানি হয়ে বেরিয়ে এল দুই চোখে। দপ্‌দপ্‌ করে মাথা ব্যাথা শুরু হয়েছে। আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে রাস্তাটা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। গা কাঁপছে এখনও। দুই হাতে বাড়ির দেয়াল ধরে দোকানের দরজার দিকে এগোলাম। আমি ভিতরে ঢুকতেই পড়ে থাকা আবর্জনা মুছতে দৌড়ে বেরিয়ে গেল একজন ক্লার্ক। বসের কাঁচে ঢাকা ছোট খুপরিমত অফিসটায় ঢুকলাম।

দাঁড়িয়ে আছে ও। 'মিস্টার রোজারস,' বলতে গেলাম।

'এই যে তোমার পাওনা, কেইন,' পাঁচটা ডলার আমার দিকে বাড়িয়ে দিল বস।

আস্তে করে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলাম। গা নড়াতে কষ্ট হচ্ছে। গুনে নিয়ে বললাম: 'কিন্তু মিস্টার রোজার, এখানে তো পাঁচ ডলার। আমি তিন দিন কাজ করেছি, সাত ডলার হয়।'

'জিনিস যা নষ্ট করেছ তার দাম কেটে রেখেছি,' আমার দিকে পিছন করে দাঁড়াল সে।

টাকাটা পকেটে ভরলাম, বোকা লাগছে নিজেকে। হাঁটতে শুরু করেও ফিরে তাকালাম। 'মিস্টার রোজারস, আমি মাতাল হইনি। অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম।'

জবাব দিল না সে। আমার কথা বিশ্বাস করেনি।

'আমি সত্যি বলছি, মিস্টার রোজারস!' আমার গলা কাঁপছে। 'আমার মাথা ঘুরে উঠেছিল...'

'অসুস্থ হলে আর কাজ করবে কীভাবে,' আমার দিকে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। 'যাও, ভাগো এখন। আমার সময় নষ্ট কোরো না।'

বুঝলাম, আমাকে বিশ্বাস করেনি সে। অফিস থেকে বেরিয়ে ক্লার্কদের পাশ কাটিয়ে এসে আমার অ্যাপ্রন আর জ্যাকেটটা তুলে নিলাম। চোখের কোণ দিয়ে আমাকে বেরিয়ে যেতে দেখল ওরা। ওদের কারও সঙ্গে খাতির হয়নি আমার, সময়ই পাইনি। তাই ওরাও মিস্টার রোজারের মতই ভাবছে আমি মাতাল।

সোজা বাসায় ফিরে এলাম। সেদিনই আরেকটা চাকরি খোঁজার মত শরীরের অবস্থা নেই। তা ছাড়া বিচিত্র এক লজ্জা আমার মনকে চেপে রেখেছে। মনে হচ্ছে রাস্তার সবাই যেন আমাকে তাকিয়ে দেখছে অদ্ভুত দৃষ্টিতে। বাকি দিনটা ঘরের মধ্যেই কাটালাম। খিদে পাচ্ছে না, খাওয়ার রুচিও নেই।

*

পরদিন সকালে আবার বেরোলাম। কিন্তু সেদিন কোন চাকরিই পেলাম না। পরদিনও পেলাম না, তার পরদিনও না। হাতের টাকা ফুরিয়ে আসছে। খাওয়া কমিয়ে দিলাম, দিনে মাত্র একবার খুব সাধারণ খাবার খাই। পরের সপ্তাহের মাঝামাঝি এসে ভেঙে পড়লাম। সামনে রোববার। সেটা পেরোলেই সাড়ে তিন ডলার ভাড়া গুনতে হবে আমাকে।

রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ভাবনাটা এল মাথায়। নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে হবে আমাকে। ওই শহরটা আমার চেনা। ওখানে আমার বন্ধু আছে, পরিচিত লোক আছে।

ওরা আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। বাসায় ফিরে এলাম। সব কাপড় জড় করলাম। নতুন পুরানো, সব নিয়ে ভরলাম চামড়ার ব্যাগটায়। নীচে নেমে বাড়ির মালকিনকে বললাম আগামী সপ্তায় আমি ঘর ছেড়ে দিচ্ছি।

জিনিসপত্র বন্ধক রাখে এমন একটা দোকানের খোঁজ করলাম। মেইন স্ট্রিটের শেষ মাথায় পাওয়া গেল ওরকম একটা দোকান। ভিতরে ঢুকে ব্যাগটা রাখলাম কাউন্টারে। চশমা পরা এক বুড়ো এসে দাঁড়াল। 'এগুলোর জন্যে কত পাওয়া যেতে পারে, আঙ্কেল?' ব্যাগ খুলে ভিতরের জিনিসগুলো দেখালাম।

নতুন সুটগুলো বের করে সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখল সে। তারপর রেখে দিল। 'হবে না। চোরাই মালের ব্যবসা করি না আমি।'

'আঙ্কেল,' আমি বললাম: 'এগুলো চোরাই নয়। কিছুদিন আগে কিনেছি। কিন্তু আমার সমস্ত টাকা খোয়া যাওয়ায় না পরেই বেচে দিতে বাধ্য হচ্ছি।'

'রশিদ আছে?' বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

আমার টাকার ব্যাগ খোঁজাখুঁজি করে একটা রশিদ পেলাম। ওটা দেখালাম তাকে। দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বলল: 'প্রতিটি সুটের জন্যে পাঁচ ডলার করে দিতে পারি তোমাকে, শার্টের জন্যে পঞ্চাশ সেন্ট।'

'বলেনি কী! প্রায় বিশ ডলার করে কিনেছি একেকটা, কয়েক দিন আগে, আর আপনি মাত্র পাঁচ ডলার দিতে চান।'

'ব্যবসা খারাপ,' হাত নেড়ে বুড়ো বলল। 'আর সুটের তো কোন দামই নেই।'

জিনিসগুলো আবার ব্যাগে ভরতে শুরু করলাম।

'এক মিনিট,' বুড়ো বলল। 'তুমি জিনিসগুলো বিক্রি করতে চাও না বন্ধক রাখতে চাও?'

'বিক্রি করতে চাই,' ভরা শেষ হয়নি তখনও আমার। 'এই ব্যাগটাও বিক্রি করব। আমি শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'তাহলে,' ও বলল: 'আমি তোমাকে সুটের জন্যে সাড়ে সাত–যেহেতু আমাকে আটকে রাখতে হবে না, আর ব্যাগটার জন্যে আড়াই দিতে পারি।'

দরদাম করে শেষে তিরিশ ডলার এবং একটা ডেনিম ওঅর্ক প্যান্ট ও একটা শার্টের বিনিময়ে সমস্ত জিনিস দিয়ে দিতে রাজি হলাম। পিছনের একটা ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে নিলাম। তারপর সমস্ত জিনিসপত্র এমনকী পরনের আগের কাপড়টাও বুড়োকে দিয়ে টাকা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কাছের একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে ভাল খাবার খেলাম। খাওয়া শেষ করে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে একটা সিগারেট ধরালাম। ফিরে এলাম বাসায়, অনেকটা ভাল বোধ করছি এখন। ওপরতলায় ঘরে চলে এলাম ঘুমানোর জন্য।

পরদিন সকালেই আমি চলে যাব ফ্রেইট ইয়ার্ডে। সেখান থেকে বাড়ি রওনা হব, ফিরে যাব নিউ ইয়র্কে।

চার

যাত্রাটা খুব কঠিন কিছু না। আমার মত আরও অনেকেই কোন না কোন কারণে একই ট্রেনে করে চলেছে। কেউ যাবে বাড়িতে কিংবা কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানায়, আবার কেউ চলেছে নতুন জায়গায় কাজের সন্ধানে। ছন্নছাড়া, ভাসমান, শিকড়হীন মানুষের অভাব নেই, তারা কোথায় যাবে জানে না।

এরাও আর সব মানুষের মতই, কেউ কেউ ভাল, আন্তরিক; কেউ কেউ জঘন্য, নীচ স্বভাবের, তবে তাতে আমার কোন অসুবিধে হলো না। আমি আমার নিজের মত রইলাম, অন্যের ব্যাপারে নাক গলালাম না, এক ট্রেনে বেশি সময় রইলাম না, বার বার ট্রেন বদল করলাম। নতুন কোনও শহরে নেমে ট্রেনের দেরি থাকলে সস্তা হোটেলে উঠে ভাল খাবার খেয়ে এক দেড় দিন কাটিয়ে দিলাম।

হবকেনে যখন নামলাম আমার পকেট প্রায় শূন্য। নদীর অন্য পাড়ে নিউ ইয়র্ক শহর। টাকা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। আমি জানি, কোন না কোনভাবে কাজ আমি জোগাড় করেই ফেলতে পারব।

ফ্রেইট ইয়ার্ড থেকে ফেরি চার ব-ক দূরে। ট্রেন থেকে নামার সময় ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল, ফেরিতে পৌঁছতে পৌঁছতে তুষারপাত শুরু হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তখন। কাজ থেকে বাড়ি ফিরছে মানুষ। ফেরিতে করে নিউ ইয়র্কে যত গাড়ি যাচ্ছে তার বেশির ভাগই ট্রাক। একটা ট্রাকের পিছনে উঠে লুকিয়ে রইলাম। ট্রাকটা অন্য পাড়ে ভিড়লেই চুপি চুপি আবার নেমে পড়ব।

ফেরি ছাড়তেই ঢেউয়ের দুলুনি টের পেলাম। পানির শব্দ কানে আসছে। মুখ বের করে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। নিউ ইয়র্ক শহর চোখে পড়ল না। দেখা গেল শুধু তুষারের সাদা চাদর, আকাশ থেকে সোজা নেমে এসেছে পানিতে।

ডকের কিনারে ফেরি ভিড়লে যখন নিউ ইয়র্ক শহরের উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলোর আলো চোখে পড়ল, বিচিত্র এক স্বস্তি বোধ করতে লাগলাম–মনে হলো, হ্যাঁ, বাড়ি ফিরে এসেছি, আমার আসল বাড়ি। একমাত্র এই শহরটি আর এর মানুষগুলোকেই শুধু আমি বুঝতে পারি।

ঘাটের সঙ্গে ফেরি বাঁধার শিকলের শব্দ শুনতে পেলাম। ডকের গেট খুলে গেল। ট্রাক থেকে নামলাম। একে একে ফেরি থেকে নামতে শুরু করল ট্রাকগুলো। জনতার ভিড়ে মিশে আমিও গেটের দিকে এগোলাম। ঠাণ্ডা লাগছে খুব, কিন্তু এতই উত্তেজিত হয়ে আছি এই ঠাণ্ডাকে আমল দিলাম না। ডেনিমের শার্ট-প্যান্ট খুব মোটা কাপড় দিয়ে তৈরি হলেও এই ধরনের আবহাওয়ার জন্য উপযুক্ত নয়। যাই হোক, এটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না।

ফোরটি-সেকেন্ড স্ট্রিটে ফেরি ভিড়েছে। সরাসরি হেঁটে টাইম স্কোয়ারে এসে

দাঁড়ালাম, হাঁ করে দেখতে লাগলাম টাইম বিল্ডিংটাকে, নিউ ইয়র্কে নতুন আসা মানুষদের মত। উজ্জ্বল আলো দিয়ে বড় করে লেখা ফুটেছে: সেভেন পিএম, ফেব্রুয়ারি ১০, ১৯৩২।

হঠাৎ করেই খিদে চাগিয়ে উঠল আমার। একটা ক্যাফেটিরিয়ায় ঢুকে ভরপেট ভাল খাবার খেয়ে নিলাম। বিল মিটিয়ে দেয়ার পর দেখলাম মাত্র আর চলি-শ সেন্ট অবশিষ্ট আছে আমার কাছে। তবে উদ্বিগ্ন হলাম না। পচিশ সেন্ট ভাড়ায় বাউয়েরির খুব সাধারণ সস্তা একটা হোটেলে রাত কাটাতে উঠলাম। বাকি রইল মাত্র আর পনেরো সেন্ট। ঘুমানোর আগে মুচকি হাসলাম। এটা আমার শহর। এখানে আমার টাকার সমস্যা হবে না।

ঘুম যখন ভাঙল তখনও তুষার পড়ছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে সিক্সথ অ্যাভেনিউর অ্যাজেন্সিতে চললাম কাজের খোঁজে। রাস্তার প্রায় প্রতিটি মোড়েই ওভারকোট পরা মানুষকে দেখলাম, কোটের কলার ওপরে তুলে দেয়া, মাথায় ক্যাপ। মাঝারি আকারের টিনের ক্যানে আগুন জ্বালানো। মাঝে মাঝেই সেই আগুনে হাত গরম করছে লোকগুলো। সবার সামনেই একটা করে বাক্স, তাতে আপেল রাখা, আর তার ওপরে সাইন লেখা: একজন অসহায় বৃদ্ধ মানুষের কাছ থেকে একটি আপেল কিনুন।

সেরাতে আমি একটা বাড়ির বারান্দায় রাত কাটালাম। সকালে জেগে উঠে দেখি তুষারপাত থেমে গেছে। কিছু কিছু দোকানের সামনে এত উঁচু হয়ে বরফ জমেছে, ফুটপাত বন্ধ হয়ে গেছে। আর সবখানেই নারী-পুরুষ মিলে বেলচা দিয়ে সেই বরফ ঠেলে নিয়ে গিয়ে নর্দমায় ফেলার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে।

মোড়ের নিউজস্ট্যান্ডটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। পত্রিকার হেডলাইন পড়লাম। লিখেছে: বরফ পরিষ্কার করতে অন্তত ৩০,০০০ শ্রমিক লাগবে। দেখে একটা বুদ্ধি এল মাথায়। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে রোল আর কফি দিয়ে নাস্তা সারলাম।

তারপর এইট্থ্ স্ট্রিটের ডিপার্টমেন্ট অভ স্যানিটেশন অফিসে গেলাম বরফ সরানোর কাজ জোগাড় করতে। গিয়ে দেখি এক ব-ক সমান লম্বা লাইন হয়ে আছে, সবাই কাজ চায়। আর বেড়েই চলেছে সে-লাইন। সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে থার্ড অ্যাভেনিউ এল-এর দিকে হেঁটে চললাম। কিন্তু গিয়ে দেখি গেট বন্ধ। তখন পকেটের শেষ পয়সাটি খরচ করে ট্রেন ভাড়া দিয়ে চলে এলাম শহরের আবাসিক এলাকায়।

ওয়ান টোয়েন্টি ফিফ্থ্ স্ট্রিটে ট্রেন থেকে নামলাম আমি। ওয়ান টোয়েন্টি সিক্সথ্ স্ট্রিটের একটা অফিসে গিয়ে অবশেষে কাজ পেলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো রাস্তা পরিষ্কারের কাজে। আমাদের পনেরো জনের দলনেতা লোকটি একজন ইটালিয়ান, শরীর দেখেই বোঝা গেল ভাল খায়দায়। ওর দিকে অনেকটা হিংসের চোখেই তাকাতে লাগলাম আমরা, বুঝতে পারলাম না ভাল খাওয়ার জন্য নিয়মিত কাজ ও টাকা কোথায় পায় সে।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী?' লোকটা বলল। 'এসো এসো, কাজে লেগে পড়ো।'

আমার হাতে তুষার সাফ করার বড় আকারের বেলচা। সেটা কাঁধে ফেলে সবার

সঙ্গে এগিয়ে চললাম। ওয়ান থারটি ফিফ্‌থ্‌ স্ট্রিটে অ্যামস্টারডাম অ্যাভেনিউতে এসে থামলাম আমরা।

বড় বড় ট্রাক সামনে-পিছনে চলে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে রাস্তা থেকে বরফ সরানোর কাজে ব্যস্ত। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মানুষেরা। ট্রাকের মেশিনের ঠেলায় আলগা হয়ে যাওয়া তুষার বেলচা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ম্যানহোলে ফেলছে ওরা। ব-কের শেষ মাথায় বেলচা দিয়ে তুষার তুলে ট্রাকের পিছনে ভরছে আরেক দল মানুষ।

আমাদের ইটালিয়ান দলনেতা আমাদেরকে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে এল, যেখানে শ্রমিকরা ম্যানহোলে বরফ ফেলছে। ইটালিয়ান ভাষায় অন্য দলের নেতাকে কিছু বলল। ওই লোকগুলো তখন বেলচা হাতে পাহাড়ের ঢালের দিকে হেঁটে চলে গেল।

আমার কাজ ম্যানহোলের কাছে তুষার ঠেলে নিয়ে যাওয়া। সেখানে কিছু মানুষ অপেক্ষা করছে সেই তুষারকে ম্যানহোলে ফেলার জন্য। ফোরম্যান যখন বুঝল আমরা ঠিকমতই কাজ করতে পারছি, রাস্তার মাথার দিকে চলে গেল ও, যেখানে মস্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, কাজের তদারকি করার জন্য সরকারি কয়েকজন কর্মচারীও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। আগুনের আঁচে শরীর গরম করতে করতে হুকুম চালাচ্ছে শ্রমিকদের ওপর। আমার পাশে দুজন লোক কাজ করছে। একজন আইরিশ, অন্যজন একজন গাঁট্টাগোট্টা নিগ্রো। বেশির ভাগ লোকের পরনেই জ্যাকেট, সোয়েটার কিংবা কোট, হাতে দস্তানা। আমি ঠাণ্ডা ততটা টের পাচ্ছি না, তবে খুব দ্রুতই আড়ষ্ট হয়ে এল আমার হাত, পায়ের জুতো ভিজে গিয়ে ঠাণ্ডা ঢুকতে শুরু করল ভিতরে। একটা সময় হাত এতটাই ঠাণ্ডা হয়ে গেল, বেলচা ধরে রাখতে পারলাম না। হাত গরম করার জন্য অগ্নিকুণ্ডটার কাছে গেলাম, যেখানে সরকারি লোকেরা রয়েছে। ওদের দিকে এগোতে দেখে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা, আর আমার ফোরম্যান সিগারেট টানতে টানতে তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকাল।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল ও: 'কাজ থামিয়ে চলে এলে যে?'

হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম: 'ঠাণ্ডায় জমে গেছে।'

আগুনের ওপর হাত দুটো মেলে ধরলাম। পকেট থেকে একজোড়া পুরানো দস্তানা বের করে দিল আমাকে ফোরম্যান।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে দস্তানা দুটো পরে নিলাম।

বেশ কয়েকটা ফুটো আছে ওগুলোতে, তবে হাত গরম হলো, আরাম পেলাম। আগুনের কাছ থেকে সরে এসে বেলচা তুলে নিয়ে আবার কাজে লাগলাম।

ঘণ্টাখানেক পর মিক নামে একটা লোক বলল: 'আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই লাঞ্চের সময় হবে।' আগুনের কাছে দাঁড়ানো ঈর্ষাকাতর চোখে তাকিয়ে লোকটা বলল: 'বসেরা আসুক, আরাম করা বেরোবে।'

লোকটার কথা ঠিক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুজন উচ্চপদের কর্মচারী এসে হাজির হলো সেখানে। গাড়ি থেকে নাক বের করল একজন। সঙ্গে সঙ্গে যেন সাড়া পড়ে গেল কর্মচারীদের মধ্যে। আমাদের ফোরম্যান সহ সব কজন কর্মচারী চেঁচামেচি করে,

আদেশ দিয়ে, ছুটাছুটি করে এমন কাজ দেখানো শুরু করল, যেন ওদের চেয়ে কাজের লোক আর হয় না।

এক সময় বাঁশি বাজিয়ে আমাদের ফোরম্যান বলল: 'হয়েছে, ছেলেরা, এবার বেলচা রেখে লাঞ্চ সেরে নাও।'

ঘুরে, হেঁটে আরেকদিকে চলে গেল ও।

পকেট থেকে লাঞ্চের প্যাকেট বের করে শ্রমিকরা রাস্তার ধারের বিভিন্ন বাড়ির বারান্দায় গিয়ে খেতে বসল। বাকিরা গেল কাছের সস্তা রেস্টুরেন্ট কিংবা লাঞ্চ কাউন্টারগুলোতে।

দুটো প্রায় বাজে তখন। আমি কিছুদূর হেঁটে এসে একটা শূন্য বাড়ির দরজা দেখে ভিতরে ঢুকে পড়লাম ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য।

ভিতরবারান্দা ধরে হেঁটে এসে বসলাম সিঁড়ির গোড়ায়। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালাম। আরাম করে বসার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কাঁপুনি উঠে গেল শরীরে। আমি যে খুব ক্লান্ত হয়েছি কিংবা খিদে পেয়েছে, তা নয়, কাজ না করে বসে থাকাতে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, শীতও বেশি লাগছে।

কয়েক মিনিট পর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল আমার সঙ্গে কাজ করছিল যে দুজন তাদের একজন, সঙ্গে আমার বয়েসী একটা নিগ্রো ছেলে। বারান্দায় আলো এত কম, প্রথমে দেখতেই পায়নি ওরা আমাকে।

দুজনের মধ্যে বয়েসে বড় লোকটা জিজ্ঞেস করল: 'মা লাঞ্চের জন্যে কী পাঠিয়েছে, স্যাম?'

'সুপ, স্যান্ডউইচ আর কফি,' ছেলেটা জবাব দিল।

'আরে, সাংঘাতিক খাবার! খিদেয় আমার পেট জ্বলছে,' লোকটা বলল। 'চলো, ওই সিঁড়িতে বসে খাওয়া যাক।'

আমার দিকে এগিয়ে এল ওরা। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'তুমি এখানে কী করছ?' লোকটা জিজ্ঞেস করল।

'সিগারেট খাচ্ছি,' জবাব দিলাম।

'লাঞ্চ খাওনি?'

'আমার খিদে নেই।'

আমার পাশে সিঁড়িতে বসল ওরা। কাগজের পোঁটলা ছিঁড়ে দুটো দুধের বোতল বের করল লোকটা। একটাতে আধ বোতল সুপ, আরেকটাতে কফি। আর কয়েকটা স্যান্ডউইচ। গরম সুপের গন্ধে জিভে জল এসে গেল আমার।

'খুব পরিশ্রম গেছে তোমাদের, তাই না?' স্যাম জিজ্ঞেস করল।

'না, স্যাম,' লোকটা জবাব দিয়ে আমার দিকে ঘুরল। স্যামকে দেখিয়ে বলল: 'ও আমার ছোট ভাই। আমার জন্যে লাঞ্চ নিয়ে এসেছে।'

'ভাল,' জবাব দিলাম।

বোতল থেকে সুপ খেতে শুরু করল লোকটা। মাথা কাত করে, মুখ হাঁ করে

বোতলের মুখটা এমন করে মুখের ওপর ধরল, আপনাআপনি তরল সুপ গলায় চলে যেতে থাকল। বড় বড় ঢোকে গিলতে লাগল সে। ওদেরকে ভাল করে বসার জায়গা দেয়ার জন্য আমি কয়েক ধাপ ওপরে উঠে গেলাম। স্যাম আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তাই লোকটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম, যাতে আবার ভেবে না বসে ওর খাওয়া দেখছি আমি। আঙুলে গরম ছ্যাঁকা লাগতে দেখি সিগারেটটা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। না নিভিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলাম এক দিকে। কোথায় পড়ল তা-ও দেখার চেষ্টা করলাম না।

যেন নীরব কোনও ভাষায় ছেলেটার বলা কথাতে আমার দিকে ঘুরে তাকাল লোকটা। 'নাহ্, যতটা খিদে লেগেছে ভেবেছিলাম, ততটা লাগেনি।' বলে ছেলেটার দিকে তাকাল। 'আমাকে অনেক বেশি দিয়ে ফেলেছ। এত খেতে পারছি না।' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল: 'এই, তুমি এসে খাও না? খাবার নষ্ট করাটা ভাল কাজ না।'

কোন কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। তারপর ওর বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে বোতলটা নিলাম। 'থ্যাংকস,' বিড়বিড় করে বললাম। তারপর সুপ খেতে শুরু করলাম। কীসের সুপ, কী দিয়ে বানানো, জানি না, তবে স্বাদটা ভাল। আমার সুপ খাওয়া তখনও শেষ হয়নি, একটা স্যান্ডউইচ আমার দিকে বাড়িয়ে দিল লোকটা। কোন কথা না বলে নিয়ে নিলাম। সুপ আর স্যান্ডইচের সঙ্গে কফির ভাগও পেলাম আমি।

কফি খাওয়া শেষ করে পকেট থেকে তিনটে সিগারেট বের করলাম। একটা নিজের ঠোঁটে লাগিয়ে বাকি দুটো ওদেরকে দিতে গেলাম।

মাথা নাড়ল ছেলেটা, সিগারেট নিল না। লোকটা বলল: 'ও হাই স্কুলে যাচ্ছে, ট্র্যাক টিমে যোগ দেবে।' নিজে একটা সিগারেট নিল সে।

ওর সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে আমারটা ধরালাম। তারপর আরাম করে টানতে লাগলাম।

'নিউ ইয়র্কে কতদিন আছো?' লোকটা জিজ্ঞেস করল আমাকে।

'মাত্র গতকাল এসেছি,' জবাব দিলাম।

'ভয়ানক ঠাণ্ডা আজকে!' লোকটা বলল।

ঘোঁতঘোঁত করে কোনমতে বললাম: 'অ্যাঁ? হ্যাঁ।'

'আমার নাম টম হ্যারিস,' ও বলল।

আমিও আমার নাম জানালাম ওকে। তারপর আর কিছু না বলে চুপচাপ বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম আমরা। তারপর রাস্তা থেকে ভেসে এল হুইসেলের শব্দ।

'আমাদের ডাকছে,' টম বলল। 'চলো যাই।' আমি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছি, এ সময় স্যামকে বলল ও: 'তোমার কোটটা ওকে দিয়ে দাও। তুমি তো বাড়িতেই বসে থাকবে, ওটা তোমার না হলেও চলবে। রাতে আমি ওটা নিয়ে আসব।'

কোন কথা না বলে গা থেকে কোটটা খুলে আমাকে দিল স্যাম। আমি পরে নিলাম। ওকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। রাস্তায় বেরিয়ে দেখি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু

করে দিয়েছে অন্যান্য শ্রমিকরা।

সকালের চেয়ে যেন দ্রুত কেটে গেল বিকেলটা। আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ছুটির আগে টম জিজ্ঞেস করল: 'কোথায় উঠেছ?'

জবাব দিলাম: 'এখনও কোন জায়গা ঠিক করিনি।'

'তাইলে আমাদের ওখানেই চলে এসো না। বেতন পেতে আরও দুদিন। দুই রাত আমাদের ওখানেই থাকো।'

'বাড়তি ঘর নেই নিশ্চয়,' দুর্বল কণ্ঠে বললাম।

টম জবাব দিল: 'আমাদের ঘরটা অনেক বড়, থাকতে অসুবিধে হবে না।'

হঠাৎ করেই দিনটা শেষ হয়ে গেল। অফিসে গিয়ে ফোরম্যানের কাছে আমাদের যন্ত্রপাতি জমা দিলাম। নিগ্রো লোকটা আমার কাঁধে টোকা দিয়ে ইশারা করল। আমি ওর সঙ্গে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্সথ্ স্ট্রিটে গেলাম। সেখানে কনভেন্ট আর সেইন্ট নিকোলাস স্ট্রিটের মাঝামাঝি মস্ত একটা বাড়ি আছে। মৃদু আলোকিত একটা ভিতরবারান্দায় ঢুকলাম আমরা। বাড়ির ভিতরের গন্ধই বলে দেয় ওটা নিগ্রোদের বাসস্থান। তিনটে সিঁড়ি পার হয়ে একটা অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলাম আমরা।

রান্নাঘরের দরজা খোলা। সেখানে একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, একটা ময়লা দেয়াল আলমারি, আর একটা কয়লার স্টোভ আছে। স্টোভের ওপর বড় পাত্রে কিছু রান্না হচ্ছে। ঘরের এককোণে দাঁড়ানো পঞ্চাশোর্দ্ধ একজন নিগ্রো মহিলা।

তাঁর কাছে গিয়ে টম বলল: 'মা, ও ফ্র্যান্সিস কেইন। ওর থাকার কোন জায়গা নেই, তাই আজ রাতে আমাদের সঙ্গে থাকতে নিয়ে এলাম।'

আমার কাছে এসে ভালমত দেখলেন আমাকে মহিলা, আমিও তাঁকে দেখলাম। বুঝতে পারলাম, মহিলার ওপর নির্ভর করছে আমার এখানে থাকা না থাকা।

পুরো একটা মিনিট আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি, তারপর বললেন: 'বসো, ফ্র্যাঙ্কি। আমাদের খাওয়ার সময় হয়েছে।'

তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে চেয়ারে বসলাম। খাওয়ার পরও ওখানেই বসে রইলাম। স্টোভের আগুনের উত্তাপ আমাকে নিদ্রালু করে তুলছে। চোখের পাতা এতটাই ভারি হয়ে এল, বার বার মাথা ঝাড়া দিয়ে ঘুম তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগলাম।

সাতটা বাজে তখন। মহিলা বললেন: 'টম, তোমার বন্ধুকে নিয়ে শুতে যাও। সাড়ে দশটায় তো আবার বেরোতে হবে তোমাকে।'

টমের দিকে তাকালাম। ও জানাল: 'রাতেও তুষার সরানোর কাজ করি আমি, ওয়ান টোয়েন্টি নাইন্থ্ স্ট্রিটে। ওরা জানে না দিনে আমি আরেকখানে কাজ করি। জানলে কাজটা দিত না। তুমি যাবে?'

'যাব,' জবাব দিলাম। 'থ্যাংকস।'

'ঠিক আছে, নিয়ে যাব তোমাকে,' ও হেসে বলল।

আশেপাশে কোথাও ছেলেটাকে দেখলাম না। স্যামের কথা জিজ্ঞেস করলাম ওর বড় ভাইকে। জানলাম, কাছেই একটা দোকানে সন্ধ্যাবেলা কাজ করে ও।

একটা ঘরে বড় একটা বিছানায় দুজনে শুতে গেলাম। আরেকটা ছোট বিছানা আছে ওখানে। টম আমাকে জানাল ওই বিছানাটায় ওর ছোট বোন থাকে।

কাপড় আর জুতো খুলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ঠিক পরক্ষণেই যেন মনে হলো আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে কেউ আর বলছে: 'ওঠো, উঠে পড়ো। কাজের সময় হয়ে গেছে।'

বহু কষ্টে চোখের পাতা মেলে উঠে বসলাম। ঘরে আলো নেই–দেয়ালের একটা কাটা জায়গা দিয়ে পাশের ঘর থেকে আলো আসছে। আধো ঘুমন্ত অবস্থায়ই কাপড় পরতে শুরু করলাম। আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে এলে দেখলাম পাশের বিছানাটায় একটা মেয়ে শুয়ে আছে। কম্বলের বাইরে শুধু মাথাটা বেরিয়ে আছে। ওর চোখের সাদা অংশটা দেখতে পাচ্ছি, আমাকে দেখছে। ঘর থেকে বেরোনোর আগে ওকে গুড নাইট বললাম। ও জবাব দিল না। টমের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। দুজনেই খাবারের প্যাকেট নিয়েছি। ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত একটানা কাজ করলাম। কাজ শেষে সোজা বাসায় ফিরে টমের সঙ্গে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সাড়ে আটটায় উঠে আবার চললাম দিনের বেলার কাজে।

পাঁচ

পুরো আড়াই দিন দুজনে একইভাবে কাজ করলাম আমরা। তারপর কাজ শেষ হলো। বেতন পেলাম। দ্বিগুণ বেতন, কারণ দুই জায়গায় কাজ করেছি। আমি পেলাম ১৭.৫০ ডলার। আর সেই টাকা পকেটে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় নিজেকে নিউ ইয়র্কের মহারাজা মনে হলো। আরও একটা ভরসা জন্মাল মনে, এই শহরে কাজ জোগাড় করা তত কঠিন নয়। বহু সপ্তাহ পর আবার আমি অন্যদের দিকে তাকানোর সুযোগ পেলাম–নিজেকে ওদের চেয়ে আলাদা করে তো ভাবলামই না বরং নিজেকে ওদের একজন ভেবে খুশি হলাম। ওদের মতই আমিও শ্রমিকের কাজ করেছি–সেটা যত কম সময়ের জন্যই হোক না কেন।

একটা বন্ধকীর দোকান থেকে এগারো ডলার দিয়ে একটা সুট, দুটো শার্ট, একটা ওভারকোট আর একজোড়া জুতো কিনলাম–সবই ব্যবহার করা। আমার পরনের পুরানো কাপড়গুলো ওই দোকানেই রেখে এলাম।

টমদের বাসায় এসে ওর মা মিসেস হ্যারিসকে থাকা-খাওয়ার টাকা দিতে চাইলাম, কিন্তু নিলেন না তিনি। বললেন, টাকাটা রেখে দিতে, আমার কাজে লাগবে।

দুপুর দুটোয় আমি আর টম শুতে গেলাম। ঘুম যখন ভাঙল, রাত ন'টা বাজে। উঠে খেতে বসলাম। এই সময় টমের বোন এল। ও দেখতে কেমন, এই প্রথম দেখলাম। বয়েস চোদ্দ, শক্ত কালো চুল কানের ওপর দিয়ে পিছনে টেনে আঁচড়ানো। মুখটা লম্বাটে। গায়ের চামড়া কালো নয়, গাঢ় বাদামী। ঠোঁটে গোলাপী লিপস্টিক। চওড়া কাঁধ, হাত-পা বেশ লম্বা লম্বা, কিছুটা পুরুষালী গোছের। টেবিলে বসে টমকে জিজ্ঞেস করল: 'তোমাদের কাজ কি শেষ?'

'অ্যাঁ?' দ্বিধা করে জবাব দিল টম: 'হ্যাঁ।'

'তাহলে এখন কী করবে?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেও বুঝতে পারলাম আমাকে উদ্দেশ্য করেই প্রশ্নটা করেছে।

টম জবাব দিল না।

'জানি না,' আমি বললাম। 'আমি এখন কী করব, কিছুই জানি না। তবে বসে থাকলে তো চলবে না, কাজ খোঁজার চেষ্টা করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকি দিয়ে মেয়েটা বলল: 'কাজ? কোথায় পাবে? কোথাও কাজ নেই।'

'কী জানি,' জবাব দিলাম। 'এই কাজটা তো খুব সহজেই পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'তোমার ভাগ্য ভাল ছিল। তবে বার বার ভাগ্য এত ভাল হবে না।'

'মা কোথায়?' টম জিজ্ঞেস করল বোনকে। আসলে কায়দা করে প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে চাইছে ও।

'স্যামকে নিয়ে মিটিঙে গেছে,' এলি, অর্থাৎ টমের বোন জানাল। 'তুমি ঘুম থেকে উঠলে তোমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছে আমাকে।'

'তাই,' টম বলল। 'তাহলে তো যেতেই হয়।' কোট গায়ে দিয়ে বোনের সঙ্গে দরজার দিকে এগোল ও।

আমাকে যেতে বলা হয়নি, তাই ঘরে একা রয়ে গেলাম আমি। এক ঘণ্টা পেরোল। খবরের কাগজ পড়ে আর সিগারেট টেনে সময়টা কাটিয়ে দিলাম। আবার ঘুম পাচ্ছে। এই সময় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এলি।

টেবিলের কাছে এসে বসে পড়ল ও। 'তুমি এখনও জেগে আছো দেখছি।'

'হ্যাঁ।'

'মিটিং থেকে আসতে অন্তত আরও দুই ঘণ্টা লাগবে ওদের। আমার ক্লান্তি লাগছিল, তাই চলে এলাম।'

কিছু বললাম না। জানালার কাছে বসে বাইরে চত্বরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই জানালাটা সামান্য ফাঁক করে রাখে ওরা তার কারণ ওদের পড়শীর একটা রেডিও আছে আর সেই রেডিওর বাজনা জানালা দিয়ে শোনে ওরা। কিন্তু সেরাতে বাজনা বন্ধ।

'গুড নাইট,' এলি বলল।

'গুড নাইট,' জবাব দিলাম।

পাশের ঘরে চলে গেল ও। ওর নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

খোলা দরজা দিয়ে আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল: 'এই, তোমার ক্লান্তি লাগছে না? ঘুমাতে যাও না কেন?'

'নাহ্,' জবাব দিলাম: 'আমার ক্লান্তি লাগছে না। বসে থাকি, টম আসুক, তারপর শুতে যাব।'

'ওদের আসতে অনেক দেরি হবে। ওই মিটিংগুলোর অবস্থা তো জানো।'

'তা জানি। কিন্তু আমার এখন ক্লান্তি নেই।'

পনেরো মিনিট চুপচাপ রইলাম। তারপর নাইটগাউনের ওপর কোট পরে রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে বারান্দা ধরে টয়লেটে গেল এলি। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এসে বেডরুমে ঢুকল। আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, কিন্তু আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আবার কয়েক মিনিট কোনও সাড়াশব্দ নেই। তারপর ও ডাকল: 'ফ্র্যাঙ্কি, আমাকে এক গ-াস পানি এনে দেবে, পি-জ?'

'আনছি,' জবাব দিলাম। উঠে গিয়ে সিংক থেকে গ-াসে পানি ভরে নিয়ে গেলাম বেডরুমে। উঠে বসে আমার হাত থেকে গ-াসটা নিয়ে পানি খেতে লাগল সে। গায়ে কম্বল জড়ানো। গ-াসটা আবার আমার হাতে ফিরিয়ে দেবার সময় কম্বলটা ওপর থেকে খসে পড়ে গেল। ওর কাঁধ সহ খোলা বুক বেরিয়ে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও।

ঘুরে দাঁড়াতে গেলাম। আমার হাত চেপে ধরল ও। বলল: 'ব্যাপারটা কী তোমার? ভয় পাও?'

'হয়তো পাই,' জবাব দিলাম।

'কেউ জানবে না,' ও বলল।

'আসলে তা না।' বলে ঘর থেকে বেরোতে পা বাড়ালাম। মনে মনে ভাবছি টম ও

তার মা আমার জন্য যা করেছে তার পর ওদের মেয়ের সঙ্গে এই ঘটনাটা ঘটানো কতখানি অনুচিত হবে।

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে এসে আমার কাঁধ চেপে ধরল এলি। আমার গায়ের সঙ্গে নিজের গা চেপে ধরল। পুরোপুরি উলঙ্গ। ঝাড়া দিয়ে ওকে ছোটানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও আঁকড়ে ধরে রইল আমাকে। জোর করে সরালাম ওকে।

আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হুমকি দিল সে: 'তুমি কথা না শুনলে আমি কিন্তু চেঁচানো শুরু করব। সারা বাড়ির লোক ছুটে আসবে। আমি ওদের বলব, তুমি আমাকে অত্যাচার করতে চেয়েছ।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। আবার দরজার দিকে রওনা হলাম। চিৎকার করতে মুখ খুলল ও। তাড়াতাড়ি ওর মুখ চেপে ধরলাম। চাপা গর্জন করে উঠে বললাম, চেঁচালে খুন করে ফেলব। আমার হাতে কামড়ে দিল ও। ওকে তুলে নিয়ে বিছানায় ছুঁড়ে ফেললাম। তারপর আবার বেরিয়ে যেতে চাইলাম।

ও বলল: 'আমি চেঁচাব।'

ফিরে এলাম ওর কাছে। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাও।'

বাড়ির সবাই মিটিং থেকে ফিরল সাড়ে বারোটায়। পাশের ঘরে এলি ঘুমাচ্ছে। আমি রান্নাঘরের টেবিলে বসে মৃদু আলোয় পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করছি।

স্যাম ও টম আমার কাছে এসে দাঁড়াল। স্যাম বলল: 'আজ রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়বে। বাইরে শৈত্যপ্রবাহ বইছে।'

একটা মুহূর্ত কোন জবাব খুঁজে পেলাম না যেন। তারপর বললাম: 'আমারও তাই মনে হয়, খুব শীত পড়বে আজ রাতে।'

মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল স্যাম: 'মা, চা-কফি কিছু খাবে?'

'না,' মা জবাব দিলেন। 'টম আর ফ্র্যাঙ্কি হয়তো কফি খাবে। বানানো আছে। দিয়ে দাও।'

কিন্তু আমরাও খেলাম না। সোজা গিয়ে উঠলাম বিছানায়।

পরদিন খুব সকালে আমি কাজের সন্ধানে বেরোলাম। পঁয়ত্রিশ সেন্ট খরচ করে ঘোরাঘুরি করলাম, লাভ হলো না। এমনকী সপ্তায় নয়-দশ ডলার বেতনের মত ছোট কাজও নেই। সিক্সথ্ অ্যাভেনিউর এজেন্সিতে গেলাম, সেখানেও আরও অনেকের মতই কোন কাজ পেলাম না। সাতটা নাগাদ টমদের বাড়িতে ফিরে এসে জানালাম আমার ব্যর্থতার সংবাদ।

'পাবে, পাবে, অত অস্থির হয়ো না,' আমাকে সান্ত্বনা দিলেন মিসেস হ্যারিস। 'কিছু না কিছু জুটিয়েই দেবেন লর্ড।'

তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। বললাম: 'থ্যাংকস, মা, কিন্তু লর্ড তো আপনাদের খাবারই জোটাচ্ছে না, আমি তো বাড়তি বোঝা।'

'ওভাবে বোলো না, ছেলে,' তিনি বললেন। 'চিন্তা নেই, খাবারের অভাব হবে না আমাদের।'

ছয়

যবের দানা খেয়ে তিন দিন কাটালাম আমরা। যবের পুষ্টিগুণ যতই থাক না কেন স্বাদ বড় জঘন্য। সপ্তাহ্ শেষেও আমি কোন কাজ পেলাম না। আর মাত্র তিন ডলার অবশিষ্ট আছে আমার কাছে।

শনিবার রাতে টম জিজ্ঞেস করল: 'একটা পার্টিতে যাবে?'

'যাব,' আমি বললাম, 'কিন্তু...'

বাধা দিয়ে ও বলল, 'এসো।'

'একটা সিকি খরচ করলেই ওই পার্টিতে ঢুকতে পারবে, বাজনা শোনা, খাওয়া, ড্রিংক, সব হয়ে যাবে।' আমার হাত ধরল ও। 'আর যা কয়েকটা মেয়ে আছে না।'

হাসলাম। 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু...'

'কিন্তুটিন্তু নেই,' আবার বাধা দিল ও। 'একটা দারুণ জায়গা। তোমাকে হয়তো পে-বয়-টেবয়ও ভেবে বসতে পারে ওরা।'

ঘণ্টাখানেক পর কোট পরে বেরিয়ে এলাম দুজনে। স্যাম তখন টেবিলে বসে পড়ছে।

'ও খুব বুদ্ধিমান ছেলে, আমার ভাইটা,' টম বলল। 'ক্লাসের ও প্রধান। শহরতলীর হারেন হাই স্কুলে পড়ে।'

আমি বললাম: 'হ্যাঁ, সব সময়ই ওকে বই নিয়ে বসে থাকতে দেখি।'

গ-াসভর্তি বিয়ার নিয়ে তাতে কিছুটা জিন ঢেলে দিয়ে ড্রিংক বানায় ওই পার্টিতে। আমার ধারণা এক গ-াস খেয়েই মাতাল হয়ে গেলাম আমি, পার্টিতে কী ঘটছে, বোঝা কঠিন হয়ে গেল। সেইন্ট নিকোলাস অ্যাভেনিউর ওই বাড়িটাতে তিরিশজন মত লোক জমায়েত হয়েছে। একটা লোক গিটার বাজাচ্ছে। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ আর মেয়েও রয়েছে। সাদারা সাদাদের এড়িয়ে চলছে–নারীই হোক বা পুরুষই হোক–কালোদের সঙ্গে বেশি মিশছে ওরা। আমি যখন একটা সাদা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে একজন সুদর্শন নিগ্রো যুবকের সঙ্গে কথা শুরু করল সে।

রাত তিনটে নাগাদ পার্টি শেষ হলো। এত গেলা গিলেছে টম, প্রায় হাঁটতেই পারছে না। আমার কাঁধে ওর বাহু জড়িয়ে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম। ঠাণ্ডা বাতাস আমার মগজটাকে সাফ করে দিয়েছে, তাই বাড়ি ফিরে মাতলামি করলাম না।

তবে টম দরাজ গলায় গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাড়িতে ঢুকল। অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়ার সিঁড়িতে উঠে আর সামলাতে পারল না, গেল বেহুঁশ হয়ে। ওকে তোলার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। বারান্দায় আলোও নেই। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললাম। সিঁড়ির মাথার রেলিঙের কাছে বারান্দায় একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। মুখ

তুলে তাকালাম।

এলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সঙ্গে চলি-শের কাছাকাছি বয়েসের একটা শ্বেতাঙ্গ লোক। দুজনেই আমার দিকে তাকাল। লোকটাকে ভীত মনে হলো। ওর কোট আর জ্যাকেট খোলা। বারান্দা থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সে।

ওর কাঁধ খামচে ধরল এলি। 'যাচ্ছ কোথায়, বাকি সিকিটা দিয়ে যাও!'

পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে এলির হাতে দিয়ে তাড়াহুড়া করে পালিয়ে বাঁচল যেন লোকটা।

শান্ত ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে আমাদের দিকে নেমে এল এলি। টমের দিকে তাকাল।

'বেহুঁশ হয়ে গেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ। দেখি, ধরো তো, হাত লাগাও আমার সঙ্গে,' আমি বললাম। 'একা তুলতে পারছি না।'

দুজনে মিলে বয়ে এনে টমকে ঘরের ভিতর বিছানায় ফেললাম। প্রায় সাড়ে তিনটা বাজে তখন। স্যাম ঘুমোচ্ছে। অন্য ঘর থেকে ওর মায়ের নাক ডাকানোর শব্দ ভেসে আসছে। আমি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

এলি এসে দাঁড়াল আমার পিছনে। ফিরে তাকালাম। 'তুমি বলে দেবে না তো?' আমাকে জিজ্ঞেস করল ও।

'না,' জবাব দিলাম, 'বলব না।'

'কোন না কোনভাবে টাকা তো আয় করতেই হবে,' মরিয়া ভঙ্গিতে বলল এলি। 'দোকানে কাজ করে স্যাম যা পায় তা দিয়ে তো আর এতগুলো মানুষের পেট চলে না। টাকা উপার্জনের জন্যে কিছু একটা করতেই হয়।'

ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। 'কিন্তু তোমার মা আর ভাইদের বোঝাও কী করে?'

'আমি ওদের বলেছি সপ্তাহে তিন রাত একটা রিবন ফ্যাক্টরিতে চাকরি করি। আসলেও করতাম। কিন্তু বেশ কিছুদিন আগেই ওই চাকরি চলে গেছে।'

'কতদিন ধরে চালাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সেটা জানার দরকার নেই তোমার,' রুক্ষস্বরে বলল ও।

'বেশ,' জবাব দিলাম, 'আর কোন প্রশ্ন করব না।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। অসুস্থ বোধ করছি।

কাছে এসে আমার পাশে দাঁড়াল ও। 'তোমার কাছে টাকাপয়সা আছে কিছু?'

'না,' কেন যে ওর কাছে মিথ্যে বললাম, জানি না।

লোকটার কাছ থেকে নেয়া সিকিটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'নাও। কাল রবিবার–গির্জায় যেতে তোমার দরকার হতে পারে।'

আমি বললাম: 'না, ধন্যবাদ,' ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'লাগবে না।'

ওর চোখে পানি টলমল করে উঠল। দীর্ঘ মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা। ওর চোখের পানি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে লাল করে ফেলল ও। আমি ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

'থাক, কেঁদো না,' সান্ত্বনার সুরে বললাম, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

শুতে চলে গেল ও। আমিও যখন শুতে গেলাম, দেখি ওর বিছানাটা খালি। পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি মায়ের সঙ্গে শুয়ে ঘুমাচ্ছে ও। আবার আমাদের ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন রোববার, সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল আমার। খানিকক্ষণ বিছানায় পড়ে থেকে স্যাম ও টমের নাক ডাকানো শুনলাম। তারপর বিছানা থেকে নেমে রান্নাঘরে এলাম। ছয়টা বাজে। মুখে পানি দিয়ে সাবান ঘষলাম। বাইরে তখনও অন্ধকার, তাই রান্নাঘরের ম-ান আলোটা জ্বেলে দিলাম। শেভ করতে লাগলাম। এ সময় ঘরে ঢুকল স্যাম। একটা চেয়ারে বসে আমাকে দেখতে লাগল।

'এত সকালে উঠেছ কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'দোকানে যেতে হবে নাস্তার অর্ডারগুলো ডেলিভারি দেয়ার জন্যে?' জবাব দিল ও।

একটা মুহূর্ত চুপচাপ থাকার পর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বয়েস কত, ফ্র্যাঙ্কি?'

'কুড়ি।'

'আমার চেয়ে খুব বেশি না,' ও বলল। 'আমার আঠারো। তোমাকে দেখে কিন্তু আরও বেশি বয়েস মনে হয়।'

'হ্যাঁ,' ওর দিকে ফিরে তাকালাম। সুদর্শন একটা ছেলে, চামড়ার রঙ কালো হলেও বেশ চকচকে, ঘন কোঁকড়া চুল, হালকা-পাতলা গড়ন, বড় বড় চোখ।

'ফ্র্যাঙ্কি, আমাদেরকে তোমার কেমন মানুষ মনে হয়? মানে, আমি বলতে চাইছি–টম, আমি আর এলি?' বড় বড় চোখে উৎসৃক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও।

'তোমরা সত্যিই খুব ভাল। এরচেয়ে ভাল আর হতে পারতে না যদি...'

বাধা দিয়ে ও বলল: 'যদি শ্বেতাঙ্গও হতাম, এটাই বলতে চাও তো?'

'না,' আমি বললাম, 'আমার আত্মীয়ও হতে। আমার রক্তের সম্পর্কের কেউও এরচেয়ে বেশি দয়া আর সহানুভূতি দেখাতে পারত না।'

উঠে দাঁড়াল ও। 'আমি যাই। পরে দেখা হবে। দশটায় দোকান বন্ধ হলে ফিরব। তখন গির্জায় যাব।'

'হ্যাঁ, দেখা হবে,' বলে আমি দাড়ি কামানো শেষ করলাম। কাপড় বদলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভীষণ ঠাণ্ডা। সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে ওয়ান টোয়েন্টি ফিফথ্ স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। স্যাম যে দোকানটায় কাজ করে ওটার পাশ কাটানোর সময় দেখলাম প্রচুর ভিড়। ভিতরে ঢোকার ইচ্ছেটা দমাতে পারলাম না। স্যাম কাজে ব্যস্ত। জিনিসপত্র প্যাকেট করছে। দোকানে মেয়েমানুষের সংখ্যাই বেশি, বেশির ভাগ আইরিশ। আমার দিকে চোখ পড়তে মাথা ঝাঁকাল স্যাম।

এক ডজন ডিম, এক পাউণ্ড শুয়োরের মাংস, এক ডজন রোল আর এক বাক্স সস্তা সিগারেট কিনলাম। টাকা মিটিয়ে দিয়ে–বায়াত্তর সেন্ট–প্যাকেটগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরে চললাম।

মিসেস হ্যারিস আর এলি রান্নাঘরে। টম তখনও ঘুমোচ্ছে। প্যাকেটটা টেবিলে রেখে বললাম, 'নাস্তা কিনে আনলাম।'

'কোন প্রয়োজন ছিল না,' মিসেস হ্যারিস জবাব দিলেন।

স্যাম ফিরে না আসা পর্যন্ত খেতে বসলাম না আমরা। টম উঠে পড়েছে। একটানা ঘুমিয়ে মাথার ভিতরটা বোধহয় সাফ হয়ে এসেছে। বলল, 'ম্যান, যা একখান পার্টি গেল। খুব মজা হয়েছে।'

'তা হয়েছে,' খেতে খেতে জবাব দিলাম।

'গির্জায় যাবে?' মিসেস হ্যারিস জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

'যাব।'

একসঙ্গে গির্জায় গেলাম সবাই। ব-কের শেষ মাথায় ছোট একটা দোকানের ভিতর গির্জা তৈরি করা হয়েছে। মাঝখানে মস্ত স্টোভ জ্বেলে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দোকানের ভিতর গির্জার কাজকর্ম চালাচ্ছে, কেমন আজব লাগল। বোধহয় আমি কী ভাবছি বুঝতে পেরেই মিসেস হ্যারিস বললেন, 'ঈশ্বর সবখানেই আছেন, খোকা।' মিষ্টি করে হাসলেন তিনি। 'এমনকী দরিদ্র মানুষের কাছেও আছেন।' মনে মনে লজ্জা পেলাম।

আমার দিকে তাকাল অনেকেই। কিন্তু কাদের সঙ্গে এসেছি, দেখে আর দ্বিতীয়বার তাকাল না, কিছু বললও না। এখানকার সবাই হ্যারিসদেরকে চেনে। প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর আমার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিল ওরা। আমাকে ওদের বন্ধু বলে পরিচয় দিল। ভাল লাগল আমার। বিব্রত ভাবটা আর রইল না।

বাড়ি ফিরে একেকজন একেক জায়গায় বসলাম। স্যাম তার বই নিয়ে বসল।

মঙ্গলবারে টম আর আমি গেলাম ট্রাক থেকে কয়লা নামানোর কাজ করতে। প্রত্যেকে তিন ডলার করে পেলাম। তবে পুরো সপ্তাহটায় আর কোন কাজ পেলাম না।

বৃহস্পতিবার রাত মিটিঙের রাত। বাড়িতে আমাকে একা রেখে চলে গেল সবাই।

একটু পরেই ফিরে এল এলি। চুপচাপ বসে রইলাম দুজনে। অনেক কিছু ভাবার আছে, কিন্তু বলার নেই। বাড়ির বাকি সবাই ফিরে এলে ঘুমোতে গেলাম আমরা।

দিনগুলো যেন উড়ে যেতে থাকল। দেখতে দেখতে মার্চ মাস এসে গেল, আবহাওয়াও ভাল হয়ে উঠছে ক্রমেই। এদিকে মিসেস হ্যারিসের সংসারে টানাটানি, বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে থাকলাম।

এক সন্ধ্যায় আমি আর এলি বাড়িতে একা, আমি বললাম: 'খুব শীঘ্রি চলে যাচ্ছি আমি।'

আমার দিকে অবাক হয়ে তাকাল এলি।

'সারাজীবন তো এখানে থাকতে পারি না, বুঝতেই পারছ,' আমি বললাম।

কাছে এসে আমার একটা হাত তুলে নিল ও। আমি ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরলাম। সে-রাতের কথাটা মনে হলো আমার, যেদিন আমাকে চাপাচাপি করেছিল এলি। সে-ও বোধহয় ওই কথাটাই ভেবে আমাকে বেডরুমে টেনে নিয়ে গেল। এরপর

যে কাণ্ডটা করল ও, তাতে বুঝতে পারলাম আমাকে যেতে দিতে চায় না। এটাকে ভালবাসা বলা যাবে না, প্রেম বা অনুরাগও নয়; পরস্পরের প্রতি এক ধরনের উষ্ণ সহমর্মিতা বলা যেতে পারে।

বিছানা থেকে যখন উঠলাম আমরা, দুজনেই হাঁপাচ্ছি। আমার কোমর আঁকড়ে ধরে রেখেছে সে।

'আমাকে যেতে হবে, বুঝলে,' কিছুটা রুক্ষ স্বরেই বললাম। 'শুধু নেবই, কিছু দেব না, এ ভাবে চিরকাল এখানে থেকে যেতে পারি না আমি।'

গুঙিয়ে উঠল ও। হাঁপাতে হাঁপাতে কোনমতে বলল: 'হ্যাঁ, যেতে তো হবেই, একদিন না একদিন।'

রাতে খাবার টেবিলে সবাইকে জানালাম, আমি চলে যাচ্ছি। আমাকে যেতে দিতে চাইল না ওরা। বললাম, 'কোন না কোন কাজ খুঁজে নিতেই হবে আমাকে। এখানে তো কাজ নেই। কাল আমি চলে যাচ্ছি।'

পরদিন সকালে টম ও স্যামের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মিসেস হ্যারিস ও এলির গালে চুমু খেয়ে গুড-বাই জানালাম। ধন্যবাদ দিলাম সবাইকে।

মিসেস হ্যারিস বললেন: 'ভাল থেকো, ফ্র্যাঙ্কি। আমাদের কথা ভুলো না, কখনও অসুবিধেয় পড়লে সোজা চলে এসো এখানে।'

'না, ভুলব না,' বলে দরজার দিকে এগোলাম। দরজার কাছে পৌঁছে ফিরে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'আসি তাহলে।'

মায়ায় পড়ে বেরোতে যদি না পারি এই ভয়ে তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দিলাম দরজাটা। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। উজ্জ্বল রোদেলা দিন, আবহাওয়া উষ্ণ হয়ে এসেছে, আর আমার মন বলছে সামনে শুভদিন অপেক্ষা করছে আমার জন্য।

চারপাশে তাকালাম। কোনদিকে যাব সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। আমার বাড়তি শার্ট একটা কাগজের ব্যাগে ভরে বগলে চেপে নিয়েছি। পুব দিকে যাব ঠিক করলাম। এইট্‌থ্ অ্যাভেনিউর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

মিসেস হ্যারিসের মায়াভরা কণ্ঠ কানে বাজছে আমার: 'আমাদের কথা ভুলো না, কখনও অসুবিধেয় পড়লে সোজা চলে এসো এখানে।' আপনমনেই হাসলাম। ওদের নিজেদেরই চলে না, অথচ আমার বোঝা নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। অনেক দিয়েছে ওরা আমাকে। পথের মোড়ে এসে থামলাম। গলার ভিতর দলার মত ঠেলে উঠছে যেন প্রচণ্ড আবেগ। 'মন নরম কোরো না!' ধমক লাগালাম নিজেকে। তারপর মন শক্ত করে এগিয়ে চললাম।

সাত

এইটথ্ অ্যাভিনিও ধরে হেঁটে চললাম। চলার পথে যে কটা দোকান পেলাম সবগুলোতে থেমে জিজ্ঞেস করলাম তাদের কাজের লোক দরকার কিনা। কেউ কেউ ভাল ব্যবহার করল, কেউ করল না। বিকেলবেলা কলাম্বিয়া অ্যাভিনিউর সেভেন্টি-সেকেন্ড স্ট্রিটে একটা ক্যাফেটিরিয়ায় বাসন ধোয়ার কাজ পেলাম। চার ঘণ্টা কাজ করার পর আমাকে এক ডলার পারিশ্রমিক দিল ওরা, আর রাতের খাবার। ডলারটা পকেটে ভরলাম। খাওয়া সেরে ম্যানেজারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আগামী দিন ওদের লোক দরকার হবে কিনা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আমার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল সে। বেঁটেখাটো মোটা মানুষটি মুখে আন্তরিক হাসি নিয়ে কথা বলল: 'সরি, শুধু আজকের জন্যেই কাজ দরকার ছিল। তোমাকে আসলে আমার আজকেও দরকার ছিল না, তারপরেও...'

হাসিটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম: 'আমি জানি। যাই হোক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

অন্ধকার হয়ে আসছে। সারা রাত বাইরে কাটাতে না চাইলে শীঘ্রি আমাকে একটা থাকার জায়গা খুঁজে নিতে হবে এখন। একটা মিলস হোটেলে গিয়ে পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে একটা বিছানা ভাড়া করলাম। লবিতে কিছু পত্রিকা রাখা আছে। সেগুলো ওল্টাতে লাগলাম। ভাবছি, আমার মামা-মামীকে খুঁজে বের করার উপায় আছে কিনা, আর উপায় থাকলেও করব কিনা। আমার যা দুস্থ অবস্থা, এই অবস্থায় ওদের সামনে গিয়ে হাজির হতে চাই না। এমনকী রাস্তায় বা অন্য কোথাও পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাক, তা-ও চাই না। কাউকে আমার এই ভিখিরি দশা দেখাতে ভাল লাগবে না আমার।

পরদিন সকালে উঠে সাড়ে সাতটা নাগাদ সিক্সথ অ্যাভেনিউতে পৌঁছলাম। এজেন্সিতে সেই আগের মতই কাজপ্রার্থীদের ভিড়। কয়েকটা ঠিকানা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হলো আমাকে, কিন্তু সবখানেই গিয়ে দেখলাম লোক নিয়ে নিয়েছে কিংবা বসের পরিচিত কাউকে নেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। ফোরটি-সিক্সথ স্ট্রিটের সিক্সথ অ্যাভেনিউতে একটা সস্তা রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিলাম, আর পঁয়ত্রিশ সেন্ট দিয়ে আরও কিছু খাবার কিনলাম পরে খাওয়ার জন্য। ফিরে এলাম হোটেলে। যে ঘরটাতে আমি সিট পেয়েছি, তাতে আরও দশটা সিট আছে। কেউ তাস খেলছে, কেউ ঘুমানোর চেষ্টা করছে, কেউ বা বিষণ্ন ভঙ্গিতে বসে বসে ভাবছে। কয়েক মুহূর্ত ওদেরকে দেখে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমি।

পরদিন সকালে পাইকারি বাজারে কাজের চেষ্টা করলাম। ভাগ্যক্রমে একটা গুদামে কাজ পেয়ে গেলাম। ডেলিভারি বয়ের কাজ। আগের বয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

নাটকীয়ভাবেই পেয়ে গেলাম কাজটা। আমি অফিসে ঢুকতেই ডেস্কের ওপাশ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে সুপারভাইজার জিজ্ঞেস করল: 'কী চাও?'

'একটা কাজ,' জবাব দিলাম।

'নেই,' বলে দিল সে। ঠিক এই সময় টেলিফোন বাজল। তুলে নিয়ে প্রায় খেঁকিয়ে উঠল: 'রেজিয়াস বলছি।' তারপর ওপাশের কথা শুনতে লাগল। আমি অপেক্ষা করছি।

কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। সুপারভাইজার কথা বলছে না। শুধু শুনছে। কী করে যেন অনুমান করে ফেললাম–বোধহয় আমার দিকে ওর তাকানো দেখেই–আমি একটা কাজ পেতে যাচ্ছি। আমার হাত ঘামতে শুরু করল। বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটাচ্ছে যেন হৃৎপিণ্ডটা। আমি জানি একটা কাজ আছে এখানে, আর সেটা আমার ভীষণ দরকার।

অবশেষে রিসিভার নামিয়ে রাখল সুপারভাইজার। একজন ট্রাকচালক ভিতরে ঢুকে ওকে একটা বিল অভ ল্যাডিং দেখাল। কয়েক মিনিট কথা বলে ট্রাকচালক চলে গেল। আমার দিকে তাকাল তখন সুপারভাইজার। ধমকে উঠল, 'কী হলো, দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

'একটা কাজ,' আগের মতই জবাব দিলাম।

'বলেছি তো এখানে কোন কাজ নেই।'

'কিন্তু টেলিফোনে তো একটা কাজের কথা জানলেন,' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লাম।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে প্রশ্ন নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। 'কোন অভিজ্ঞতা আছে?'

'কিছু কিছু,' জবাব দিলাম। 'স্যান ডিয়েগোর একটা বড় ফুড মার্কেটে কাজ করেছি।' ওখানে যে মাত্র দুদিন টিকেছিলাম, সেকথাটা আর ওকে জানালাম না।

এইবার কিছুটা আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকাল ও। 'বয়েস কত?' প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে মারল।

'বিশ।'

'তাহলে এই কাজটা তোমার জন্যে নয়,' ডেস্কের দিকে মুখ নামাল সুপারভাইজার। 'ডেলিভারি বয়ের কাজ। সপ্তায় আট ডলার বেতন।'

'আমি করব,' জবাব দিতে দেরি করলাম না।

আবার আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল ও। 'সপ্তায় বেতন মাত্র আট ডলার।'

পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছি আমি, যাতে আমার হাতের কাঁপুনি ওর চোখে না পড়ে। 'আমি করব,' আবার বললাম। মনে মনে বলছি, ঈশ্বর, লোকটা যেন আমাকে 'না' বলে না দেয়। জীবনে এমনভাবে কোন কিছুই আর চাইনি।

'সপ্তায় আট ডলারে তোমার পোষাবে না,' লোকটা বলল। 'তুমি ছোট ছেলে নও। এই টাকা দিয়ে চলতে পারবে না।'

পকেট থেকে হাত বের করলাম না। 'দেখুন, মিস্টার,' উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর কিছুটা বিকৃত হয়ে গেল, 'আমার একটা কাজ দরকার। ভীষণ দরকার। পকেটে একটা কানাকড়ি নেই। ছয় সপ্তাহ আগে বরফ সরানোর একটা কাজ পেয়েছিলাম, ব্যস,

তারপর থেকে বেকার। সপ্তায় আট ডলার আমার জন্যে অনেক টাকা।'

চেয়ারে হেলান দিল সে। সামান্য ঘুরে গেল আমার দিক থেকে। 'বাবা-মা'র সঙ্গে থাকো?'

'না,' জবাব দিলাম। 'আপনজন বলতে কেউ নেই আমার। মিলস হোটেলে একটা সিট ভাড়া করে আছি এখন।'

'সপ্তাহে আট ডলারে কাজ করতে চাও কেন?' ও জিজ্ঞেস করল। 'তোমার মত স্বাস্থ্যবান, শক্তপোক্ত একজন মানুষ তো আরও ভাল কিছু করতে পারো।'

'অনেক চেষ্টা করেছি, মিস্টার,' মরিয়া হয়ে জবাব দিলাম, 'বিশ্বাস করুন, কিচ্ছু পাইনি। কোন কাজই না। এই কাজটা না পেলে না খেয়ে থাকতে হবে আমাকে।'

চুপ হয়ে গেল ও। ভিতরে ভিতরে পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি। লোকটার এই বিড়াল-ইঁদুর-খেলা রীতিমত উন্মাদ বানিয়ে দিচ্ছে আমাকে। হঠাৎ করেই চেয়ার ঘুরিয়ে আমার দিকে সরাসরি তাকাল ও। 'ঠিক আছে। কাজটা দিলাম তোমাকে।'

দুর্বল বোধ করতে লাগলাম। ডেস্কের সামনে রাখা একটা চেয়ারে বসে পড়লাম ধপ করে। সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগালাম। ধরানোর চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি হাত এত কাঁপা কাঁপছে, ম্যাচের কাঠিই জ্বালাতে পারছি না। একটা কাঠি ধরিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সুপারভাইজার। কৃতজ্ঞভঙ্গিতে মুখটা বাড়িয়ে দিলাম আগুনের দিকে। ভারি দম নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'কী বলে যে ধন্যবাদ দেব আপনাকে, জানি না!'

কয়েকটা মিনিট মাথা ঘুরতে থাকল আমার। মনে হলো, অসুস্থ হয়ে যাব। পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল। তিতে পানি বেরিয়ে এল মুখে। জোর করে গিলে নিলাম। এখন না, খোদা, এখন না, এখন আমাকে অসুস্থ বানিয়ো না! দুই হাতে মাথা চেপে ধরলাম। চেয়ার থেকে উঠে আমার পাশে এসে দাঁড়াল সুপারভাইজার। 'তোমার অবস্থা খুব খারাপ, তাই না, খোকা?' কোমল কণ্ঠে বলল ও। আগের সেই রুক্ষতাটা নেই আর কণ্ঠস্বরে।

মাথা ঝাঁকালাম। তখনও দুই হাতে মাথা চেপে ধরে রেখেছি। ধীরে ধীরে সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। বমি বমি ভাবটা চলে গেল। ওর দিকে মুখ তুলে তাকালাম।

'এখন ঠিক হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হ্যাঁ, সার, ঠিক হয়ে গেছে। এতটাই অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম...আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাই।' মাথা ঝাঁকাল ও। আমি বললাম, 'কখন থেকে কাজ শুরু করব?'

আবার গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল লোকটা। খসখস করে একটা কাগজে কিছু লিখে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। কাগজটা হাতে নিয়ে ঠিকানাটা পড়লাম।

'ইচ্ছে করলে এখন থেকেই শুরু করতে পারো,' ও বলল।

'ঠিক আছে, সার,' বললাম, 'আপনার যদি কোন অসুবিধে না হয়।'

আরেকটা কাগজ টেনে নিল সে। 'তোমার নাম কী?'

'ফ্র্যাঙ্ক কেইন, সার,' জবাব দিলাম।

কাগজে কিছু লিখে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'নাও,' হেসে বলল, 'স্টোরের ম্যানেজারকে এটা দিয়ো। যদি কোন প্রশ্ন করে, বলবে রেজিয়াস পাঠিয়েছে, ফোনে যেন কথা বলে নেয়।'

'থ্যাংক ইউ, মিস্টার রেজিয়াস,' বললাম, 'অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'গুড লাক, ফ্র্যাঙ্ক,' লোকটা বলল। চেয়ার থেকে উঠে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

কৃতজ্ঞচিত্তে ওর হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। সুন্দর একটা দিন। ইতিমধ্যেই ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে আমার। একটা কাজ কেমন করে সবকিছু বদলে দেয়, অনুভব করলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, মিস্টার রেজিয়াসের মত একজন ভদ্রলোককে কখনও ডোবাব না আমি। তার দেয়া কাজের কদর করব। হাতের কাগজটার দিকে তাকালাম। মনে হলো এত সুন্দর বাক্য আর কখনও দেখিনি আমি। লেখা রয়েছে:

হ্যারি–

এই ছেলেটার নাম ফ্র্যাঙ্ক কেইন। ওকে কাজে লাগিয়ে দাও। সপ্তাহে বেতন দশ ডলার। জে. রেজিয়াস।

নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চাইছে না। কাজ তো পেলামই। যা বলা হয়েছে, তার চেয়ে আরও দুই ডলার বেশি বেতনে। মনে মনে ভদ্রলোককে সালাম জানালাম আরেকবার। তারপর এগিয়ে চললাম ফ্র্যাঙ্কলিন স্ট্রিটের দিকে। কখন যে শিস দেয়া শুরু করেছি, নিজেও জানি না।

পঞ্চম পর্ব

এক

রেজিয়াসের দয়ায় হ্যারি ক্রোনস্টেইন-এর স্টোরে কাজ পেয়ে ভালই আছি আমি। এই হ্যারি লোকটাও ভাল। শীতকাল শেষ হয়ে গ্রীষ্মকাল এল। ইতিমধ্যে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। টমরা যে বাড়িতে থাকত, তাতে আগুন লেগে মিসেস হ্যারিস পুড়ে মারা গেলেন। মাকে বাঁচাতে গিয়ে এলিও পুড়ে মরল। টম আর স্যাম তখন বাড়ির বাইরে ছিল, তাই বেঁচে গেল। এই দুর্ঘটনার পর দুজনে ওখান থেকে দূরে কোথাও চলে গেল, আর কোন খোঁজ পাইনি ওদের। এদিকে যতভাবে সম্ভব আমার মামার পরিবারের খোঁজও করেছি। তাদেরও কোন হদিস পাইনি। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে পরিবারটা।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে হ্যারির দোকানে আমার সাপ্তাহিক আয় দাঁড়াল বেতন ও টিপস মিলিয়ে পনেরো ডলার। এই দুর্দিনের বাজারে ভাল বলতে হবে। তবে এরচেয়ে অনেক বেশি কামাতাম আমি কেওয়াফের দোকানে। ওই কাজও করতে পারতাম, কিন্তু কেন যেন ওসবে ফিরে যেতে আর মন চায়নি। যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যেই আমার আয় আরও বেড়ে গেল।

হ্যারির দোকানের কাছে একই ব-কে একটা আইস-ক্রিম পার্লার আছে–বেশির ভাগ সময় ওটাতে খাবার খাই আমি, মালিকের নাম অটো। হ্যারির স্টোরে আমি মন দিয়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করি। কথাটা অটোর কানেও গেল। ১৯৩৩-এর জুলাইয়ের একদিন আমাকে ওর দোকানে বাড়তি কাজের প্রস্তাব দিল সে। শুধু রোববারের বিকেলটায় কাজ করে দিতে হবে, ওই সময়টায় প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকতে হয় ওকে–দুপুর একটা থেকে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত–বলল এই কয়েক ঘণ্টা কাজের জন্য দুই ডলার করে দেবে আমাকে। অন্য কোন কাজ নেই আমার। বন্ধুবান্ধব জোগাড় করিনি, অকারণ সময় নষ্ট না করে একমনে কাজ করে গেছি। অটোর কাজটা নিয়ে নিলাম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একজন দক্ষ সোডা ক্লার্ক হয়ে গেলাম। কাজ করতে করতে কথা বলি তরুণ গ্রাহকদের সঙ্গে, ওদের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। গ্রোসারি স্টোরের ওপরে একটা ক্লাব আছে, সেই ক্লাব থেকে আইস-ক্রিম পার্লারে নেমে আসে ওরা।

ক্লাবটা সম্পর্কে আমার ভীষণ কৌতূহল। জানালায় সাইন বোর্ডে লেখা: ওয়ার্কার্স অ্যালায়েন্স। কিন্তু নামের সঙ্গে কাজের কোন মিল আছে বলে মনে হলো না আমার, কারণ ওখানে যারা আসে তারা হোম রিলিফের ওপর নির্ভর করে বাঁচে, কাজ করে না। প্রতি শনিবার রাতে আমরা যখন স্টোরের কাজে ব্যস্ত, ওপরতলা থেকে তখন হই-চই কানে আসে।

এক শনিবার মাঝরাতে স্টোর বন্ধ করার পর কৌতূহল দমন করতে না পেরে ঠিক করলাম ওপরে উঠে দেখব কীসের এত হট্টগোল। সদস্যদের অনেকেই আমাকে ওখানে

যাবার আমন্ত্রণ জানালেও এতদিন যাইনি। সেদিন কেন যেতে ইচ্ছে করল জানি না। হয়তো কাজের একঘেয়েমি ও অস্থিরতা কাটাতে, সেই সঙ্গে সামনে থেকে অনেক মানুষের প্রাণখোলা হাসি দেখতে মন উতলা হয়ে উঠেছিল।

বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছে মস্ত একটা হলঘরে। এক কোণে রাখা কয়েকটা বাদ্যযন্ত্র। ঘরের অন্যপ্রান্তে টেবিলে রাখা কিছু রুটি ও খাবার। টেবিলের পাশে এক গ্যালনের বোতলে রাখা কয়েক বোতল রেড গিনি ওয়াইন ও মদের সঙ্গে পানি মিশানোর একটা গামলা এবং একটা বিয়ারের পিপা। বাজনা বাজাচ্ছে ব্যান্ড বাদকের দল। সুরটা আমার অপরিচিত। ভালও লাগল না। তরুণরা বাজনার তালে তালে নাচছে, বুড়োরা জটলা করছে, হাতে স্যান্ডউইচ।

ভিতরে ঢুকে পড়লাম। পরিচিত মুখের খোঁজে এদিক ওদিক তাকালাম। চোখে পড়ল একজনকে। ওর নাম জোয়ি–নামের শেষের পদবীটা কী জানি না, হ্যারির দোকানে মাল কিনতে আসে।

'আরে, তুমি! তুমি এখানে আসবে ভাবিনি,' আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল ও।

ওর বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে হাসলাম। 'ভাবলাম, যাই দেখি, কী করে ওরা।'

'ভাল করেছ,' আমার হাত ধরে আন্তরিক ভঙ্গিতে টান দিয়ে আরও ভিতরে নিয়ে গেল ও। 'এসো, তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাই।' কয়েকজন অল্পবয়েসী তরুণ-তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল ও। কয়েকজনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম, এদেরকেও চিনি স্টোরে মাল কিনতে যাওয়ার সুবাদেই। এরপর আমাকে টেবিলের কাছে নিয়ে গেল ও। একটা স্যান্ডউইচ আমার হাতে গুঁজে দিয়ে 'নাও, আনন্দ করো' বলেই দৌড়ে দরজার কাছে চলে গেল সদ্য আগত একজন লোককে স্বাগত জানাতে। ভাবভঙ্গিতে মনে হলো ওই লোকটা এই ক্লাবের অফিসার গোছের কিছু। এখানকার সব সদস্যকে চেনে।

কিছুক্ষণ পর একটা মেয়েকে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম। এই মেয়েটাও স্টোরে মাল কিনতে যায়। সব সময় দোকানে ঢুকেই এক বোতল কেচাপ দিতে বলে আমাকে আর তাড়াহুড়া করতে বলে। যে ভঙ্গিতে বলে, আমার কাছে বেশ মজারই মনে হয়। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। অনেকটা রসিকতার ঢঙেই জিজ্ঞেস করলাম: 'আজ "তাড়াহুড়া করে" কেচআপ নিতে এলে না?' আমার মুখভর্তি স্যান্ডউইচ থাকায় কথাগুলো কেমন আজব আর হাস্যকর শোনাল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখল ও। জোয়ির মত সে-ও যেন আমাকে ওখানে দেখে অবাক হলো। 'তুমি এখানে কী করছ?'

মুখের খাবার গিলে নিয়ে জবাব দিলাম: 'আমিও এখানকার পার্টি মেম্বার।'

'মেম্বার না কচু!'

'বেশ, তাহলে বিনে পয়সায়ই খেতে এসেছি।'

'তাই তো করেছ, কথাটা কি ভুল?' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিল ও। 'আমরা

সবাই এখানে মুফতে খেতেই আসি।'

ওর সঙ্গের লোকটা চলে গেল আরেক দিকে, আরেকটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে। আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম: 'আমার সঙ্গে নাচবে?'

'নাচব? বেশ, ঝুঁকিটা নিলাম।'

হাতের বাকি স্যান্ডউইচটুকু একটা চেয়ারে রেখে নাচতে শুরু করলাম। 'দারুণ একটা জায়গা চালায় তো ওরা,' বললাম।

'হ্যাঁ, সবই বিনে পয়সায়,' মেয়েটা জবাব দিল।

অনেক রাত। তখনও লোক আসছে। নাচতে নাচতে দেখছি। অনেক দিন অভ্যাস না থাকায় মেয়েটার পায়ে পা বেধে যাচ্ছে আমার।

'নাহ্, কেচাপ বিক্রিই সাজে তোমার, তাড়াতাড়ি দিতে পারো,' বিরক্ত হয়ে মেয়েটা বলল: 'নাচানাচি তোমার কর্ম নয়।'

ওকে শক্ত করে গায়ের কাছে ধরে রেখে বললাম: 'আসলে ছুতোনাতা করে আমার কাছ থেকে সরতে চাইছ।'

ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটা বলল: 'সরো!'

বাজনা থেমে গেল। 'এবার বক্তৃতা হবে,' মেয়েটা বলল আমাকে।

'কেটে পড়বে নাকি?' জিজ্ঞেস করলাম। অন্য মতলব আছে আমার।

যেতে চাইল না ও। চেয়ারটার কাছে ফিরে গেলাম যেটাতে আমার স্যান্ডউইচ রেখেছি। ওটা তুলে নিয়ে বসে পড়লাম। 'থাকো এখানে। নতুন কিছু জানতে পারবে।'

ঘরের ঠিক মাঝখানে বড় একটা টেবিল টেনে নিয়ে এল জো। হাত তুলল: 'ভদ্র মহোদয়গণ, শুনুন,' চিৎকার করে বলল ও। 'আপনারা জানেন আজ আমাদের মাঝে একজন নতুন বক্তা এসেছেন, আমাদের সম্মানিত অতিথি। তাঁকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন দেখি না, শহরের এই অংশে তিনি যা করেছেন, তা থেকেই আপনাদের তাঁকে চিনে নেবার কথা। সুতরাং, জেরো ব্রাউনিংকে আপনাদের মাঝে হাজির করছি।'

টেবিল থেকে লাফিয়ে নীচে নামল জো। আমাকে অবাক করে দিয়ে লম্বা, তরুণ, লালচে চুলওয়ালা একজন নিগ্রো চড়ল টেবিলে। চোখ ঘুরিয়ে ঘরের লোকগুলোর দিকে তাকালাম। এতক্ষণে লক্ষ করলাম, নানা জাতের লোক রয়েছে ওদের মাঝে। মিক, ইটালিয়ান, স্পিক, পোলাক, সব জাতের। টেবিলে চড়া লোকটাই একমাত্র নিগ্রো, কিন্তু বিস্ময়কর সম্বর্ধনা পেল ও। সবাই চিৎকার করে, হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল ওকে। মৃদু হেসে ওদের অভ্যর্থনার জবাব দিল লোকটা।

হাত তুলতেই শান্ত হয়ে গেল জনতা। 'বন্ধুগণ,' লোকটা বলল, কথায় কোন রকম টান নেই: 'আজ রাতে বেশ কিছু নতুন মুখ দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে, যাদের আগে কখনও দেখিনি। তবে ওদের হাসিখুশি উষ্ণ মুখ দেখেই বুঝতে পারছি ওরাও আমাদেরই মত, জীবন থেকে সেসব জিনিসই নিতে চায় যা আমরা চাই, আর আজ রাতে এখানে আসার জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি ওদের।' সবাই হাততালি দিল। তালি

থামার অপেক্ষা করল লোকটা।

'আজ রাতে পার্টি কিংবা এর নীতিমালা নিয়ে কথা বলব না আমি। সবাই যা জানে, নতুন করে আর সেসব বলতে চাই না। বরং একজন লোকের জীবনী শোনাতে চাই, এই ব-কেরই শেষ মাথায় বাস করেন তিনি।

'এখানে কোনদিন আসেননি তিনি। আমাদের কোন মিটিঙে আসেননি। যদিও আমি নিজে তাঁকে অনুরোধ করেছি আসতে, আরও অনেকেই করেছে, কিন্তু তিনি আসেননি। তিনি, আমাদের অনেকের মতই হোম রিলিফে থেকেছেন কিছুদিন, বর্তমানে কাজ করছেন লং আইল্যান্ডের পাওয়ার-অ্যান্ড-লাইট কোম্পানিতে। তাঁর না আসার একটা কারণ হয়তো হতে পারে এই ক্লাবে এলে বস অখুশি হবেন, চাকরি থেকে বের করে দেবেন, আবার হয়তো আরেকটা চাকরি না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে হোম রিলিফে থাকতে হবে। যাই হোক, তিনি আমাকে জানিয়েছেন, বহুবার তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে আমাদের এখানে যেন না আসেন–আমরা নাকি একদল প্রগতিবাদী জারজ, আমাদের এখানে এলে যেটুকু তিনি বহু কষ্টে অর্জন করেছেন সেটুকুও নাকি খোয়াতে হবে।

'গত সপ্তায় নতুন তার বসানোর জন্যে নতুন গর্ত খুঁড়তে গিয়ে তাঁর গাঁইতি একটা বিদ্যুতের তারে লেগে যায়। শক খেয়ে দশ ফুট দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েন তিনি। মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন। এখন তিনি হাসপাতালে। বাঁচেন কি মরেন কোন ঠিক নেই।

'দুর্ঘটনার খবর শুনে আমি তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করেছিলাম কোন সাহায্য লাগবে কিনা। তিনি জবাব দিয়েছেন, আমরা কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না। কোথায়, কীভাবে তাঁর স্বামী আহত হয়েছেন, সেটাও জানিয়েছেন। সেই রাতেই তাঁর অফিসে গিয়েছিলাম। তাঁর বস একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পাঠিয়েছেন, সেইসঙ্গে একজন ইনভেস্টিগেটরকে পাঠিয়েছেন ব্যাপারটার তদন্ত করার জন্যে।

'ডাক্তার এখন ভদ্রলোকের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন।

'ইনভেস্টিগেটরের রিপোর্ট এই যে, আমার হাতেই আছে এখন। এতে বলা হয়েছে সাধারণভাবে এই দুর্ঘটনাটা ঘটেনি, ঘটেছে ওই কোম্পানির হেলাফেলা আর অসতর্কভাবে কাজ করার কারণে।

'ইতিমধ্যেই আমি আমাদের উকিলদের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা বলেছেন কোম্পানির বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করবেন আর ভদ্রলোক যাতে উচিত বিচার পান সেটা দেখবেন।'

সবাই হাততালি দিতে গেল। কিন্তু হাত তুলে লোকটা ওদের থামাল। 'বন্ধুগণ, ওই ভদ্রলোকের স্ত্রী আজ এখানে আমাদের মাঝে রয়েছেন। কম্পেনসেশন বোর্ড তাঁকে যে টাকা দিয়েছে, তাতে তাঁর ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়তো কোনমতে জুটবে, কিন্তু ওই টাকা থেকে বাড়ি ভাড়া দেয়া সম্ভব হবে না। এ ছাড়া গ্যাসের বিল, ইলেকট্রিক বিল তো রয়েছেই। আমি জানি পকেট থেকে বাড়তি একটা পেনি বের করতেও কষ্ট হবে

আপনাদের, কিন্তু এর মধ্যে থেকেই তাঁকে যতটা পারেন সহযোগিতা করতে অনুরোধ করব আমি। আজকে তাঁর বেলায় যে ঘটনাটা ঘটেছে, একদিন আপনাদের বেলায়ও সেরকম কিছু ঘটতে পারে, তখন এভাবেই আপনাদের পরিবারকেও সাহায্য করা হবে।

'সবাইকে আমাদের একসঙ্গে থেকে কাজ করতে হবে। সবাইকে একসঙ্গে থেকে লড়াই করতে হবে।'

অনেকটা শান্ত হয়ে এল তার কণ্ঠস্বর। আত্মবিশ্বাসে ভরা। 'আমাদেরও বাঁচার অধিকার আছে, কাজ করে খাওয়ার অধিকার আছে। জোর করে হলেও সেটা আদায় করে নিতে হবে আমাদের। মনে রাখবেন, পার্টি যত শক্তিশালী হবে, যত বেশি সদস্য হবে, তত বেশি পরিচিতি পাব আমরা, আমাদের মৌলিক অধিকার আদায় করতে সুবিধে হবে। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, যত বেশি করে পারেন নতুন নতুন সদস্য নিয়ে আসবেন। বেশি করে আমাদের পত্রিকা ও পুস্তিকা বিক্রি করবেন। তবে সবচেয়ে বেশি, আমি চাই, আপনাদের সবটুকু সমর্থন এই ক্লাবের প্রতি দেবেন, যাতে ক্লাবও আপনাদের সমর্থন জোগাতে পারে।'

টেবিল থেকে নেমে এল লোকটা। জনতা গিয়ে ঘিরে ধরল তাকে। একসঙ্গে কথা বলছে সবাই।

আমার পাশে দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে তাকালাম। ওর কথা বিশেষ ভাবছি না এখন আর। সত্যি কথা বলতে কী, এই ক্লাবের কোন সদস্যকে নিয়েই মাথা ঘামালাম না। হ্যারিকে বলতে শুনেছি এখানকার বেশির ভাগ সদস্যই নাকি সুযোগ পেলেও কাজ করতে চায় না। তবে সেটা কতখানি সত্যি জানি না।

আবার মেয়েটার দিকে তাকালাম। চোখ জ্বলজ্বল করছে। মুখটা ফ্যাকাসে। গালের রুজ আর ঠোঁটের লিপস্টিক যেন সেই ফ্যাকাসে চামড়ার পটভূমিতে প্রকট হয়ে উঠেছে। আমার দিকে ঘুরল সে। হাত বাড়িয়ে দিল: 'তুমি তো কাজ করো। দাও, টাকা দাও।'

একটা সিকি বের করলাম।

'এরচেয়ে অনেক বেশি দিতে পারো তুমি,' ও বলল। 'এক ডলার দাও।'

হেসে একটা ডলার বের করে দিলাম ওকে। 'তুমি তো বলেছিলে বিনে পয়সায় খাওয়ানো হয় এখানে, অথচ অন্যখানে যা দিতে হতো তাই দিতে হচ্ছে।'

শীতলকণ্ঠে মেয়েটা বলল: 'কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটুক, তখন বুঝবে এই টাকাটার কী দাম।' ডলারটা নিয়ে গিয়ে যে লোকটা বক্তৃতা দিয়েছে তার হাতে তুলে দিল ও। কোথায় পেয়েছে জিজ্ঞেস করল লোকটা, বুঝতে পারলাম মেয়েটাকে হাত তুলে আমার দিকে দেখাতে দেখে।

চারপাশের ভিড় সরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল সে। 'যা দিলে তার জন্যে ধন্যবাদ,' একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'আর কেউ এত বেশি দিতে পারবে না।'

'আমি কাজ করি,' ওর হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললাম।

'কাজ তো এখানকার সবাই করবে যদি সুযোগ পায়,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল

লোকটা।

'আমি আসলে তা বলিনি। বলতে চেয়েছি দেয়ার সামর্থ্য আছে আমার।'

'তুমি এখানে নতুন। আগে কখনও দেখিনি।'

'আমি ফ্র্যাঙ্ক কেইন,' জবাব দিলাম: 'নীচতলায় কাজ করি।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' হাসিমুখে বলল সে। 'আশা করি এখন থেকে নিয়মিত দেখব।'

'হ্যাঁ, দেখবেন।'

আবার হেসে সরে গেল সে।

আমার কাছে এল মেয়েটা। 'জেরোর সঙ্গে কথা বললে দেখলাম,' এমন ভঙ্গিতে বলল ও, যেন দেবতার সঙ্গে কথা বলেছি।'

'হ্যাঁ,' বললাম: 'বক্তৃতা শেষ হয়ে থাকলে চলো আমরা যাই। ফোর্টি-সেকেন্ড স্ট্রিটের শেষ শো হয়তো এখনও গেলে ধরতে পারব। ও, ভাল কথা, তোমার নামটাই তো জানা হয়নি এখনও।'

'আমি টেরি,' মেয়েটা বলল। 'তোমার নাম আমি জানি, ফ্র্যাঙ্ক, স্টোরে শুনেছি।'

'চলো চলো। নাকি সারারাত এখানেই থাকতে চাও?'

'বেশ, চলো। এক মিনিট। গালে একটু পাউডার ঘষে আসি।' বলে চলে গেল ও।

লেডিস রুমে ঢুকতে দেখলাম ওকে। হঠাৎ করেই ওকে পেতে ইচ্ছে করল আমার। কতকাল মেয়েসঙ্গ পাই না। 'খারাপ না মেয়েটা,' ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে থাকলাম। 'আর কে জানে? আজ রাতেই হয়তো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠবে আমার প্রতি।'

দুই

সেরাতে আর কিছু ঘটল না। টেরির সঙ্গে ডেট করলাম আমি। পরদিন বিকেলে দ্বীপে সাঁতার কাটতে গেলাম। মেয়েটা সহজভাবেই মেশে, তবে পটানো কঠিন। অনেক সাহসী কথাই বলে, অনেক সাহসী ভঙ্গি দেখায়, কিন্তু সেটা ওর অভিনয়। ও যতখানি মেশে ততখানি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, তার বেশি হাত বাড়ালেই থাপ্পড় খেতে হয়।

'আমি বুঝি না,' মিষ্টি একটা হাসি দিয়ে বলল ও, আমি যে কষ্ট পাচ্ছি তাতে যেন মজা পাচ্ছে: 'তোমরা পুরুষরা সবাই এক। তোমরা ভাবো কোনও মেয়েকে বেড়াতে নিয়ে গেলে তার কাছ থেকে সব পাবার অধিকার রাখো। কেন, শুধু বেড়ানোর আনন্দটা নিয়ে থাকতে পারো না?'

'কিন্তু বেবি,' নিজের কানেই কেমন বোকার মত শোনাল আমার কৈফিয়তটা: 'তুমি এ রকম নিষ্ঠুরতা করতে পারো না। একটা মানুষকে পাগল করে দেয়ার পর। এসো, ব্যাপারটাকে স্পোর্টিংলি নাও। কিছুই হবে না।'

কিন্তু ওর মন গলল না। তবে ওর কারণে ওপরতলার নিয়মিত সদস্য হয়ে গেলাম আমি। ভাবলাম কয়েকটা পেনি খরচ করলে এমন কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না আমার।

এরপর টেরির সঙ্গে বুধবার রাতে ডেট করলাম। রোববারে যেতে চাইলাম না আর, কারণ সেদিন বেরোলে অনেক খরচ হয়, অথচ আমার কোনও লাভ হয় না। মাঝখান থেকে গরম হয়ে বাড়ি ফিরি, সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফটানি, অস্থির বিনিদ্র রাত কাটে আমার। কোনও পতিতালয়ে চলে যেতে পারি, কিন্তু ইচ্ছে করে না, ওদের কাণ্ডকারখানা যা দেখে এসেছি তাতে ওসব জায়গায় যেতে মন চায় না। বুধবারে টেরিকে নিয়ে একটা শো'তে গেলাম, তারপর ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বারান্দায় কয়েক মিনিট কাটালাম, কয়েকবার চুমুটুমু খাওয়া ও গায়ে হাত দেয়ার বেশি আর কিছু ঘটল না। বাড়ি ফিরে এলাম। সারাদিন কাজ করেছি, ভীষণ ক্লান্তি লাগছে, ঘুমিয়ে পড়লাম।

বৃহস্পতিবার বিকেলে একটা বাড়িতে মাল ডেলিভারি দিয়ে আসতে গেলাম। গরম হয়ে আছি আমি। আগের রাতে টেরির পোশাকের ভিতর হাত ঢুকিয়েছিলাম। বুকে হাত দিলে কিছু বলেনি ও, কিন্তু যেই দুই ঊরুর মাঝখানে হাতটা নিয়েছি অমনি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আমাকে। ওর কেমন লেগেছে আমি জানি না, কিন্তু ভাবনাটা আমাকে শান্তিতে থাকতে দিল না। বার বার ফিরে আসতে থাকল কল্পনায়।

বেল বাজালাম। দরজা খুলে দিল এক তরুণী। মাথায় ফ্যাকাসে সোনালি চুল,

চোখা চিবুক, পরনের পোশাকটা পুরানো আর মলিন। আমাদের দোকানের নতুন খরিদ্দার।

'মুদির জিনিস,' ভিতর বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললাম আমি। 'এক ডলার পঁচিশ সেন্ট।' হ্যারি আমাকে বলে দিয়েছে কোনমতেই যেন বাকিতে দিয়ে না যাই।

'নিয়ে আসুন, পি-জ, রান্নাঘরে রাখুন,' নিচুস্বরে বলল ও।

ঘরে ঢুকে প্যাকেটগুলো নামিয়ে রেখে ফিরে তাকালাম ওর দিকে।

ক্ষুধার্ত চোখে বাক্সগুলোর দিকে তাকাল তরুণী। 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার স্বামী চলে আসবে। টাকা আনতে গেছে ও। আপনি কি কিছুক্ষণ পরে এসে টাকাটা নিয়ে যেতে পারবেন?'

'সরি, ম্যা'ম,' আমি বললাম: 'রেখে যেতে পারলে খুশিই হতাম। কিন্তু বাকিতে দিতে পারব না।' প্যাকেটগুলো আবার তুলে নিতে শুরু করলাম।

'একটু দাঁড়ান,' বিব্রত ভঙ্গিতে বলল ও: 'কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে পারবেন? যে কোন সময় চলে আসবে ও।' ছয় বছরের একটা বাচ্চা ঘরে ঢুকল। মহিলার মেয়ে। মেয়েটাকে কোলে তুলে নিল ও। 'বসুন না, দাঁড়িয়ে আছেন কেন।'

একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালাম। মহিলাকেও একটা সাধলাম। নিল না ও। সিগারেটটা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। 'নাহ্, দেরি হয়ে যাচ্ছে। বস রাগ করবে।'

'আর কয়েকটা মিনিট, পি-জ,' মহিলা বলল: 'ওর আসার সময় হয়ে গেছে।' জানালার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল ও। 'চলে আসবে।' অস্থির শোনাল ওর কণ্ঠ।

এলেই বা কী, ভাবলাম, টাকা আনতে পারবে না। বুঝতে পারছি মালগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই হবে। তবু আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়ালাম।

'সরি, লেডি,' বললাম: 'আর থাকতে পারব না। আপনার স্বামী এলে দোকানে পাঠাবেন, প্যাকেটগুলো এভাবেই থাকবে, দিয়ে দেব।' প্যাকেটগুলো বাক্সে ভরে কাঁধে তুলে নিলাম।

'পি-জ,' ককিয়ে উঠল মহিলা: 'নেবেন না। রেখে যান। ও আসামাত্র টাকা দিয়ে দোকানে পাঠাব, কথা দিচ্ছি।'

'দেখুন, আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি। প্যাকেটগুলো রেখে যেতে পারলে খুশিই হতাম কিন্তু পারছি না। আমি চাই না বস আমাকে চাকরি থেকে খেদাক।' মহিলার ককানি আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার নিজেরও ইচ্ছে হচ্ছে জিনিসগুলো রেখে যাই। কিন্তু ওটা মায়াকান্নাও হতে পারে। আমি শুনেছি ওরকম কাকুতি-মিনতিতে মাল দিয়ে আসতে গিয়ে অনেকেই ঠকেছে।

'কিন্তু সারাটা দিন কিছুই খাইনি আমরা,' মহিলা বলল। 'শুধু বাচ্চাটার মুখে সামান্য কিছু দিতে পেরেছি। আমার স্বামী গেছে কাজের সন্ধানে। আপনার টাকা আপনি পেয়ে যাবেন।'

'দেখুন,' আমি বললাম: 'এ সব কথা আমাকে বলে কী হবে? আমার বসকে বলুন। তিনি যদি বলেন, মাল রেখে যেতে আমার তো কোনও আপত্তি নেই।'

'বলেছিলাম,' বাচ্চাটাকে কোল থেকে নামিয়ে বসে পড়ল মহিলা।

ওর বলার ভঙ্গিতেই বস কী জবাব দিয়েছে আঁচ করে ফেলেছি। 'তাহলে আমি আর কী করতে পারি বলুন?' দরজার দিকে ফিরে তাকালাম। হঠাৎই কুবুদ্ধিটা চাড়া দিল মনে। মহিলার দিকে ফিরলাম। 'তবে,' বাক্যটা শেষ করলাম না।

আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল মহিলা। একটা মুহূর্তের জন্য আশার আলো দেখা গেল ওর চোখে। পরক্ষণে নিভে গেল। বুঝে গেল যা বোঝার। মুখ লাল হলো। নিজের এক হাত আরেক হাত দিয়ে চেপে ধরল।

ওর হাতের দিকে তাকালাম। ওগুলোকে প্রচুর খাটানোর ছাপ–লাল, কুৎসিত হয়ে গেছে। কাজ করতে করতে বয়েস হওয়ার আগেই হাতগুলোতে বয়েসের চিহ্ন পড়ে গেছে।

'না,' প্রায় ফিসফিস করে জবাব দিল সে। তারপর যেন নিজেকেই বলতে থাকল: 'না! না! না!'

'বেশ,' নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বললাম: 'তাহলে আমার আর কিছু করার নেই। একটা সুযোগ দিয়েছিলাম। আপনি ভাল করেই জানেন কাজ এত সস্তা নয়, আপনার স্বামীরও পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।' দরজার কাছে গিয়ে নবে হাত রাখলাম।

'দাঁড়ান,' মহিলা ডাকল। 'আমাকে একটু ভাবার সময় দিন।' দুই হাতে মাথা রাখল ও। আমাদের দুজনের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকাতে থাকল বাচ্চাটা।

গা শিথিল করে দিয়ে বসে আছি আমি। মহিলার মাথায় ভাবনার চাকা বনবন করে ঘুরছে বুঝতে পারছি। তবে আমি জানি জবাবটা কী হবে।

অবশেষে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল ও। কী যেন চলে গেছে মুখ থেকে ঠিক ধরতে পারলাম না। তবে এটা যেন আগের সেই চেহারা নয়। বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল: 'লরা, নীচে গিয়ে বাবার জন্যে অপেক্ষা করো। ও এলে জানালা দিয়ে ডেকে বোলো আমাকে।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে উঠে দরজার দিকে এগোল বাচ্চাটা। পাল-া খুলে দিলাম আমি। একবার ফিরে তাকিয়ে আমাদের দিকে হাত নেড়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ও। নীচে না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, তারপর দরজাটা লাগিয়ে দিলাম। প্যাকেটটা নামিয়ে রেখে মহিলার দিকে তাকালাম।

একটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আমাকে নিয়ে বেডরুমে এল ও। ছোট একটা ঘর, ছোট্ট জানালা। বিছানার পায়ের কাছে ঝোলানো মেরিমাতার ছবি। ড্রেসারে রাখা মহিলার স্বামীর ছবি। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভাবল মহিলা, তারপর বলল: 'না, এখানে নয়।' বলে দরজা দিয়ে পারলারে ঢুকল।

অনুসরণ করলাম আমি। একটা কাউচে বসল ও, জুতো খুলল, তারপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি কাউচের কিনারে বসলাম। গলার কাছে শিরার দপ্‌দপানি টের পাচ্ছি, শক্ত হয়ে গেছে তলপেটের পেশি। ওর দুই উরুর মাঝে হাত রাখলাম। বরফের মত শীতল ওর চামড়া, আমার স্পর্শে চমকে উঠল ও। তারপর ভুলটা করলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর মুখের দিকে তাকালাম।

কোনও মহিলার মুখ নয় যেন, শূন্য একটা ঝিনুকের খোসা। পুরো একটা মিনিট ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ওই একটা মিনিটে একটা পেশিও নাড়ায়নি ও। যেভাবে শুয়ে ছিল সেভাবেই পড়ে রইল, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। টেনেটুনে আমার ট্রাউজার ঠিক করলাম। মহিলার মুখ দেখে মনে হলো যেন কিছু বুঝতে পারছে না, তারপর সে-ও উঠে বসল। 'প্যাকেটগুলো রেখে দিন,' বলে রান্নাঘরের দিকে ঘুরতে গেলাম।

'আপনি,' বলে এক পা এগিয়ে এসে হঠাৎ আমার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল ও।

মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আগেই ওকে ধরে ফেললাম। হঠাৎ করেই গরম হয়ে গেছে ওর শরীর। শীতলতা কেটে গিয়ে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। ওর মাথা আমার কাঁধে। ও কাঁদছে। চোখে পানি নেই। পায়ে যেন বল নেই। পড়ে যাবে ভয়ে শক্ত করে ধরে রাখতে হলো ওকে।

'আপনি,' ফোঁপাতে লাগল ও: 'আপনি জানেন না আমাদের ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে গেছে। কতবার বাইরে থেকে নিজের খাবার না খেয়ে বাচ্চাটাকে এনে দিয়েছে মাইক। কতবার উপোস করতে হয়েছে।'

ভেঙে পড়েছে মহিলা। আমার দুই বাহুর মধ্যে নেতিয়ে পড়ে স্বামীর ত্যাগের কথা বলে যাচ্ছে। বুঝলাম বাচ্চাটার মুখে খাবার জোগানোর জন্য মহিলারও নিজেকে আমার কাছে সমর্পণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। লজ্জা পেলাম।

'শান্ত হোন!' ওর বিড়বিড়ানিতে বাধা দিলাম। 'থামুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল ও। কৃতজ্ঞতায় ভরে গেছে। চোখে চোখে তাকিয়ে বলল: 'আপনি ভাল লোক।'

'জানি, জানি,' বিব্রত হাসি হাসলাম। গাধা কেইন, মনে মনে নিজেকে বকা দিলাম, এক নম্বরের ছাগল!

একসঙ্গে রান্নাঘরে হেঁটে এলাম দুজনে। দরজার কাছে আমাকে থামাল ও। বলল: 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ও কিছু না।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে রাস্তায় বেরোলাম। অর্ধেক ব-ক পার হয়ে এসে বাচ্চাটাকে দেখলাম। একটা লোক দৌড়ে এসে ওকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল।

'বাবা, বাবা!'

মেয়েটাকে নিয়ে নামতে লাগল লোকটা। 'লরি,' সুরেলা কণ্ঠে বলল: 'তোমার বাবা চাকরি পেয়েছে!'

ওদের পাশ কাটানোর সময় লোকটাকে অভিনন্দন জানালাম। না থেমে হাঁটতে থাকলাম।

একটা সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা চুলকাল লোকটা। হয়তো কোথায় আমাকে দেখেছে মনে করার চেষ্টা করছে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বাসার দিকে দৌড় দিল।

খেপামি পাচ্ছে আমার। স্টোরের যতই কাছে যাচ্ছি খেপামিটা বাড়ছে। ওই টেরি কুত্তিটার জন্যই আজ এই ভয়ানক কাণ্ডটা করে এসেছি আমি! ও আমাকে উত্তেজিত করে করে এই পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, এর জন্য ওকে ভুগতে হবে। আমি ওকে ছাড়ব না।

তিন

পরদিন সকালে ওই মহিলা দোকানে এল। আমার কাছে এসে দাঁড়াল। ওর পিছনে ছায়ার মত লেগে রয়েছে বাচ্চাটা। আগের দিনের চেয়ে অন্যরকম লাগছে মহিলাকে। আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। পরাজয়ের গ-ানি চলে গেছে চেহারা থেকে।

'আমার স্বামী কাজ পেয়েছে,' কোনরকম ভূমিকা না করে বলল ও।

'আমি জানি,' বললাম। 'কাল রাস্তায় দেখা হয়েছে।'

'আরও কয়েকটা জিনিস বাকিতে দিতে পারবেন? কাল ও বেতন পেলে দিয়ে দেব।'

'দাঁড়ান, বসকে জিজ্ঞেস করে আসি।' হ্যারির কাছে এসে বুঝিয়ে বললাম সব। মহিলার পক্ষে কিছুটা সুপারিশই করলাম বলা চলে। আগের দিনের ঘটনার জন্য আমি ভীষণ লজ্জিত। মহিলা আসার আগে মনের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। বস আমাকে বলল দিয়ে দিতে, যদি আমি মনে করি কোন অসুবিধে হবে না।

মহিলার কাছে ফিরে এসে যা যা চাইল দিয়ে দিলাম। জিনিসগুলো প্যাকেট করতে করতে গতদিনের ঘটনার জন্য আকারে-ইঙ্গিতে ক্ষমা চাইতে লাগলাম। নিচুস্বরে কথা বললাম যাতে আর কেউ না শুনে ফেলে। 'আপনার স্বামী চাকরি পেয়েছে, আমি খুশি হয়েছি।'

মহিলা জবাব দিল না।

'গতকালকের ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত,' এবার সরাসরি বললাম। 'কেন যে ওই কাণ্ডটা করলাম জানি না। বাকিতে জিনিস দিয়ে এসে ফাঁকিতে পড়ার অনেক ঘটনা শুনেছি। আমি বুঝতে পারি না কাকে বিশ্বাস করব আর কাকে করব না।'

'সবাইকেই বিশ্বাস করে দেখেন না কেন কাকে করা যায় আর কাকে যায় না?' আবার লাল হয়ে উঠছে মহিলার মুখ।

আগের চেয়ে খারাপ লাগল আমার। কোন জবাব দিতে পারলাম না। আমি ওকে বোঝাতে পারলাম না কিছু লোক ফাঁকি দেয়, ওই খারাপ মানুষগুলোই ভাল মানুষগুলোর জন্য পরিস্থিতি খারাপ করে ফেলে। মালগুলো প্যাকেট করা হয়ে গেলে ওকে দিয়ে দিলাম। ও চলে গেল।

বিকেলবেলা টেরি এল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'এক বোতল কেচআপ। তাড়াতাড়ি।'

'কেচআপ ছাড়া আর কিছু খাও না নাকি তুমি?' না বলে পারলাম না। ওর ওপর মেজাজ খারাপ হয়ে আছে আমার। যে আচরণ করে, তাতে বহু আগেই ওকে পিটুনি দেয়া দরকার ছিল। যাই হোক, তাক থেকে বোতল নামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: 'আর কিছু?'

মাথা নাড়ল ও।

বোতলটা ব্যাগে ভরে দিতে দিতে বললাম: 'দশ সেন্ট, পি-জ।'

পয়সা বের করে দিল ও। 'কাল মিটিঙে আসছ তো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম। 'আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

ও চলে গেল।

হ্যারি এগিয়ে এল। 'ওইসব মিটিঙে যাও কেন? রিলিফ খেয়ে বাঁচে ওরা। কাজ দিলেও করতে চায় না।'

'কী জানি, আমার কাছে তো ওদেরকে ভালই লাগে,' বললাম। 'ওপরের আড্ডাটাও বেশ মজার।'

আমার দিকে তাকাল বস। 'কমুনিস্ট হয়ে যাচ্ছ নাকি!'

হেসে উঠলাম। 'কমুনিস্ট কী জিনিস তাই জানি না। ওরকম কাউকে দেখলেও চিনতে পারব না। ওপরের ওই মানুষগুলোকে অন্য মানুষদের চেয়ে আলাদা লাগে না আমার কাছে। ওরা কাজ চায়, খাবার চায়, একটু সুখের মুখ দেখতে চায়। আমিও তাই চাই, কিন্তু আমি তো কমুনিস্ট নই।'

'ওরা মুক্ত ভালাবাসায় বিশ্বাসী,' বস বলল। 'তুমি চাইলেও ওদের কেউ তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না।'

'তা তো জানতাম না,' জবাব দিলাম। 'ওদের অনেককেই তো দেখি বিবাহিত।'

'ওরা যদি ভালই হবে, ওদের ছেলেমেয়েদের ওভাবে অবাধে বিচরণ করতে দিত না, টেরির মত। ওপরের অনেকেই ওর সঙ্গে মেলামেশা করে।'

বসের মন্তব্যে বিরক্ত হলাম। গরম গরম একটা জবাব দিতে গিয়েও সামলে নিয়ে হাসলাম। 'ওর যা স্বভাব, সম্ভব হলে অনেকেই ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে চাইবে।'

একজন খরিদ্দার ঢুকল দোকানে। তার দিকে এগিয়ে গেল হ্যারি। চুপ করে বসে না থেকে আমিও কাজে ব্যস্ত হলাম, বাক্স থেকে মাল খুলে সাজিয়ে রাখতে লাগলাম। আলোচনাটার কথা ভুলে গেলাম দুজনেই।

ওই মাসেই স্টোরের একজন কর্মচারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য শহরে চলে গেল। আমাকে প্রমোশন দিয়ে পুরোদস্তুর স্টোর ক্লার্ক বানিয়ে দেয়া হলো। বেতন করে দেয়া হলো পনেরো ডলার। ওদিকে ভাল কাজ দেখানোয় অটোর আইস-ক্রিম পার্লারেও উন্নতি হলো আমার, রোববারের সোডা ক্লার্ক হয়ে গেলাম আমি। কিছু টাকা জমিয়ে ফেলতে পারলাম। নতুন কাপড় কিনলাম। কিছুটা ওজনও বাড়ল আমার। মনমেজাজ ভাল থাকে। মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি। আশপাশের সবাই আমার পরিচিত হয়ে গেল। আমার চাকরিতে সামান্যতম ফাঁকি না দিয়েও ক্লাবের কাজে মনোনিবেশ করতে পারি। ওখানকার সদস্যরাও আমার ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করেছে।

থ্যাংকসগিভিঙের এক সপ্তাহ পর এক বিকেলে স্টোরের কাজ সেরে বেরোলে আমাকে ডাক দিল জেরো ব্রাউনিং। শহরতলীর দিকে হেঁটে চললাম দুজনে।

'কোথায় থাকো তুমি, ফ্র্যাঙ্ক?' আমাকে জিজ্ঞেস করল ও।

'মিলসে।' অবাক হয়ে ভাবছি আমার প্রতি আকর্ষণ দেখাচ্ছে কেন জেরো।

'কোথায় যাবে এখন?'

'প্রথমে খাব, তারপর বাসায় যাব।'

'আমিও যদি তোমার সঙ্গে বসে খাই, আপত্তি আছে?'

'না, মোটেও না,' আরও অবাক হলাম আমি। 'বরং ভালই লাগবে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ও। 'তোমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই?'

মাথা নাড়লাম।

'তোমার বয়েস কত?'

'বাইশ।' চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকালাম। 'দেখুন, আমাকে যত খুশি প্রশ্ন করুন, জবাব দিতে কোন আপত্তি নেই আমার, কিন্তু হঠাৎ কেন আমার প্রতি আপনার এই আগ্রহ, তা বলবেন কি?'

হেসে উঠল ও। 'প্রশ্নটার জবাব আমারও জানা নেই। তবে তুমি আমার আগ্রহ জাগিয়েছ, এটুকু বলতে পারি।'

'কেন? আমি কি আর কারও তুলনায় আলাদা কিছু?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কেন, তুমি নিজে বোঝো না?'

'না, বুঝি না।' মোড় নিয়ে একটা ক্যাফেটিরিয়ার দিকে ঘুরলাম আমরা।

কাউন্টার থেকে যার যার খাবারের ট্রে তুলে নিলাম। তারপর একটা টেবিলে বসে খাওয়া শুরু করলাম।

কয়েকটা মিনিট চুপচাপ খেয়ে গেলাম আমরা। তারপর খাবার চিবাতে চিবাত কথা বলতে লাগলাম। 'এই যেমন ধরো, তোমার চুল।'

নিজের অজান্তেই ঝট করে মাথায় হাত চলে গেল আমার। 'চুলে কী হয়েছে? ঠিকমত আঁচড়ানো হয়নি?'

হাসতে শুরু করল ও। 'না, তা না। অন্য রকম। তুমিই তো জিজ্ঞেস করেছিলে তুমি অন্যদের তুলনায় আলাদা কিনা।'

'অন্যদের চুলের সঙ্গে আমার চুলের কোনও পার্থক্য নেই।'

'আছে,' হেসে বলল ও। 'এর মধ্যে ধূসরতা আছে–কম, তবে চোখে পড়ে। আর এত কম বয়েসে মানুষের চুল ধূসর হয় না।'

'আসলে আমি অনেক বেশি উদ্বেগে ভুগি, হয়তো সেজন্যেই পেকেছে।'

মাথা নাড়ল ও। 'না, উদ্বেগে ভোগা লোক নও তুমি। আমার ধারণা অনেক বেশি জটিল পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে আসতে হয়েছে তোমাকে।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

মুখের খাবার গিলে নিল ও। 'এই ছোটখাট নানা জিনিস থেকে। তোমার আচার, আচরণ। লোকের দিকে তুমি এক ধরনের আগ্রহ নিয়ে তাকাও, মনে হয় তুমি ওদের দেখে মজা পাচ্ছ। তোমার কথা বলার ধরন–কর্কশ কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী। তোমার হাঁটার

ঢং–মনে হয় অনেক বুঝেশুনে মেপে মেপে পা ফেলো–সাবধানী জানোয়ারের মত।' আবার মুখে খাবার পুরল ও। 'এই যে তুমি এখন এই রেস্টুরেন্টে বসলে, দেয়ালের দিকে পিছন করে, এটা সাবধানতার লক্ষণ। যে ভাবে লোকেদের দিকে তাকাচ্ছ, ওরা কীভাবে খাচ্ছে, কীভাবে কথা বলছে, দেখছ। কাকে খুঁজছ তুমি? কিংবা কার কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছ?'

হাসলাম। 'আমি জানতাম না আমি এমন করি। কারও কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাই না আমি। হয়তো এটাই আমার স্বভাব।'

'স্বভাব হওয়ার পিছনে কারণ থাকে,' ও বলল।

খাবার শেষ হয়ে গেল আমাদের। উঠে গিয়ে কফি নিয়ে এসে টেবিলে রাখলাম।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট টানছে জেরো। ঘড়ির চেনটা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে আঙুলে পাকাচ্ছে।

আমি আসতে ঘড়িটা পকেট থেকে বের করে আমাকে দিল।

হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলাম। ঘড়ির পিছনে খোদাই করা কয়েকটা অক্ষর। 'চাবিটা অদ্ভুত চেহারার,' ওকে বললাম। 'এমন আর দেখিনি।'

হেসে উঠল ও। 'কলেজে যারা পড়ে তাদের অনেকের ঘড়িতেই এ রকম থাকে।'

'আপনি কলেজে পড়েছেন?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

ঘড়িটা ওকে ফিরিয়ে দিলাম। মার্টিন আর জেরির কথা ভাবলাম। এতদিনে নিশ্চয় কলেজ পাস করে বেরিয়ে গেছে। বললাম: 'আমার কয়েকজন বন্ধু আছে, যারা কলেজে পড়েছে।'

আগ্রহী মনে হলো ওকে। 'কোথায়?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। 'জানি না। অনেক দিন কোন খোঁজ-খবর নেই।'

'তাহলে ওরা যে কলেজে গেছে জানলে কীভাবে?'

'আমি জানি, ওরা গেছে।'

'কীভাবে একজন আরেকজনকে হারিয়ে ফেলে ভাবলে অবাক লাগে,' আবেগ চাপা দিতে পারল না ও।

বরফ গলে গেল যেন আমাদের মাঝে। এরপর আর কথা বলতে অসুবিধে হলো না। সহজেই আলোচনা চালিয়ে যেতে পারলাম। এক ঘণ্টা কথা বললাম আমরা। আমার নিজের কথা ওকে জানালাম, এর আগে কাউকে বলিনি এ সব কথা। আগ্রহ নিয়ে শুনল ও। বন্ধু হয়ে গেলাম দুজনে।

চার

১৯৩২ থেকে '৩৩-এর শীতকালটা খুব খারাপ গেল। মানুষের কাজ নেই, খাবার নেই, রিলিফের ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হলো। শীতের কাপড় নেই। চারিদিকে হাহাকার।

তবে আমার অবস্থা এত খারাপ হলো না। আমি নিরাপদেই রইলাম। আমি খাবারও পাই। শীতেও কষ্ট পেতে হয় না। কারণ আমার একটা কাজ আছে।

ক্লাবের মিটিঙে গিয়ে বক্তৃতা শুনি, লোকের অভিযোগ শুনি, কোনটাই যেন বাস্তব মনে হয় না। ধীরে ধীরে হতাশায় ছেয়ে ফেলছে মানুষগুলোকে, কাজ পাওয়ার আশা হারিয়ে ফেলছে। যারা প্রতিদিন নিয়মিত কাজের আশায় বেরোত, তারাও হাল ছেড়ে দিল। কী হবে বেরিয়ে ভেবে বেরোনো বন্ধ করে দিল।

আমাদের স্টোরটা যে অ্যাভেনিউতে সেটার অনেক দোকানই বন্ধ হয়ে গেল। নানারকম গালভরা নামের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়ে সেগুলো বিক্রির চেষ্টা করা হতে লাগল, কিন্তু ক্রেতা নেই।

দাঙ্গা শুরু হলো। এখানে ওখানে শ্বেতাঙ্গরা ইহুদি ও নিগ্রোদের ওপর হামলা চালাল। ওদের ক্ষোভ, সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য আর বড় বড় জায়গাগুলো ইহুদিরা দখল করে রেখেছে। নিগ্রোরা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে।

প্রচণ্ড খারাপ একটা শীতকাল। এত খারাপ আর দেখিনি কখনও।

এ সময় একদিন ক্লাবে গেলাম। অর্ধেকই সদস্যই আসেনি। উপস্থিত যারা তারা নিচুস্বরে কথা বলছে। বাজনা নেই। নাচ নেই। ওসব করতে যে পয়সা খরচ হয় সেটা অনেক বেশি জরুরি কাজে লাগানো হচ্ছে।

আমি টেরির সঙ্গে কথা বলছি। সব সময়কার মতই অভিযোগে ভরা কণ্ঠ ওর: 'ধূর, আবার দেরি করে ফেললাম! এই, তুমি সাবধানে থাকো তো?'

হেসে বললাম: 'আমি সাবধানেই থাকি। তুমি বরং তোমার দিকে খেয়াল রেখো। যদি আটকা পড়ো, বাঁচাতে যাব ঠিকই, কিন্তু তখন আর আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না।'

খেপে গেল ও। 'আমি যে কেন তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাই বুঝি না! আমাকে নিয়ে তোমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। তুমি শুধু ভাবো তোমার "ওটা" নিয়ে।'

'সত্যিই কি আমি তোমার কাছ থেকে কিছু পাওয়া নিয়ে ভাবি?'

চোখ জ্বলে উঠল ওর। 'একদিন দেখবে আমি নেই। তখন বুঝবে।'

'মেয়েমানুষের অভাব নেই,' আমি বললাম।

ফেটে পড়ল ও। 'করো, যত খুশি রসিকতা করো, বুঝবে মজা! আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

'কে তোমাকে বিয়ে করবে?'

'আছে এক লোক। ভাল চাকরি করে। ফিফ্‌থ্‌ অ্যাভেনিউতে বাস চালায়। সত্যিকারের ভদ্রলোক। কোন মেয়েকে চাপাচাপি করে না।'

'তাই নাকি? তাহলে আর বসে আছো কেন? বিয়ে করে ফেল হাঁদাটাকে।'

'আসলেই তাই। এখনও করছি না কেন বুঝতে পারছি না।' আচমকা বদলে গেল ওর কণ্ঠস্বর। মোলায়েম আর আন্তরিক হয়ে উঠল। 'ফ্র্যাঙ্কি, তুমি কখনও বিয়ের কথা ভেবেছ?'

আতঙ্কিত হওয়ার ভান করে হাত তুললাম। 'আমাকে কি পাগল মনে হয় তোমার? সব মেয়েকে অখুশি করার সুযোগ ছেড়ে একজনকে করতে যাব কেন?' হেসে বললাম: 'প্রস্তাব দিলে নাকি? খুব তাড়াহুড়া হয়ে গেল কিন্তু।'

আবার খেপে গেল ও। 'হাসো। হাসো। বিয়েটা এ মাসেই করে ফেলব। তখন আঙুল চুষো।' গটমট করে হেঁটে সরে গেল ও।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কখন যে ও ঠিক কথাটা বলে বোঝা যায় না। কিন্তু যত যা-ই হোক, আমি এখন কাউকে বিয়ে করতে যাচ্ছি না।

বক্তৃতা দিতে টেবিলে উঠল জেরো। সবাইকে চুপ করার জন্য হাত তুলল। 'বন্ধুগণ,' শুরু করতে গেল ও। কিন্তু এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না।

জানালা দিয়ে একটা পাথর এসে পড়ল ঘরের ভিতর। তারপর আরও পাথর আসতে থাকল। একটা মিনিট পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা, কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না। টেবিলের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে জেরো। হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

আমি রয়েছি জানালার সবচেয়ে কাছে। আরেকটু এগিয়ে বাইরে তাকালাম। রাস্তায় বিশ-তিরিশ জন লোক জটলা করছে। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। কাউকে চিনতে পারলাম না। একটা হাত আমার হাত চেপে ধরল। টেরি।

'কী চায় ওরা?' জিজ্ঞেস করল ও। ভীত শোনাল কণ্ঠটা।

জবাবটা আমাকে দিতে হলো না। তার আগেই নীচ থেকে চিৎকার শোনা গেল: 'ওই শয়তান নিগ্রোটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও। এখানকার সাদা মেয়েগুলোর সঙ্গে কুকর্ম করে বেড়াবে ও, আর আমরা সেটা সহ্য করব, তা হবে না। সাদাদের সঙ্গে কী আচরণ করতে হয় আজ ওকে আমরা শিখিয়েই ছাড়ব।'

জেরোর দিকে ফিরে তাকালাম। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ও। একা। বাকি সবাই সরে গেছে দেয়ালের কাছে। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে ওরা। চাপাস্বরে চেঁচিয়ে উঠল এক মহিলা: 'পুলিশকে খবর দিচ্ছে না কেন কেউ?'

'আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব,' শান্তকণ্ঠে জেরো বলল। দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

'ওকে যেতে দিয়ো না, ফ্র্যাঙ্কি!' ফিসফিস করে বলল টেরি। 'ওরা ওকে মেরে ফেলবে!'

ওর কথায় যেন সম্বিত ফিরে এল আমার। 'জেরো, দাঁড়ান। বেরিয়ে গিয়ে কিছু করতে পারবেন না। আগে মহিলাদের বের করে দিই।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেল জেরো। ফিরে আসতে লাগল জানালার কাছে।

'আসবেন না, ওখানেই থাকুন!' আমি বললাম।

থমকে দাঁড়াল জেরো। আমার দিকে তাকাল।

জানালার দিকে ফিরলাম। 'ওকে যদি আপনাদের হাতে তুলে দিই,' রাস্তার লোকগুলোকে চিৎকার করে বললাম: 'বাকি সবাইকে যেতে দেবেন?'

নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করল ওরা। তারপর একজন চেঁচিয়ে বলল: 'দেব।'

'ঠিক আছে,' আমিও চেঁচিয়ে জবাব দিলাম: 'প্রথমে মহিলারা বেরিয়ে যাবে, তারপর পুরুষরা। সবাই বেরিয়ে গেলে আপনারা এসে ওকে নিয়ে যাবেন।'

'না!' আরেকটা লোক বলল: 'তা হবে না! তুমি আসবে ওর পিছে পিছে, সবার শেষে।'

'ঠিক আছে!' আমি জবাব দিলাম।

'ফ্র্যাঙ্কি, ও কাজ কোরো না। ওকে ওদের হাতে তুলে দিয়ো না,' ফিসফিস করে বলল টেরি।

'চুপ!' নিচুস্বরে ধমকে উঠলাম। 'ওকে ওরা ধরতে পাবে না। বেরিয়ে গিয়েই পুলিশকে খবর দেবে। তারপর বাড়ি গিয়ে বসে থাকবে, আর বেরোবে না, যতক্ষণ না আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করি।' তারপর জোরে জোরে সবাইকে শুনিয়ে বললাম: 'আপনারা বেরিয়ে যান, কোন অসুবিধে হবে না। এক সারিতে লাইন দিয়ে বেরোন। মাথা থেকে হ্যাট খুলে নিন যাতে ওরা বুঝতে পারে আপনারা সাদা। বাড়ি চলে যান, সকালের আগে আর বেরোবেন না। এখানে কারও সঙ্গে কথা বলবেন। বেরিয়েই সোজা বাড়ির দিকে হাঁটা দেবেন।'

একটা লোক প্রতিবাদ করল: 'জেরোকে ফেলে আমরা যাব না।'

'আমি আছি ওর সঙ্গে,' বললাম। 'যান এখন, বেরোন। মেয়েদের জখম করতে চান নাকি?'

দরজার দিকে রওনা হলো ওরা।

রাস্তা থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটা কণ্ঠ: 'নিগারটাকে জানালার কাছে আনো, যাতে আমরা বুঝতে পারি ও পালাচ্ছে না।'

আমার চালাকিটা ভেস্তে যেতে বসল। আমি ভেবেছিলাম জেরোকে বলব তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে গিয়ে পরের বিল্ডিঙের ছাত দিয়ে পালিয়ে যেতে। কিন্তু ওরা সময় না দিয়ে ওকে দেখতে চাইছে। এগিয়ে আসতে গেল জেরো।

আবার ওকে থামালাম। জোয়িকে চোখে পড়ল এ সময়। ওকে কাছে ডেকে এনে বললাম তাড়াতাড়ি ছাতে গিয়ে ট্র্যাপডোরের দরজাটা খুলে দিতে। তারপর ফিরে এসে সবার সঙ্গে বেরিয়ে যেতে। মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ও।

'এখন শুনুন সবাই,' ডেকে বললাম: 'এক সারিতে যাবেন। সময় নিয়ে, আস্তে আস্তে। আমাদের যত বেশি সময় দিতে পারেন, ততই ভাল।'

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা। তাড়াহুড়া করছে না, অস্থিরতা দেখাচ্ছে

না। জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি। বিল্ডিঙের সামনে দিয়ে সারির প্রথম কয়েকজনকে বেরোতে দেখলাম। উত্তেজিত জনতার পাশ দিয়ে দ্রুত সরে গেল ওরা, মোড়ের ওপাশে চোখের আড়ালে চলে গেল।

জনতার মধ্য থেকে চিৎকার করে উঠল একজন: 'নিগারটা কই?'

হাতের ইশারায় জেরোকে ডাকলাম। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল ও। শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। ভয় পেলেও সেটা প্রকাশ করছে না। বাইরে টেরিকে দেখলাম মোড়ের দিকে এগিয়ে যেতে। মোড়ে পৌঁছে ফিরে তাকিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল, তারপর চলে গেল। জানালার দিকে একটা পাথর উড়ে এল। চট করে মাথা নিচু করে ফেললাম। পাথরটা গিয়ে লাগল জেরোর চোয়ালে। নড়ল না ও।

নীরবে তাকিয়ে আছি ওর দিকে। পাথরের আঘাতে কেটে গিয়ে ওর গাল থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। মাথা ঘোরাল না ও। ব্যথা পাওয়ার কোন লক্ষণ দেখাল না। রক্ত বেরিয়ে গাল থেকে গলায়, সেখান থেকে গড়িয়ে নেমে পরিষ্কার শার্টের সাদা কলার লাল করে দিল। আমার রুমালটা বের করে দিলাম। নির্বিকার ভঙ্গিতে সেটা জখমের ওপর চেপে ধরল ও। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নীচের জনতার দিকে তাকিয়ে আছে।

'ওদের কাউকে চেনেন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ,' গলা সামান্য কেঁপে উঠল ওর। 'বেশির ভাগকেই চিনি।'

তারমানে ওই পাজিগুলোর কেউ কেউ কোন না কোন সময় এই ক্লাবের সদস্যও ছিল, ভাবলাম। কিছু বললাম না। জোয়ির জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। আমি চাইছি সবাই বেরিয়ে যাওয়ার আগেই ও ফিরে আসুক।

'ফ্র্যাঙ্ক!' দরজার কাছ থেকে ডাক দিল জোয়ি।

জানালার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলাম: 'হয়েছে?'

'হয়েছে,' নিচুস্বরে জবাব দিল ও।

'চলে যাও তাহলে!' আমি বললাম। 'মনে রেখো, তোমাকে বেরোতে হবে সবার শেষে।'

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুনলাম ওকে। জেরোকে বললাম: 'রেডি হোন। জোয়িকে বেরোতে দেখামাত্র দৌড় দেবেন আমার পিছে পিছে।'

জবাব দিল না ও।

আরও কয়েকটা পাথর উড়ে এল জানালা দিয়ে। মাথা নুইয়ে, এভাবে ওভাবে আমি ওগুলোকে কাটালাম, কিন্তু জেরো কিছুই না করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। জোয়িকে বিল্ডিং থেকে বেরোতে দেখলাম।

'এখন আমরা আসছি!' জনতার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললাম। জানালার কাছ থেকে সরার আগেই দেখলাম প্রবেশমুখের দিকে ছুটে আসছে কয়েকজন লোক। এখনও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জেরো। ওর হাত চেপে ধরে টান দিলাম: 'জলদি আসুন!'

জেরোকে টেনে নিয়ে দরজার দিকে ছুটলাম। ভিতর বারান্দায় বেরিয়ে এলাম।

নীচের সিঁড়িতে ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। আরেক দিকে ঘুরে ছুটলাম আমরা, ওপরে ওঠার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। সবচেয়ে ওপরের তলায় রয়েছে একটা লোহার মই, ওটা বেয়ে ছাতে উঠতে হয়। ছাতে বেরোনোর ঢাকনার মত দরজাটা খোলা। ওপরে তাকিয়ে আকাশ ও তারা দেখতে পাচ্ছি। মনে মনে জোয়িকে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

জেরোকে মইয়ের দিকে ঠেলে দিলাম। পিছনে রইলাম আমি। মই বেয়ে উঠে ছাতে চলে গেল ও। আমিও উঠছি, এ সময় নীচের ক্লাবরুম থেকে হট্টগোল শোনা গেল। আসবাবপত্র ভাঙার হুড়ুম-ধাড়ুম; তারপর ওপরে উঠে আসার সিঁড়িতে ছুটন্ত পায়ের শব্দ। মইয়ের একেবারে ওপরে পৌঁছে গেছি, এ সময় নীচ থেকে আমার এক পা টেনে ধরল একটা হাত। নীচে তাকালাম। যে লোকটা আমার পা চেপে ধরেছে মুক্ত পা'টা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে তার মুখে লাথি মারলাম। চিৎকার দিয়ে মই থেকে নীচে পড়ে গেল লোকটা। আমি বেরিয়ে এলাম ছাতে।

চারপাশে তাকালাম। গত তুষারপাতের চিহ্ন রয়ে গেছে এখনও ছাতের এখানে ওখানে। ছাতে বেরোনোর ট্র্যাপডোরের ঢাকনাটা উল্টে পড়ে আছে। ওটার পাশে পড়ে আছে একটা পুরানো ছেঁড়া গদি। গ্রীষ্মের কোনও রাতে বোধহয় এখানে শুয়েছিল কেউ, গদিটা ফেলে গেছে। জেরোকে বললাম: 'ধরুন তো!'

মুখের কাটা জায়গাটা থেকে এখনও রক্ত পড়ছে ওর। আমাকে ঢাকনাটা আবার জায়গামত বসাতে সাহায্য করল। দুজনে মিলে ধরাধরি করে ভারি গদিটা এনে ফেললাম ঢাকনার ওপর। এ জিনিসটা সামান্য সময় হলেও দেরি করিয়ে দেবে ছাতে যে উঠে আসতে চাইবে তাকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালাম। গায়ে গায়ে লাগানো ছাত। আশেপাশের কয়েকটা বিল্ডিঙে ছাতে ওঠার স্বাভাবিক দরজা রয়েছে। প্রথম দুটো বাড়ি পেরিয়ে গিয়ে একটা দরজা খোলার চেষ্টা করলাম। তালা দেয়া।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালাম যে বিল্ডিংটা থেকে এসেছি সেটার দিকে। ঢাকনাটা এখনও লাগানো রয়েছে, তবে গদিটা নড়ছে, নীচ থেকে খোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ঝাঁকি খেতে খেতে একপাশে অনেকখানি সরে এসেছে গদিটা। পরের বিল্ডিংটার দিকে দৌড় দিলাম।

এখানে ভাগ্য প্রসন্ন হলো আমাদের ওপর: দরজাটা খোলা। বাড়ির ভিতর দৌড়ে ঢুকলাম আমরা। সিঁড়ি বেয়ে নীচতলায় নেমে এলাম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম সিক্সটি-এইট্থ্ স্ট্রিটে। দৌড় দিলাম পার্কের দিকে।

রাস্তার দিকে ফিরে তাকালাম। আমাদের পিছু নিতে দেখলাম না কাউকে। সেন্ট্রাল পার্ক ওয়েস্টে একটা ট্যাক্সি পেয়ে তাতে চড়ে বসলাম। ড্রাইভারকে বললাম: 'চালাতে থাকুন। কোথায় যেতে হবে পরে বলছি।'

সিটে এলিয়ে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢাকল জেরো। ওর হাতের রুমালটা রক্তে ভিজে গেছে। মুখ থেকে ওর হাত সরিয়ে জখমটা দেখলাম।

'অনেকখানিই কেটেছে, ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার।' রুজভেল্ট হাসপাতালে

যেতে বললাম ড্রাইভারকে।

হাসপাতালে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ঢুকলাম। একজন ইন্টার্নি ডাক্তার জেরোকে দেখলেন। কয়েকটা সেলাই পড়ল কাটাটায়। একটা ফর্ম পূরণ করতে দিল আমাকে একজন নার্স। কীভাবে কেটেছিল, কী ঘটেছে, এ ধরনের অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হলো। জেরোর জখম ব্যান্ডেজ করে দিলেন ডাক্তার। বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকার পরামর্শ দিলেন। কয়েকটা বড়ি খেতে দিলেন। হাসপাতাল থেকে বেরোলাম আমরা।

রাস্তার পাশের একটা দোকানের ঘড়িতে দেখলাম এগারোটা বাজে। জেরোর দিকে তাকালাম। 'বাড়ি যেতে হবে, আপনাকে অসুস্থ লাগছে।'

হাসার চেষ্টা করল ও। 'হ্যাঁ, যেতে হবে। আমি একাই পারব। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, ফ্র্যাঙ্ক। তুমি একটা ছেলে বটে!'

'ওসব কথা বাদ দিন। এখন বলুন, একা যেতে পারবেন?'

'পারব। পারব তো নিশ্চয়।' কথা বলার সময় সামান্য টলে উঠল জেরো।

তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে ওকে সোজা করলাম। 'একা পারবেন না, আমাকে যেতে হবে। একসঙ্গে রাত কাটাতেও হতে পারে।'

কোন কথা বলল না ও।

'কোথায় থাকেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

কী যেন ভাবল জেরো। তারপর বলল: 'আমার মনে হয় না বাড়ি যাওয়া ঠিক হবে। আমার পরিবারের লোকেরা ঘাবড়ে যাবে। তারচেয়ে একজন বন্ধুর বাড়িতে যাই।'

'আপনার যেখানে সুবিধে,' আমি বললাম। 'তাড়াতাড়ি এখন বিশ্রাম দরকার আপনার।'

আবার একটা ট্যাক্সি নিলাম। গ্রিনউইচ ভিলেজে যেতে বলল জেরো। চলতে শুরু করল গাড়ি। সিটে হেলান দিল ও। কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলাম আমরা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ও। একটু পর পরই চোখের কোণ দিয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছি আমি।

অবশেষে নড়ে উঠল জেরো। সামনে ঝুঁকে দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল। ব্যথায় কাঁদছে না। কাঁদছে অপমানে, ক্ষোভে, দুঃখে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল: 'ভুল বোঝানো হয়েছে ওদের। আর কবে বুঝবে ওই বোকার দল?'

পাঁচ

সংস্কার করা একটা পুরানো ছোট অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে এসে থামল ট্যাক্সি। দরজার ওপরে একটা সাইনবোর্ড: স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট। আমি বেরিয়ে এসে ড্রাইভারের ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। জেরোকে নিয়ে বিল্ডিঙে ঢুকলাম। দুই সিঁড়ি ওপরে একটা দরজার সামনে থামল জেরো। বেল বাজাল। কাটাটা ব্যথা করছে খুব। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি আর থেকে থেকে চোখ-মুখ কোঁচকানো দেখেই বোঝা যায়।

আবার বেল বাজাল ও। মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পরেও কোনরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে আমি বললাম: 'আপনার বন্ধু বোধহয় ঘরে নেই।'

মাথা ঝাঁকাল জেরো। 'মনে হয়। অসুবিধে নেই, চাবি আছে আমার কাছে।' পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলল ও।

ওর পিছন পিছন ঘরে ঢুকলাম। আলো জ্বেলে দিল ও। ঘরের এককোণে একটা টাইপরাইটার আর যন্ত্রটার পাশে কয়েক তা ছেঁড়া কাগজ পড়ে থাকতে দেখলাম। ঘরের আরেক প্রান্তে একটা ইজেলে একটা অর্ধসমাপ্ত পুরুষের ছবি। একটা টেবিল আর কয়েকটা চেয়ার ছড়িয়ে রয়েছে সারা ঘরে। এক কোণে জানালার কাছ ঘেঁষে ছোট্ট একটা রান্নাঘর, তাতে একটা ছোট স্টোভ, একটা রিফ্রিজারেটর আর একটা বাসন-কোসন রাখার তাক। ঘরের অন্যপ্রান্তে পাশের ঘরে যাওয়ার দরজা। জেরোর কাঁধের ওপর দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছি, তাতে একজোড়া খাট আর একটা টেবিল। উঁকি দিয়ে ঘরের ভিতরে দেখে এল ও।

'বাড়ি নেই,' বলল জেরো। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল একটা মুহূর্ত, যেন ঠিক করতে পারছে না কী করবে। 'যাকগে, আমার আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না, আমি ঠিক হয়ে গেছি, তুমি বাড়ি যাও। অনেক রাত হয়ে গেছে। নিশ্চয় ক্লান্ত লাগছে তোমার।'

'যাব, তবে এখনই না। গরম ড্রিংক দিয়ে ট্যাবলেট গিলে আগে শুয়ে পড়ুন, তারপর।'

'আমার আর কোন সমস্যা নেই,' ও বলল।

আমার মনে হলো ও চাইছে আমি এখান থেকে চলে যাই। 'যান, গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ুন। আমি পানি গরম বসাচ্ছি। চা পাতা আছে এখানে?'

মাথা ঝাঁকাল জেরো। 'আছে। টি-ব্যাগ। রান্নাঘরে পাবে।'

ছোট রান্নাঘরটায় ঢুকলাম। একটা পাত্রে পানি ভরে স্টোভে চাপালাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে দেখছে জেরো। 'এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান না,' আমি বললাম।

ঘুরে অন্য ঘরটায় গিয়ে ঢুকল ও। দরজা লাগিয়ে দিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পানি ফুটতে শুরু করল। কাপ খুঁজে নিয়ে তাতে টি-ব্যাগ রাখলাম। কাপে পানি ঢেলে কাপটা হাতে বেরিয়ে এলাম রান্নাঘর থেকে। পাশের ঘরের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ডেকে বললাম: 'চা হয়ে গেছে।'

'ভিতরে এসো,' জবাব এল।

ঘরে ঢুকলাম। জানালার কাছ ঘেঁষে পাতা বিছানায় শুয়ে আছে জেরো। কাপড় বদলে নীল পাজামা পরেছে। বালিশের মধ্যে ডেবে রয়েছে ওর কালো মুখটা, তাতে সাদা ব্যান্ডেজ, ঘরের পরিবেশের সঙ্গে বেমানান। জিজ্ঞেস করলাম: 'কেমন লাগছে?'

'কিছুটা ভাল,' জবাব দিল ও। 'তবে প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।'

'এটা খান, আরও ভাল লাগবে,' কাপটা বাড়িয়ে দিলাম। 'ডাক্তার যে ট্যাবলেটগুলো দিয়েছেন, সেগুলো কোথায়?'

হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল ও। ছড়ানো হাতের তালুতে রাখা বড়িগুলো দেখাল।

'চা দিয়ে গিলে ফেলুন,' আদেশের সুরে বললাম আমি।

বড়িগুলো মুখে ফেলে কাপের জন্য হাত বাড়াল ও। দিলাম কাপটা। কাপ ধরার সময় লক্ষ করলাম ওর হাতটা এত কাঁপা কাঁপছে ঠিকমত ধরতেও পারছে না। আবার আমি কাপটা নিয়ে একটা চামচ দিয়ে আস্তে আস্তে ওকে খাইয়ে দিলাম। চা শেষ করে আবার বালিশে হেলান দিল ও।

চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলাম আমি। আমার দিকে তাকাল ও। জিজ্ঞেস করলাম: 'আর কিছু লাগবে?'

'না, থ্যাংকস,' ও জবাব দিল: 'অনেক করেছ আমার জন্যে।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। ওকে তন্দ্রায় ঢলে পড়তে দেখলাম। আচমকা চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল: 'ফ্র্যাঙ্ক, এখন আর ওই ক্লাবে যেতে কি ভয় পাবে তুমি?'

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম: 'তা তো পাবই।'

'উঁহুঁ, তুমি পাবে না,' ও বলল: 'আমি জানি। ওখানে তোমার চোখের একটা পাপড়ি কাঁপতে দেখিনি। মনে হচ্ছিল যেন মজা পাচ্ছিলে।'

'আপনিও ভয় পাননি,' আমি বললাম।

'না, পেয়েছি,' জোর দিয়ে বলল ও। 'আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি। আর তার জন্যে আমি লজ্জিত। আমি ভেবেছিলাম ওই ভয়ডরগুলো বহু আগেই ত্যাগ করে আসতে পেরেছি। একটা এক আজব ধরনের ভীতি, সাদা মানুষের প্রতি সংখ্যালঘু নিগ্রোদের ভীতি। বহুকাল আগেই এটা শিকড় গেড়ে বসেছে নিগ্রোদের মনে, আমার ধারণা।'

'ভয় পেলেও আপনি সেটা প্রকাশ করেননি,' আমি বললাম। 'ওসব ভুলে গিয়ে এখন ঘুমানোর চেষ্টা করুন তো। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'সত্যিই কি হবে?' ওর কণ্ঠে সন্দেহ। 'আজকের চেয়ে কাল কি আর অন্যরকম হবে? রাতারাতি বদলায় না লোকে। যখনই কোনও সমস্যা সৃষ্টি হয়, গণ্ডগোল চলতে

থাকে, লোকে খালি দুর্বলদের খুঁজে বের করে। প্রতিশোধের নেশায় ওরা উপকার করেছে যারা তাদের কথাও ভুলে যায়।'

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম: 'ওসব মন থেকে দূর করে দিয়ে এখন ঘুমান। বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' দরজার কাছে গিয়ে বললাম: 'আমি এপাশেই আছি। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে ডাকবেন।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'তুমি একটা আশ্চর্য ছেলে, ফ্র্যাঙ্ক।' হাসল ও। 'আগেও তোমাকে বলেছি, তাই না?'

'তাতে কি? আবার বলবেন কালকে,' বললাম। 'রাতে ভাল করে ঘুমিয়ে সকালে শান্ত মাথায় বলবেন। গুড নাইট।'

'গুড নাইট,' ও বলল।

আস্তে করে পিছনে লাগিয়ে দিলাম দরজাটা। কাপটা ধুয়ে মুছে তাকে রেখে দিলাম। তারপর বসে সিগারেট ধরালাম। অর্ধেক শেষ হয়ে যাবার পর মনে হলো জেরো আমাকে ডাকছে। উঠে গিয়ে উঁকি দিলাম। কিন্তু ও ঘুমাচ্ছে। আবার গিয়ে আগের জায়গায় বসলাম।

ইজেলের কাছে টেবিলে জেরোর একটা ছোট ছবি রাখা। উঠে গিয়ে তুলে নিলাম। চমৎকার করে আঁকা হয়েছে ছবিটা। জেরো যে এতটা সুদর্শন আগে খেয়াল করিনি। বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। খানিকক্ষণ দেখে ছবিটা আবার রেখে দিয়ে আগের জায়গায় এসে বসল। আচমকা ঘড়ি দেখার কথা মনে হলো। একটার বেশি বাজে। তারমানে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আবার জেগে উঠলাম দরজার তালা খোলার শব্দে। চোখ চলে গেল ঘড়ির দিকে। সাড়ে তিনটা বাজে এখন। পাল-া খোলার অপেক্ষা করছি। দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একটা মেয়ে। আমাকে দেখে দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল।

মেয়েটা খুবই সুন্দরী। লাল চুল, ঘন বাদামী চোখ। কোটের সামনের দিকটা খোলা। তাতে ওর দারুণ ফিগারটা চোখে পড়ল। চামড়ার রঙ মাখন-সাদা। চোখ মিটমিট করলাম। ও, এই তাহলে কারণ। এজন্যই জেরো আমাকে বিদেয় করতে চেয়েছিল। উঠে দাঁড়ালাম।

'কে তুমি?' মেয়েটা যেমন সুন্দরী তেমন সুন্দর ওর কণ্ঠস্বর।

'ফ্র্যাঙ্ক কেইন, জেরোর বন্ধু।'

'জেরো কোথায়?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

বেডরুমের দিকে হাত তুললাম। 'ঘুমোচ্ছে। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে ওর, তাই আমাকে সঙ্গে আসতে হলো।'

দরজা লাগিয়ে দিল মেয়েটা। কোট খুলে নিল। আমার দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বেডরুমের দিকে এগোল। দরজা খুলে উঁকি দিল ভিতরে। জেরোকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলাম। ঘরে ঢুকে বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। জেরোকে ভাল করে দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আস্তে করে দরজাটা লাগিয়ে দিল।

সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটার মুখ। বললাম: 'ঘাবড়াবেন না। ও ঠিক হয়ে যাবে।'

'কী হয়েছিল?' মেয়েটা জানতে চাইল।

সিগারেট বের করে ওকেও একটা দিলাম। ওরটা আগে ধরিয়ে তারপর আমারটা ধরালাম। সব কথা খুলে বললাম ওকে। আমার কথা যখন শেষ হলো চেয়ারে নেতিয়ে পড়েছে ও।

'ভয়ঙ্কর ব্যাপার,' মেয়েটা বলল।

'আরও খারাপ হতে পারত,' আমি বললাম।

'ওর কথা বলছ তো। তুমি জানো না ক্লাবের জন্যে ও কতখানি করেছে। ওই ক্লাব নিয়ে ওর গর্বের অন্ত ছিল না। ও বলত, দেখো না, এটা তো মাত্র শুরু, ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল। সবাই তাদের জাতপাত চামড়ার রঙ ভুলে যখন এসে এক হয়ে যাবে, পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। অনেক মেরেছে নিশ্চয় ওকে।'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললাম: 'জখমটা বেশি গুরুতর নয়।'

'কাটা তো শুকিয়ে যাবে,' ও বলল: 'কিন্তু ওর ভিতরের জখম? ওটা তো কখনও শুকোবে না।'

আমার কোটটা তুলে নিলাম। 'আমি এখন যাই। এতক্ষণ বসে ছিলাম ঘরের মানুষ আসার জন্যে।'

'না,' তাড়াতাড়ি বাধা দিল মেয়েটা: 'যাবেন না। কতদূরে থাকেন জানি না, যেতে হয়তো অসুবিধে হবে, আজ রাতটা এখানেই কাটিয়ে যান। জেরোর সাথেই গিয়ে ঘুমোন। আমি এখানে কাউচে বসেই কাটিয়ে দিতে পারব। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে।'

'না,' আস্তে করে বললাম: 'থাকতে বলার জন্যে ধন্যবাদ। তবে আমি চলে গেলেই ভাল।' দরজার দিকে এগোলাম।

আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এল মেয়েটা। 'থাকবেন না কেন? এ ঘরে আমার রাত কাটাতে কোন অসুবিধে হবে না, সত্যি বলছি। আপনি না থাকলেও এ ঘরেই থাকতে হবে আমাকে।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালাম মেয়েটার দিকে।

লাল হয়ে গেল ও। রক্ত নেমে গেল গাল থেকে গলা বেয়ে। মেঝের দিকে চোখ নামাল। 'কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না, আমি ওর স্ত্রী।'

আরেকটু হলেই হেসে ফেলতাম। বললাম: 'দেখুন, আমি অনুদার নই। আপনার ব্যাপারে নাক গলাতে যাচ্ছি না। আপনি কে, সেটা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমার। জেরো একজন মহান লোক। একদিন হয়তো আরও বড় হবে সে। ওর সঙ্গে যে আমার পরিচয় হয়েছে, তাতে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি।'

চেয়ারে বসে পড়ল মেয়েটা। মুখ দেখে মনে হলো নিজের ওপর প্রচণ্ড বিরক্ত। 'আসলে আমি মিথ্যে কথা বলেছি, তার জন্যে অনুশোচনাও হচ্ছে। আমি ওর স্ত্রী নই।'

মুখ তুলে গর্বিত ভঙ্গিতে তাকাল আমার দিকে। 'তবে হলে ভাল হতো। ওকে বিয়ে করার মত স্নায়ুর জোর যদি থাকত আমার, আমি খুশি হতাম।'

মেয়েটার দিকে ভাল করে তাকালাম। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আবার লাল হয়ে যাচ্ছে ও। তবে চোখ সরাল না। হাতের কোটটা ছুঁড়ে ফেলে বললাম: 'আপনি কী মানুষ বলুন তো? মেহমানের খাতিরদারি করতে জানেন না। ঘরে কি খাবার-টাবার কিছু নেই। আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, মিস– '

'মারিয়ানি রিনোয়া,' ও জবাব দিল।

'হ্যাঁ, খাবার-টাবার কিছু আছে ঘরে, মারিয়ানি?' হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

'ডিম হলে চলবে?' আমার হাসিটা ফিরিয়ে দিল ও। 'শুধু ডিম আছে ফ্রিজে।' রান্নাঘরের দিকে হাত তুলল। 'সিদ্ধ খেতে চান, না ভাজা?'

দশ মিনিট পর খাবার টেবিলে বসলাম আমরা। আমি খাচ্ছি, ও কথা বলছে।

'আমি আপনাকে যা বললাম, জেরো শুনলে খুশি হবে না,' মেয়েটা বলল। 'মিথ্যে বলা একদম পছন্দ করে না ও। সত্যি বলা অনেক সহজ, ও সব সময় বলে।'

একমত হয়ে মাথা ঝাঁকালাম।

একটা সিগারেট ধরাল ও। 'জেরোর সঙ্গে কলেজে দেখা হয়েছে আমার, আমি তখন জুনিয়র স্টুডেন্ট। আহা, কী সব দিন ছিল। হয়তো ক্লাসওঅর্কের একটা সাধারণ সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন, পরক্ষণেই এসে গেল ভিন্ন আরেকটা প্রসঙ্গ, অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

'দুঃসাহসী বলে নাম ছিল আমার। কোন কিছুকে কেয়ার করতাম না। বড় বড় বুলি আওড়াতাম। কিন্তু জেরো থাকত চুপচাপ, কোন কথা বলত না। মাঝে মাঝে শুধু তার ওই মিষ্টি, শান্ত, আন্তরিক হাসিটা দিত।

'আমার ধারণা, তখনও সে জানত, আমি সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাই। আমার পরিবার কখনও মেনে নেবে না। হাইতি থেকে এসেছি আমরা, খানিকটা নিগ্রো রক্তও রয়েছে আমাদের শরীরে, হয়তো আমার দাদা-দাদীর বাবা-মায়েদের সময়কার, শ্বেতাঙ্গদের চেয়েও ওদের রঙ নিয়ে ওদের বেশি গর্ব।

'আর জেরোর পরিবারেরও একই অবস্থা, নিজেদের রঙ নিয়ে গোড়ামি আছে ওদের।

'জেরো সব সময় একজন লেখক হতে চেয়েছিল, সাংবাদিক। স্কুলে জার্নালিজম পড়েছিল ও। কিন্তু শীঘ্রি নিজের দুর্বলতা বুঝে গেল, কী পরিমাণ পক্ষপাতিত্ব হয়, জানল। তখনই ঘুরে দাঁড়াল সে। ওর ধারণা ছিল, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে গেলে লোকে ওকে গ্রহণ করবে, ওর বুদ্ধিমত্তাকে মূল্য দেবে। আর সে-কারণেই আমি বলছি কাল রাতের ঘটনাটার কথা কখনও ভুলতে পারবে না ও।

'কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকত, আমাকেও সময় দিতে পারত না, সপ্তাহে একদিনের বেশি দেখা করতে পারত না। আর এসেই টাইপরাইটার নিয়ে বসত, এমন সব লেখা লিখত, এত সুন্দর, আমার মনে হয় না ওগুলো পড়ে কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারবে। কাজ শেষ করে মুখ তুলে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে শুরু করত, লেখাটা

পড়ে শোনাত আমাকে। আর যদি আমি পড়তাম, অকারণেই বিব্রত ভঙ্গিতে পায়চারি করে বেড়াত সে। একের পর এক সিগারেট খেত, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করত আমি কী ভাবছি।

'তারপর যখন মুখ তুলে তাকিয়ে বলতাম অপূর্ব হয়েছে, কাগজগুলো আমার হাত থেকে নিয়ে রোল করে পাকিয়ে আমার দিকে তুলে নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞেস করত: 'এটাই কি সত্যি, মারিয়ানি? বলো, এটাই কি সত্যি?'

'সত্যি তো বটেই,' আমি জবাব দিয়েছি। 'কিন্তু কুয়াশায় আচ্ছন্ন বোকা ওই মানুষগুলোর মগজে এই উজ্জ্বল সত্যটা ঢোকানোর উপায়টা কী, যে চামড়ার রঙে কিছু এসে যায় না? সবাই এক?'

উঠে গিয়ে জেরোর ছবিটা টেবিল থেকে তুলে নিল মারিয়ানি। 'একদিন ও কাজ করার সময় ওর এই ছবিটা আমি এঁকেছিলাম। লেখা শেষ করার আগে ও কিছু বুঝতেই পারেনি। তারপর মুখ তুলে তাকিয়েছিল। হেসে ওকে ছবিটা দেখিয়েছি। ও কী বলেছিল, জানেন?

'ও বলেছিল: "ডার্লিং, এত সুন্দর করে এঁকেছ আমাকে! যেন আমিই ওর সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছি।'

কথা বলতে গেলাম, কিন্তু বাধা দিল একটা কণ্ঠ। মুখ ফিরিয়ে দেখি হাসিমুখে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে জেরো। 'যাক, দুজনের পরিচয় তাহলে হয়ে গেছে,' ও বলল। 'কিন্তু মারিয়ানি নিশ্চয় শুধু আমার কথাই বলে গেছে, নিজের কথা কিছুই বলেনি। রস স্কলারশিপ ইন আর্ট জিতেছে ও, বলেছে তোমাকে? হাইতির সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলোর মধ্যে একটা ওর পরিবার, বলেছে সে-কথা? ও কি জানিয়েছে আমি ওকে বিয়ে করলে আমাদের কারও পরিবার থেকেই একটা কানাকড়িও আমাদেরকে দেবে না?'

উঠে ওর দিকে দৌড়ে গেল মারিয়ানি। 'জেরো, তোমাকে নিয়ে কী ভয়টাই না পাচ্ছিলাম আমি।'

মারিয়ানির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল জেরো। 'ভয়, মারিয়ানি? তুমি পাবে ভয়। ভয় পেলে আমি পেতে পারি, কিন্তু তুমি নও।'

আমিও উঠে দাঁড়ালাম। 'আজকে থাক না। কাল সকালে আবার আপনাদের কথা শুনব। জেরো, ঘুমাতে যান।'

স্টুডিওর কাউচে রাত কাটাব ঠিক করলাম। ঘুমিয়ে প্রায় পড়েছি, এই সময় বেডরুম থেকে কে যেন বেরিয়ে এল। অন্ধকারে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম। 'মারিয়ানি,' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম: 'ও কি ঘুমিয়েছে?'

কাউচের কাছে এসে আমার দিকে তাকাল মারিয়ানি। 'আপনি এখনও ঘুমোননি?'

'না।'

'আপনি ওর জন্যে কী করেছেন, সব ও বলেছে আমাকে। আপনাকে ধন্যবাদ দেবার আমার ভাষা নেই। আপনার মুখ থেকে শুনে কিছু বুঝতেই পারিনি,' আপনমনেই হঠাৎ হেসে উঠল ও।

'হাসছেন কেন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম।

'ঘরে ঢুকে আপনাকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে কি ভেবেছিলাম জানেন? ভেবেছিলাম, চোর, চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন, আমার দরজা খোলার শব্দে জেগে গেছেন। ঘরে ঢুকতে ভয় পাচ্ছিলাম, আবার চলেও যেতে পারছিলাম না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু ভাবছিলাম কী করব। যাকগে, কোনও একদিন আপনারও একটা ছবি আঁকব আমি।'

জবাব দিলাম না।

ঝুঁকে আমার গালে চুমু খেল ও। পারফিউম ও নেশা ধরানো মেয়েলি গন্ধ নাকে ঢুকল আমার। ও বলল: 'এটা জেরোকে বাঁচানোর জন্যে।'

ওর বাহু চেপে ধরে নিজের দিকে টানলাম। 'ওটা জেরোর জন্যে,' ফিসফিস করে বললাম: 'আর এটা আমার।'

ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। প্রথমে চমকে গেল ও। তারপর সামলে নিয়ে চুমু খেল আমাকে। আমার মাথার পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে মাথাটা উঁচু করে ধরল, ওর মুখ আমার মুখের কাছে। ও ছেড়ে দিলে বললাম: 'আমি যখন ডিম খাচ্ছিলাম, ভাষণটা কার জন্যে দেয়া হচ্ছিল–আমার জন্যে, না নিজের জন্যে?'

একটা সেকেন্ড ওর মুখ আমার মুখের কাছে নামিয়ে রাখল। চোখে চোখে তাকিয়ে রইলাম আমরা। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল: 'দুষ্টু কোথাকার! শয়তান! আমি আর কখনও তোমার ছবি আঁকব না। আমি ঘরে ঢুকে প্রথমে যা ভেবেছিলাম সেটাই ঠিক ছিল, তুমি আসলেই একটা চোর।' দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। 'আমি আর কখনও তোমার মুখ দেখব না!'

ওর দিকে তাকিয়ে বললাম: 'মারিয়ানি, আমি জেরোর বন্ধু না হলেও কি এ কথা বলতে?'

জবাব না দিয়ে বেডরুমে ঢুকে গেল ও। চিত হয়ে শুয়ে ছাতের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অন্ধকারে নিজে নিজেই হাসছি। ও ঠিকই বলেছে, আমার সঙ্গে আর কখনও দেখা করবে না, অন্তত জেরো যতদিন আমার বন্ধু থাকবে ততদিন না। দেখা হওয়াটা আমাদের জন্য ভীষণ বিপজ্জনক। আমি মারিয়ানিকে পছন্দ করে ফেলেছি–এর আগে কাউকে আর এতটা ভাল লাগেনি। কিছু একটা রয়েছে ওর মধ্যে–আমাদের দুজনের মধ্যে–যেটা দুজনকেই পরস্পরের কাছে টানছে। ওকে প্রথম দেখেই আমার সেটা মনে হয়েছিল। আমার ধারণা ওরও মনে হয়েছিল। ওর কণ্ঠস্বর, ওর হাঁটার ভঙ্গি, ওর চেহারা, হাত, আঙুল, সব আমার পছন্দ। ওর ঠোঁটের ছোঁয়া অসম্ভব ভাল। তবে যত ভালই লাগুক, জেরো যতদিন আমার বন্ধু থাকবে, ততদিন মারিয়ানির সঙ্গে আর দেখা করা উচিত হবে না আমার।

খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়লাম, ওরা দুজনের কেউ জেগে যাবার আগেই। সেদিন ছিল সোমবার, কাজে যেতে হবে আমাকে। বাড়িটা ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম চুপি চুপি, চোরের মত।

ছয়

আমরা দোকান খোলার কয়েক মিনিট পর টেরি এল। খেপে অস্থির। ফুঁসে উঠে বলল: 'কাল রাতে আর যোগাযোগ করলে না কেন?'

'পারিনি,' ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলাম। কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে হ্যারি। 'জেরো খুব খারাপভাবে জখম হয়েছে, ওর সঙ্গে থাকতে হয়েছে আমাকে। আমরা চলে যাবার পর কী ঘটেছে?'

শান্ত হয়ে গেল ও। 'আমি জানি না। তোমার কথামত পুলিশকে খবর দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয় জায়গাটা ভেঙেচুরে তছনছ করেছে। জেরো কেমন আছে?'

'ভাল, ঠিক হয়ে যাবে,' আমি বললাম। 'ছাতের ওপর দিয়ে পালিয়েছিলাম আমরা।'

'ক্লাবটাকে কী করবে?' টেরি জিজ্ঞেস করল।

'জানি না,' জবাব দিলাম। দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে তাকালাম। ক্লাবঘরের একটা জানালারও কাঁচ নেই, সব ভাঙা। দোতলায় উঠলাম। ঘরে আসবাবপত্র যা ছিল, চুরমার করে ফেলা হয়েছে। চক দিয়ে দেয়ালে অশ্লীল, জঘন্য সব কথা লিখে রেখেছে। আবার বাইরে বেরিয়ে এলাম। টেরির চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি।

'আমার মনে হয় সব শেষ হয়ে গেল,' ধীরে ধীরে বলল ও।

'হয়তো,' আমি বললাম। 'তবে এখনও বলা যায় না। সদস্যদের কাছে জরুরি মনে হলে আবার খুলবে।'

'যদি খুব জরুরি মনে হয়!' টেরির জবাব।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম: 'কী বলতে চাও? তোমার কাছে কোনটা জরুরি ছিল?'

জবাব দেয়ার আগে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ও। 'এখানে লোকজন আসত, বন্ধুত্ব হতো, নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেত। এটা একটা চমৎকার আড্ডা দেয়ার জায়গা ছিল।'

'মজা পাওয়া ছাড়া জায়গাটা তোমার কাছে আর কিছু ছিল না?'

'আর কী?' টেরির কণ্ঠে সন্দেহ।

আমার সন্দেহটাই ঠিক। এখানে যারা আসত, তাদের বেশির ভাগেরই এই ক্লাব গড়ার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। সাধারণ সদস্যরা বুঝতেই পারেনি এই ক্লাব ওদের জন্য কতটা জরুরি ছিল। টেরিকে গুড-বাই জানিয়ে কাজে ফিরে গেলাম।

*

বুধবার বিকেলে একটা ফোন এল। রিসিভারটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে হ্যারি বলল:

'তোমার।'

রিসিভার কানে ঠেকালাম। 'হ্যালো।'

জেরোর কণ্ঠস্বর চিনতে পারলাম: 'হ্যালো, ফ্র্যাঙ্ক। জেরো বলছি।'

'কেমন আছেন এখন?' জানতে চাইলাম।

'এখন ভাল। ফোন করলাম, জিজ্ঞেস করতে, আজ রাতে কি তুমি আমার সঙ্গে খাবে?'

'নিশ্চয় খাব, থ্যাংক ইউ,' আমি বললাম। 'কোনখানে বসে?'

'মারিয়ানির বাসায়।'

এটা আশা করিনি। কী বলব বুঝতে পারলাম না। ওখানে যেতে চাই না আমি; মারিয়ানিকে দেখতে চাই না। চাই না মানে–খুবই চাই–কিন্তু দেখা না করাটাই ভাল। জিজ্ঞেস করলাম: 'ক'টা সময়?'

'এই সাড়ে সাতটা?'

'ও দাঁড়ান, দাঁড়ান,' হঠাৎ মনে পড়ার ভান করে বললাম: 'এইমাত্র মনে পড়ল। আজ রাতে মাল নিয়ে ট্রাক আসবে, ওটার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আমি আসতে পারছি না, সরি।'

'ও!' হতাশ মনে হলো ওকে। 'মারিয়ানি বলছিল তুমি এলে ভাল হতো। তুমি আসতে পারবে না শুনে আমার মতই সে-ও হতাশ হবে।'

বুকের মধ্যে এমন জোরে ধড়াস করে উঠল আমার হৃৎপিণ্ডটা নিজেরই অবাক লাগল। 'ওকে বলবেন, আসতে না পারার জন্যে আমারও খারাপ লাগবে, কিন্তু বুঝতেই পারছেন, চাকরি।'

'হ্যাঁ,' জেরো বলল: 'পারছি। ঠিক আছে, অন্য কোন দিন হবে।'

'হ্যাঁ, অন্য কোন দিন।' গুড-বাই বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

ফোনটা পেয়ে আমার ভাল লাগল। তারমানে আমার কথা ভোলেনি মারিয়ানি, ভাবে, নইলে জেরোকে দিয়ে আমন্ত্রণ জানাত না।

পরের সপ্তায় আবার আমাকে ফোন করল। ফোরটিন স্ট্রিটের একটা রেস্টুরেন্টে ওর সঙ্গে দেখা করলাম। প্রচুর কথাবার্তা হলো। লোকটাকে ভীষণ পছন্দ করে ফেলেছি আমি। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি আন্তরিক।

'এখন কী করবেন?' খাওয়ার শেষ পর্যায়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম।

'এই ক্লাবটা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি শহরের অন্য জায়গায়, হার্লেমে।'

'ওই বোকাদের নিয়ে কেন এত ঘামান বুঝি না! বেশির ভাগই জানে না আপনি কী করতে চান, মাথায়ই ঢোকে না ওদের। ওরা একটা জায়গা চায় শুধু আড্ডা দিয়ে সময় কাটানোর জন্যে।' আমি ভেবেছিলাম সাংঘাতিক একটা কথা বলে ফেলেছি ওকে যা ও জানে না।

'আমি জানি,' আমাকে অবাক করে দিয়ে জবাব দিল ও। 'জানি, আমার আসল উদ্দেশ্য মাথায়ই ঢোকে না ওদের। কিন্তু তাই বলে চেষ্টা করা তো ছেড়ে দিতে পারি

না। আজ হোক কাল হোক বুঝতে ওরা পারবেই। হয়তো কিছুটা সময় লাগবে, তবে বুঝতে ওদের হবে।'

এরপর থেকে প্রতি সপ্তাহে একবার করে দেখা করতে লাগলাম ওর সঙ্গে। আর ওই প্রতিটি সন্ধ্যাই খুব উপভোগ করতাম। অবস্থা এমন দাঁড়াল, পুরো সপ্তাহটা ওই একটি সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করি। ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ল আমাদের।

টেরির সঙ্গে দেখা করা কমিয়ে দিলাম। ক্লাবটাকে পাঁচ ব-ক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তবে ওখানে একবারের জন্যও গেলাম না। মারিয়ানির সঙ্গে পরিচয় আমাকে বদলে দিয়েছে। আমি অনুভব করতে শুরু করেছি একটা মেয়ের কাছ থেকে শুধু দেহটা ছাড়াও আরও অনেক কিছু পাওয়ার আছে। টেরি খুব ভাল মেয়ে, কিন্তু ওর কাছে সব কিছু পাব না আমি যা চাই। প্রেমও তৈরি হয়নি আমাদের মাঝে। শুধুই দেহসর্বস্ব সম্পর্ক। আমি শুধু মারিয়ানির কথা ভাবি। মাঝে মাঝে মনে হয় ওর প্রেমে পড়ে গেলাম না তো? পরক্ষণে হেসে উড়িয়ে দিই। এ ধরনের ঘটনা উপন্যাসে ঘটে, কিংবা সিনেমায়, কিন্তু বাস্তবে নয়।

*

মার্চের এক সন্ধ্যায় টেরিদের বাড়ির ভিতরবারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি দুজনে। ওকে আমি চুমু খেলাম। ও আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। আরও কিছু পাওয়ার জন্য আমি ওকে চাপাচাপি করলাম না। আবছা অন্ধকারে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও। বলল: 'তুমি বদলে গেছ, ফ্র্যাঙ্ক।'

হেসে উঠলাম।

'সত্যি বলছি,' গম্ভীর স্বরে বলল ও: 'তুমি আসলেই বদলে গেছ। তোমার মনে অন্য কিছু ঢুকেছে।'

'ঢুকলেও আমি জানি না,' হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলাম।

'হয়তো জানো না, কিন্তু আছে,' আমার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ও। 'ক'দিন ধরে আমিও ভাবছি। আমাদের মাঝে যা চলছে সেটা অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না। বন্ধ করা দরকার।'

জবাব দিলাম না।

'আমি কিন্তু ঠিকই বলছি,' কথাটায় জোর দিল ও। 'কয়েক মাস আগে আমার সঙ্গে তোমার তর্ক বেধেছিল, মনে আছে? এবার যে ওরকম করনি তাতে খুশি হয়েছি। তুমি বন্ধ না করলেও এবার আমি করব। আমি বিয়ে করব।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ও ভাবল আমি দুঃখ পেয়েছি। এটা অবশ্য আমি আশা করিনি।

'যে লোকটার কথা বলেছিলাম,' ও বলল। 'বাস চালায়। ভাল বেতন, সপ্তাহে চলি-শ ডলার। আমাকে ভালবাসে। ওকে বিয়ে করলে এই ভাগাড় থেকে বেরোতে পারব, ইচ্ছেমত জিনিস কিনতে পারব। লং আইল্যান্ডের কোনও ফ্ল্যাটে থাকতে পারব, যেখানে ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা আছে—এখানকার ঠাণ্ডা বাসাটায় থেকে আর শীতে

কাঁপতে হবে না। খাবার আর বিলের টাকা দেয়া নিয়ে ভাবতে হবে না। পাই পাই হিসেব করে খরচ করতে হবে না।'

দুঃখ পাওয়ার ভান করলাম, তবে অনেক চেষ্টায়।

আমার হাত ধরে সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে টেরি বলল: 'খারাপ লাগছে, তাই না, ফ্র্যাঙ্ক? কিন্তু কিছু করার নেই আমাদের।' গত সপ্তায় দুজনে একসঙ্গে দেখে আসা একটা সিনেমার চরিত্রের সংলাপ ঝাড়ল সে। 'দুজনে মিলে অনেক আনন্দ পেয়েছি আমরা, অনেক উপভোগ করেছি। এখন আন্তরিকতা নিয়েই একে অন্যকে বিদেয় জানাব আমরা।'

ওর শেষ কথাটায় হাসি এসে যাচ্ছিল আমার। কেশে সেটা ঠেকানোর চেষ্টা করলাম। 'ঠিক, তুমি যা ভাল বোঝো, টেরি।'

ওর ধারণা, আমার খুব খারাপ লাগছে। ফিসফিস করে বলল: 'গুড-বাই, ফ্র্যাঙ্ক।'

'না, তুমি ঠিক বলছ না,' ওর খেলাটাই চালিয়ে গেলাম আমি।

'হ্যাঁ, ঠিক বলছি। এটাই আমাদের শেষ দেখা।' এতটাই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ল ও, চোখ থেকে পানি বেরিয়ে গেল।

ঝুঁকে ওর গালে চুমু খেলাম। 'তবে একটা কথা তুমি ঠিকই বলেছ, টেরি, আমি তোমার যোগ্য নই। দোয়া করি, সুখি হও। গুড লাক।'

ও ভেবেছিল, ও বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে আমি ঘাবড়ে গিয়ে ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে ফেলব। কিন্তু আমার কথায় হতাশ হয়ে কেঁদে ফেলল ও। ফোঁপাতে ফোঁপাতে দৌড়ে ওপরতলায় চলে গেল। বুকভরা স্বস্তি নিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম আমি।

*

মাসখানেক পর রেস্টুরেন্টে জেরোর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি মারিয়ানি বসে আছে। দরজায় একটা মুহূর্তের জন্য থমকালাম। তারপর হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালাম টেবিলের কাছে। আমার ওপর ওদের চোখ পড়ল। চেয়ারে বসলাম।

'মারিয়ানিও আজ আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে,' হেসে বলল জেরো।

'তাই তো দেখছি,' আমি বললাম। 'কেমন আছো, মারিয়ানি?'

'ভাল,' হেসে জবাব দিল ও। ওর তাকানোর ভঙ্গিতেই আমার নাড়ির গতি দ্রুত হয়ে গেছে। 'তুমি কেমন আছো?'

'খুব ভাল,' মাথা নিচু করে মেনুর দিকে তাকালাম, যাতে আমার মনের ভাব বুঝতে না পারে ও।

'আসছি, এক মিনিট,' উঠে দাঁড়াল জেরো। 'আমার জন্যে টমেটো জুসের অর্ডার দিয়ো।' পুরুষদের টয়লেটের দিকে চলে গেল ও।

তাকিয়েই আছি মেনুর দিকে, অস্বস্তি বোধ করছি।

'কী ব্যাপার, ফ্র্যাঙ্ক?' হেসে জিজ্ঞেস করল মারিয়ানি। 'আমি আসাতে অবাক হয়েছ?'

মাথা ঝাঁকালাম। 'কিছুটা তো হয়েছিই।'

'হবার দরকার নেই। দিনের আলোয় তোমাকে কেমন লাগে দেখতে ইচ্ছে করছিল, তাই চলে এসেছি।'

রেস্টুরেন্টের জানালার দিকে তাকালাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যাবে।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে জানালার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল ও: 'তারমানে আমার কথা তুমি বিশ্বাস করনি?'

'না,' জবাব দিলাম।

আবার হেসে উঠল ও। 'ফ্র্যাঙ্ক, আমার ধারণা তুমি আমাকে ভয় পাও, তাই না? আমি একজন খারাপ মেয়েমানুষ।'

'আমি তোমাকে আগেই বলেছি, তোমাকে নিয়ে ভাবব না আমি যতদিন তুমি জেরোর বন্ধু থাকো।'

'ও!' হালকা স্বরে বলে আমার দিকে ঝুঁকল ও। 'ফ্র্যাঙ্ক, একজন মেয়েমানুষ একসঙ্গে দুজন পুরুষের প্রেমে পড়তে পারে, এটা সম্ভব। জেরো খুব ভাল মানুষ, ভদ্র, মিষ্টি ব্যবহার, মেয়েদের ভাল লাগার মত অনেক কিছুই আছে ওর মধ্যে। ওকে বিয়ে করতে চাই আমি, সত্যি বলছি। কিন্তু তোমার মধ্যে অন্য কিছু আছে। তুমি পাজি, স্বার্থপর, অসৎ। তোমার চেহারাই সেটা বলে দেয়। একজন মেয়েমানুষের যা যা আছে সব কিছু আদায় করতে চাও তুমি। তারপরেও তুমি আমাকে আকৃষ্ট করেছ। তোমাকে ফেঁড়ে ফেলে তোমার মনের ভিতরে কী চলছে যদি দেখতে পারতাম ভাল হতো। তুমি আমার কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে চেয়েছ। আমি জানতাম দাওয়াত দিলেও তুমি যাবে না, তাই জেরোর সঙ্গে নিজেই চলে এসেছি। তোমাকে আবার দেখতে ইচ্ছে করছিল। তুমি আমার সঙ্গে কীরকম আচরণ করো দেখতে চেয়েছিলাম। এখন দেখেছি। যা বোঝার বুঝেছি। তুমি লুকোতে পারনি।'

'দেখো,' শান্তকণ্ঠে বললাম: 'তুমি জেরোর বান্ধবী। এমনিতেই যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ করতে হয় ওকে। আমি এর মধ্যে ঢুকে আর পানি ঘোলা করতে চাই না, ওর মানসিক অশান্তির কারণ হতে চাই না।'

টেবিলে রাখা পে-টের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াল ও। লাল হয়ে যাচ্ছে মুখ। সহজেই লাল হয়ে যায় ও। জবাব দিতে যাচ্ছিল, জেরো ফিরে আসায় থেমে গেল। প্রসঙ্গটা বাদ দিতে হলো আমাদের।

ভরপেট খেয়ে বাইরে বেরিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চললাম শহরের রাস্তা ধরে। ভাবছি: 'এর মাঝে জেরো না থাকলে আমি...' ভাবনাটা জোর করে তাড়ালাম মন থেকে।

সাত

এপ্রিল এল। সাথে করে নিয়ে এল প্রথম বসন্তের ছোঁয়া। নিউ ইয়র্কে বসন্ত। মনের ওপর প্রভাব ফেলে কোনও সন্দেহ নেই। তবে বসন্ত যা হওয়া উচিত তা হয় না। একঘেয়ে, বিরক্তিকর গরমের দিনগুলো আসে। আবহাওয়ার এ সব পরিবর্তন অবশ্য আমার সহ্য হয়ে গেছে। একটা করে দিন যায়, আরেকটা আসে, মাথা ঘামাই না।

একদিন জেরো আমাকে জিজ্ঞেস করল, মে ডে-তে ইউনিয়ন স্কোয়ারে যাব কিনা। ওখানে বক্তৃতা দেবে ও। আর ওর ইচ্ছা, আমি সেই বক্তৃতাটা শুনি। কিন্তু মে ডে সোমবারে হওয়ায় আমি যেতে পারব কিনা তখুনি জানাতে পারলাম না। বললাম, হ্যারিকে বলে দেখব, যদি কয়েক ঘণ্টার ছুটি দেয়, তাহলে যাব।

মার্চের সেই দিনটির পর মারিয়ানির সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার। মাঝে মাঝে ভাবি, ওই বাসাটাতেই আছে কিনা। ওকে দেখার ছুতোয়ই আমি মে ডে-র বক্তৃতায় গিয়েছিলাম হয়তো, কারণ বক্তৃতা শোনা নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না আমার।

যাই হোক, ১লা মে, আমি ছুটি নিলাম। স্কোয়ারে প্রচুর লোকের ভিড়। বক্তার জন্য একটা বিশেষ মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। কয়েকজন লোক হাতে হাতে কাগজ বিলি করছে, দিবসের কর্মসূচী ছাপা রয়েছে তাতে। তালিকায় দেখলাম জেরো বক্তৃতা করবে তিনজন বক্তার পর। ওর প্রোগ্রামের নাম: জন্ম থেকে সমঅধিকার।

ভিড় ঠেলে জনতার সামনে চলে এলাম। একজন লোক বক্তৃতা দিচ্ছে। ও কে জানি না, জানতেও চাইলাম না। আমার চোখ জেরোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবশেষে চোখে পড়ল ওকে। মঞ্চে আরও কয়েকজনের সঙ্গে বসে রয়েছে। সবাই যার যার বক্তৃতা দেবার পালা আসার অপেক্ষা করছে। ওর উদ্দেশ্যে হাত নাড়লাম।

জনতার ওপর অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ানো চোখের দৃষ্টি আমার ওপর এসে থামল। হেসে মাথা ঝাঁকাল। আবার হাত নাড়লাম। আমার চোখ মারিয়ানিকে খুঁজছে এখন। কোথাও দেখলাম না ওকে।

আমার হাত ধরে টান দিল কেউ। ফিরে তাকিয়ে দেখি, টেরি। 'হ্যালে-া,' হেসে বললাম: 'তোমাকে এখানে দেখব ভাবিনি।'

আমার হাসির জবাবে হাসি দিয়ে টেরি বলল: 'আমি জেরোর বক্তৃতা শুনতে এসেছি। আমার আত্মীয়-স্বজনরাও এসেছে।'

'ভাল,' অস্বস্তি বোধ করছি, কথা খুঁজে না পেয়ে। 'তা তুমি কেমন আছো?' বলেই বুঝলাম, বোকার মত প্রশ্ন হয়ে গেল, কারণ প্রায় প্রতিদিনই ওকে আমাদের স্টোরে ঢুকতে দেখি। তবে আমাদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে, যার জন্য দোকানে দেখা হলেও প্রায় কথাই বলি না।

'আমি ভাল,' ও জবাব দিল। 'প্রচুর মানুষ হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম। মারিয়ানিকে খুঁজছে আমার চোখ। 'অনেক লোক।'

এরপর কয়েক মিনিট চুপ করে থাকলাম আমরা: কী বলব বুঝতে পারছি না। অবশেষে ও বলল: 'আত্মীয়-স্বজনদের কাছে যাই।'

'হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম: 'সেটাই ভাল।'

বলে জনতার দিকে ফিরে তাকালাম, কিন্তু মারিয়ানিকে চোখে পড়ল না। বক্তৃতামঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছে জেরো। এগিয়ে গেলাম সেদিকে।

কাছে গিয়ে হাত মেলালাম।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। 'তুমি এসেছ, খুশি হয়েছি। তোমাকে দেখার আগে পর্যন্ত কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলাম। তোমাকে দেখে ভরসা পেলাম। এত লোকের সামনে এই প্রথম বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি। তোমাকে দেখার পর থেকে অস্বস্তি চলে গেছে। আমি জানি, এখন আর আমার কোনও অসুবিধে হবে না, সব সময় মাথায় থাকবে জনতার ভিড়ে আমার খুব পরিচিত আপন একজন রয়েছে।'

'এখন তো দেখছি এসে ভালই করেছি,' হেসে জবাব দিলাম। চারপাশে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম: 'মারিয়ানি আসেনি?'

'না,' মাথা নেড়ে বলল ও: 'লোকজনের ভিড় সহ্য করতে পারে না ও।'

হতাশা গোপন করলাম। কয়েক মিনিট কথা বললাম দুজনে, তারপর জেরো উঠে গেল তার স্ট্যান্ডে। ওর আগে আরও দুজন বক্তা আছে।

সমস্ত রঙের আর সমস্ত ধর্মীয় মতবাদের দরিদ্র মানুষেরা এসেছে বক্তৃতা শুনতে। কিনারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে মাউন্টেড পুলিশ। লালচে-বাদামী ঘোড়ার পিঠে, হাতে লাঠি নিয়ে বসে আছে ওরা। গোলমাল দেখলেই পিটানো শুরু করবে।

স্পিকারের স্ট্যান্ডের দিকে তাকালাম আবার। প্রথম বক্তা বক্তৃতা শেষ করেছে। গরম লাগছে আমার। তাই ভিড়ের পিছনে গিয়ে এক বোতল কোক কিনলাম। আবার ভিড় ঠেলে ফিরে এলাম সামনে। মঞ্চের দিকে এগোচ্ছি। কোক শেষ করে বোতলটা ফেলার জায়গা খুঁজে না পেয়ে হাতেই রেখে দিলাম খালি বোতলটা।

স্পিকারের স্ট্যান্ডের সিঁড়ির কাছে গোলমালটার সূত্রপাত, কানে এল চিৎকার: 'মারো! মারো!' দেখার জন্য চেয়ার থেকে উঠে রেলিঙের কিনারে এল জেরো। নীচে কয়েকজন লোককে মারামারি করতে দেখলাম। সেটা দেখে বোধহয় থামানোর জন্যই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল জেরো। একজন পুলিশকে ছুটে আসতে দেখলাম। ওর ঘোড়ার সামনে থেকে দুদিকে ছিটকে সরে যাচ্ছে জনতা।

এরপর দ্রুত ঘটতে থাকল ঘটনা। মারামারি করতে থাকা দুজন লোকের ওপর প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ে ওদের ছাড়ানোর চেষ্টা করল জেরো। লাঠি তুলে ছুটে এল পুলিশম্যান। মারামারি করতে থাকা লোকগুলোর উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে। এত চেঁচামেচির মধ্যে কী বলছে ও, বুঝতে পারছি না। জেরোকে দেখলাম, লাফিয়ে উঠে পুলিশম্যানের লাঠি ধরা হাতটা আঁকড়ে ধরে নোয়ানোর চেষ্টা করছে। বুঝতে পারছি,

কাউকে যাতে মারতে না পারে পুলিশম্যান, সেজন্যই ওর হাত ধরেছে জেরো। ভয়ঙ্করভাবে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঝাড়া দিয়ে জেরোর হাত ছুটিয়ে নিল পুলিশম্যান। দু'বার বাড়ি মারল জেরোর মাথায়। টলে উঠল জেরো। দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে টলে পড়ে গেল মাটিতে। ভিড়ের দিকে তখন ঘুরে দাঁড়াল ওই পুলিশম্যান। ঘোরার সময় ঘোড়ার পায়ের লাথি লাগল জেরোর বুকে। জনতা তখন হই-হই করে ঘিরে ফেলছে পুলিশম্যানকে।

মরিয়া হয়ে দুই হাতে মানুষ ঠেলে জেরোর দিকে এগোনোর চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু আমার সামনে অনেক লোক। চিৎকার করে বলতে লাগলাম: 'আগে জেরোকে সরান! ঘোড়াটা ওকে মেরে ফেলবে তো!'

জেরো যে ঘোড়ার পায়ের নীচে পড়েছে, পুলিশম্যান বুঝতে পারেনি। ও তখন লাঠি চালাতে ব্যস্ত, কেউ যাতে ওর কাছে ঘেঁষতে না পারে। প্রচণ্ড রাগ যেন মাথার ভিতরে আগুন ধরিয়ে দিল আমার। হঠাৎ লক্ষ করলাম কোকের বোতলটা তখনও আমার হাতে ধরা রয়েছে। পরক্ষণে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে মারলাম ওটা। সোজা গিয়ে লাগল পুলিশম্যানের মুখে। টালমাটাল অবস্থায় একটা মুহূর্ত ঘোড়ার পিঠে বসে রইল সে। নাক-মুখ থেকে রক্ত বেরোতে দেখলাম। ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে মাটিতে পড়ে গেল সে। এ সময় অন্য পুলিশদের হুইসেলের শব্দ কানে এল। গণ্ডগোলের জায়গাটার দিকে ছুটে আসতে লাগল ওরা।

দ্রুত চারপাশে চোখ বোলালাম। বুঝলাম, এখানে থাকাটা নিরাপদ নয় আর। টেরির ওপর চোখ পড়ল। দুই হাতে মুখ চেপে ধরে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম জনতার ভিড়ে। পুলিশ এসে যদি বুঝতে পারে আমার বোতলের আঘাতেই ওদের সঙ্গী ধরাশায়ী হয়েছে, পিটিয়ে আধমরা করে ফেলবে আমাকে।

পালিয়ে এসে সাবওয়েতে উঠলাম, জোরে জোরে হাঁপাচ্ছি। ফিরে তাকালাম। হট্টগোল চলছে এখনও। জেরোর জন্য এ মুহূর্তে কিছুই করার নেই আমার। দোকানে ফিরে যাব ঠিক করলাম।

তিনটে বাজার কয়েক মিনিট আগে দোকানে ঢুকলাম। কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিয়ে বেরোলাম। বারে ঢুকলাম কিছু একটা ড্রিংক খাওয়ার জন্য। বেশ অনেকখানি কালো কফি খাওয়ার পর আমার অস্থির স্নায়ুগুলো শান্ত হয়ে এল। দোকানে ফিরে কাজে মনোযোগ দিলাম। হ্যারি তখন কাজে এতই ব্যস্ত, বক্তৃতা সম্পর্কে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগই পেল না, তাতে স্বস্তি বোধ করলাম আমি।

পরের দুটো ঘণ্টা গড়িয়ে গড়িয়ে পার হলো। ফোন বাজার অপেক্ষায় আছি আমি। কেন যেন আমার মনে হচ্ছিল ফোন করতে পারার অবস্থায় থেকে থাকলে অবশ্যই আমাকে ফোন করবে জেরো। ছ'টা নাগাদ আমার প্রতিক্ষার অবসান হলো। ফোন বাজল। হ্যারি ধরে আমাকে ডাক দিল।

'হ্যালো,' রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বললাম।

'ফ্র্যাঙ্কি,' খড়খড় করে উঠল যেন উত্তেজিত কণ্ঠস্বর: 'আমি টেরি। জলদি পালাও।

পুলিশ তোমাকে ধরতে যাচ্ছে।'

'এই শোনো শোনো,' আমি বললাম: 'ওরা কী করে জানল? একমাত্র তুমি আমাকে দেখেছ ওখানে।'

'আরও অনেকেই দেখেছে, ফ্র্যাঙ্কি,' বিব্রত শোনাল টেরির কণ্ঠ। 'ক্লাবের লোক, যারা তোমাকে চেনে। সবাইকে ধরে ধরে প্রশ্ন করেছে পুলিশ। তুমি কে, জানতে কয়েক মিনিটও লাগেনি ওদের। জখম হওয়া পুলিশম্যানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বাঁচে কিনা সন্দেহ। যদি মরে যায়...' বাক্যটা শেষ করল না ও।

মরে গেলে কী ঘটবে ভাবতে চাইলাম না। 'তুমি কি–তুমি কি জানো জেরো কেমন আছে?' প্রায় তোতলানো শুরু করলাম।

'ও, তুমি জানো না?' কাঁদতে শুরু করল টেরি। 'ও মারা গেছে। ঘোড়াটা ওকে পিষে ফেলেছে।'

স্তব্ধ হয়ে গেলাম। চোখের সামনে যেন পাক খেতে থাকল দোকানটা। বহু কষ্টে নিজেকে সামলালাম। 'এই, তুমি শুনছ?' উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল টেরি।

জোর করে যেন জবাবটা বের করলাম মুখ দিয়ে: 'শুনছি।'

'তুমি পালাও। জলদি ভাগো ওখান থেকে,' ও বলল।

'হ্যাঁ, যাচ্ছি। থ্যাংকস।' রিসিভার রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হ্যারিকে গিয়ে বললাম: 'আমি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।'

মেশিনে পনির কাটছিল হ্যারি। এতটাই চমকাল, আরেকটু হলে নিজের আঙুল কেটে ফেলছিল। জিজ্ঞেস করল: 'কেন? কী হয়েছে?'

'আমি বিপদে পড়েছি,' সোজাসাপ্টা জবাব দিলাম। 'মিটিঙে গণ্ডগোল হয়েছিল। আমাকে পালাতে হবে।'

'ও! এতটাই খারাপ? আমি তোমাকে সাবধান করেছিলাম, ওই বাস্টার্ডগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকতে। ওরা তোমাকে বিপদে ফেলবেই আমি জানতাম।'

'এখন আর বলে কোন লাভ নেই। আর তা ছাড়া ওদের দোষে আমি বিপদে পড়িনি।'

পনির কাটা শেষ করে ওগুলো প্যাকেট করল হ্যারি। এগিয়ে গিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়ানো ক্রেতার হাতে তুলে দিল। বেশ কিছুটা দূরে থাকাতে আমাদের কথা শোনেনি ক্রেতা। আমার কাছে ফিরে এল হ্যারি।

'সরি, হ্যারি,' আমি বললাম। 'এভাবে আপনাকে বিপদে ফেলার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু কোন উপায় নেই আমার। আপনি আমার জন্যে এত কিছু করেছেন, কী বলে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না।' হাত বাড়িয়ে দিলাম। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, হ্যারি।'

আমার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ও। 'তোমার জন্যে আমার খুব খারাপ লাগবে। তুমি খুব ভাল ছেলে। আমি তোমাকে পছন্দ করি।'

'আমারও আপনার জন্যে খারাপ লাগবে,' বলে দরজার দিকে এগোলাম।

'একটু দাঁড়াও,' হাত তুলল হ্যারি। 'একটা জিনিস ফেলে যাচ্ছ।'

ঘুরে দাঁড়ালাম। 'কী?'

'তোমার বেতন।'

'কিন্তু আজকে তো মাত্র সোমবার।'

'নিয়ে যাও,' ও বলল। 'বহুকাল আগেই এক সপ্তাহের বাড়তি কাজ করে রেখেছ।'

টাকাটা নিয়ে পকেটে ভরলাম। 'থ্যাংকস। আমার কাজে লাগবে।' যেখানে থাকি, হোটেলের ঘরে একটা বাক্সে আমার একশো ডলারের কিছু বেশি জমানো আছে।

আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল হ্যারি। 'ভাল থেকো, ছেলে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ঘুরে দাঁড়ালাম। আমার হাতটা তুলে নিল ও। জোরে একটা ঝাঁকি দিয়ে ছেড়ে দিল। রাস্তায় নেমে এলাম। রাস্তার এমাথা-ওমাথা দেখলাম। কেউ নেই। যত তাড়াতাড়ি পারলাম হোটেলে ফিরে এলাম। কাপড়-চোপড় সব গুছিয়ে নিয়ে একটা পুরানো ব্যাগে ভরলাম। রেল স্টেশনে যাওয়ার সময় হঠাৎ উদয় হলো ভাবনাটা।

মারিয়ানি! ওকে কে জানাবে? ওর আর জেরোর সম্পর্কের কথা নিশ্চয় জনতার কেউ জানে না যারা ওখানে বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল। খবরের কাগজে ছাপা হবে, হয়তো, তবে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে ভিতরের পাতায় ছাপবে, সব সময় তা-ই ছাপে, এমন জায়গায়, যাতে সহজে চোখে না পড়ে। মারিয়ানিরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। বুঝতে পারছি আমারই ওকে বলতে যেতে হবে।

ওর অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় দাঁড়িয়ে বেল বাজালাম। ঘরে আছে তো? ভিতর থেকে দ্রুত পদশব্দ এগিয়ে এল। দরজা খুলে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও। ব্যাগ হাতে আমাকে দেখে অবাক হয়েছে। আমাকে ভিতরে যেতে বলার আগেই আমি ঢুকে পড়লাম।

দরজা লাগিয়ে আমার দিকে তাকাল ও। 'কোথাও যাচ্ছ, ফ্র্যাঙ্ক?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'কিন্তু যাবার আগে একটা খবর জানাতে এলাম।'

আমি কী বলব কল্পনাও করতে পারেনি ও, তাই ভুল ভাবল। আমার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে তাকাল। মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করল: 'কী বলবে? এমন কী কথা যেটা আমাকে না বলে যেতে পারছিলে না?'

ব্যাগটা নামিয়ে রেখে দুই হাতে ওর কাঁধ চেপে ধরলাম।

'ফ্র্যাঙ্ক, আমার ব্যথা লাগছে,' ককিয়ে উঠল ও।

হাতের চাপ কমালাম। আস্তে করে বললাম: 'আগে বসো।'

'না, বসব না,' ভয় দেখা দিল ওর চোখে: 'আগে বলো।'

'জেরো মারা গেছে,' এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম।

একটা মুহূর্ত নিথর হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও। রক্ত সরে যাচ্ছে মুখ থেকে। ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে চোখের মণি। টলে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেললাম।

পাঁজাকোলা করে তুলে এনে বেডরুমের বিছানায় শুইয়ে দিলাম। পাশের ঘর থেকে এক গ-াস পানি নিয়ে এলাম। নড়ে উঠল ও। গ-াসটা ধরলাম ওর মুখের কাছে। সামান্য পানি ঢেলে দিলাম ঠোঁটের ফাঁকে। গায়ের ব-াউজটা ঢিল করে দিলাম।

মিটমিট করে খুলে গেল ওর চোখের পাতা। 'খবরটা হয়তো অন্য কারও মুখ থেকে শুনতে হতো তোমাকে। ভাবলাম, আমিই দিয়ে যাই। কিন্তু এভাবে গুলিয়ে ফেলব বুঝিনি।'

আস্তে মাথা ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করল ও: 'কীভাবে...কীভাবে ঘটল ঘটনাটা?'

'স্কোয়ারে মারামারি শুরু হয়েছিল। ও বাধা দিতে এসেছিল। একজন পুলিশ ওর মাথায় বাড়ি মারে। মাটিতে পড়ে যায় ও। ঘোড়ার পায়ের নীচে পড়ে। আমি তখন পুলিশের মুখে কোকের বোতল ছুঁড়ে মারি। ওই পুলিশকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। খবর পেয়ে আমি দোকান থেকে পালিয়েছি।'

'কিন্তু জেরো–,' মৃদুকণ্ঠে বলল ও: 'ও কি–অনেক যন্ত্রণা পেয়েছে?'

'না,' কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে বললাম: 'দ্রুত সব শেষ হয়ে গেছে। ও কিছু টের পাওয়ার আগেই।' যন্ত্রণা পেয়ে মরেছে কিনা আমি জানি না, তবে এখন আর কিছুই এসে যায় না তাতে, বরং মেয়েটা যদি খানিকটা সান্ত্বনা পায় সেটাই ভাল।

বিছানায় উঠে বসল ও। 'যাক, যন্ত্রণা যখন পায়নি,' ফিসফিস করে বলল: 'দ্রুত...তাড়াতাড়ি শেষ হওয়াই ভাল। ব্যথা না পেয়ে থাকলেই ভাল।' দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল ও।

কয়েক মিনিট ওকে কাঁদতে দিলাম। তারপর উঠে দাঁড়ালাম। যত বেশিক্ষণ থাকব এখানে, আমার বিপদ বাড়বে। বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। কান্না থামিয়ে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল ও।

'তুমি ওর বন্ধু ছিলে,' মারিয়ানি বলল। 'ওর জন্যে তুমি লড়াই করেছ, এটা খুবই গর্বের বিষয়। তোমাকে ও খুব পছন্দ করত। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি ওর পাশে থেকেছ।'

এ কথার কী জবাব দেব বুঝতে পারলাম না। শুধু বললাম: 'ও খুব ভাল লোক ছিল।'

'ওর মত আরেকজন আর জন্মাবে না,' মারিয়ানি বলল।

একটা মিনিট চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। তারপর উঠে পাশের ঘরে চললাম। 'আমার এখন যাওয়া দরকার। তুমি নিজেকে শক্ত করো।'

'আমি ঠিক হয়ে যাব,' ও জবাব দিল।

'গুড-বাই,' বেডরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম।

'গুড-বাই।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে ঢুকলাম। ব্যাগ তুলে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগোলাম। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি মারিয়ানি ছুটে আসছে। আমার দুই বাহুর মধ্যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও।

শক্ত করে ওকে বুকে চেপে ধরলাম। ওর গাল আমার গালে। ওর চুলে আঙুল

বুলিয়ে দিয়ে বললাম: 'মারিয়ানি!'

আমার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে এসে বলল ও: 'সাবধানে থেকো, পি-জ। ফিরে এসো। আমার এখন তোমাকে দরকার...'

কথা শেষ করতে দিলাম না ওকে, বললাম: 'আসব। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে গেলে, আর এই ঘটনার কথা যখন লোকের মন থেকে মুছে যাবে, তখন আসব।'

'কথা দিচ্ছ?'

'দিচ্ছি।' ওর চোখের দিকে তাকালাম। চোখের পানিতে ভেজা। 'এখান থেকে যেয়ো না, যাতে ফিরে এসে তোমাকে পাই।' ওকে ছেড়ে দিলাম।

'সাবধানে থেকো, ডার্লিং,' আমার পিছনে দরজাটা লাগানোর আগে আমি শুনতে পেলাম।

রাস্তায় নামলাম। অন্ধকার হয়ে গেছে। আমার মনে হলো এখন রেল স্টেশনে যাওয়াটা খুবই বিপজ্জনক। পুলিশ যদি জানতে পারে কে বোতল ছুঁড়ে মেরেছে, স্টেশনে আমাকে খুঁজতে যাবে ওরা। সবচেয়ে ভাল হয় ফেরি ধরে নিউ জার্সির দিকে চলে যাওয়া।

আমাকে ডার্লিং বলে ডেকেছে মারিয়ানি। একটা মুহূর্তের জন্য জেরোর জন্য খুব খারাপ লাগল আমার। তারপর ভাবলাম, ও চলে গেছে। আর কখনও ফিরে আসবে না। কাজেই মারিয়ানি যদি আমাকে এখন ডার্লিং বলে ডাকেই, ডাকুক না।

নিরাপদেই ফেরিতে চড়ে বসলাম। আমাকে লিফট দিল একজন ট্রাক ড্রাইভার। একটা রেল স্টেশন থেকে আটলান্টিক সিটিতে যাবার টিকেট কাটলাম। গ্রীষ্মাবকাশের জায়গা ওটা। কাজ পাওয়া কঠিন হবে না।

স্টেশনে অসাবধান হলাম না। কড়া নজর রাখলাম। পুলিশ দেখলেই কেটে পড়ব। আবার সেই পুরানো ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়ে গেছি আমি, শান্তির জীবন শেষ। তবে এর মধ্যেই মুখে হাসি ফুটল আমার।

'ডার্লিং,' মারিয়ানি বলেছে।

আমার যে মনের অবস্থা, একেই বোধহয় প্রেম বলে। তারমানে নারী আমার কাছে অচেনা না হলেও জীবনে এই প্রথমবার প্রেমে পড়লাম।

ট্রেন আসার অপেক্ষা করতে করতে ভবিষ্যতের সোনালি কল্পনার জাল বুনে চললাম আমি।

আট

আটলান্টিক সিটিতে পৌঁছানোর দুই ঘণ্টার মধ্যেই চাকরি পেয়ে গেলাম। মৌসুমের শুরু, তাই কাজের অভাব নেই। বোর্ডওয়োকের একটা সোডা ফাউন্টেইনে কাজ পেলাম। বিকেল তিনটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত ডিউটি। সপ্তাহে সাতদিন কাজ করতে হবে, বেতন বিশ ডলার, খাবার ফ্রি, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। তাতে কোন অসুবিধে নেই আমার। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে গেলে অন্য কোথাও চলে যাব।

চাকরি পাওয়ার পর একটা সস্তা হোটেলে রুম ভাড়া নিলাম, সপ্তাহে আট ডলার। কাজের জায়গা থেকে হোটেলটা মাত্র কয়েক ব-ক দূরে। অটোর দোকানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে খুব দ্রুত একজন ভাল সোডা ক্লার্ক হয়ে গেলাম।

সকালের বেশির ভাগ সময় আমি সৈকতে কাটাই। দুপুরে হোটেলে ফিরে কাপড় পরে কাজে যাই। ফাউন্টেইনে লাঞ্চ খেয়ে কাজে লেগে পড়ি, একটানা কাজ করি। তারপর হোটেলে ফিরি ঘুমানোর জন্য।

ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে গ্রীষ্মকাল। কঠিন পরিশ্রম করলেও খারাপ লাগে না আমার। সৈকতের রোদ আমার চামড়ার রঙ গাঢ় বাদামী করে দিয়েছে। কিছুটা ওজনও বেড়েছে আমার। বন্ধুবান্ধব নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি, সে ছেলেই হোক, কিংবা মেয়ে। সৈকতে আর ফাউন্টেইনে অনেকের সঙ্গে দেখা হয় আমার, যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু একা থাকতেই ভাল লাগে আমার।

সকাল-বিকাল নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত খবরের কাগজ পড়ি। কিন্তু কোথাও জেরো কিংবা সেই হাসপাতালে যাওয়া পুলিশম্যানের মৃত্যুর খবর পেলাম না। তবে কোন ঝুঁকি নিলাম না। মারিয়ানিকে ফোনও করলাম না, চিঠিও লিখলাম না, পুলিশের ভয়ে। বলা যায় না চুপচাপ ওর ওপর নজর রাখতে পারে ওরা। তাড়াহুড়া না করে মৌসুম শেষের অপেক্ষায় রইলাম আমি।

সেই গ্রীষ্মকালে অনেক কিছু ভাবলাম আমি। নিজের কথা, মামা-মামীর কথা, মারিয়ানির কথা।

জুলাই পেরিয়ে গেল। আগস্ট এল। যে কোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে এখানকার ব্যবসা। বড়জোর আর তিন সপ্তাহ কাজ করতে পারব আমি। তারপর নিউ ইয়র্কে ফিরে যাব। সব কিছুই নিরাপদ মনে হচ্ছে। স্কোয়ারের সেই মারামারির আর কোনও খবর নেই পত্রিকার পাতায়।

আগস্টের শেষ বুধবার। সৈকতের বালিতে চিত হয়ে শুয়ে আছি আমি, এক হাত মাথার নীচে, আরেক হাত চোখের ওপর রেখে রোদ আড়াল করেছি। তন্দ্রা এসে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে পুরো সজাগ হয়ে গেলাম। মারিয়ানি যদি অপেক্ষা না করে আমার জন্য? তাড়াতাড়ি উঠে ওকে ফোন করতে গেলাম।

সকাল এগারোটা বাজে। ও বাড়ি আছে কিনা কে জানে। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছি, কেমন হাঁদা মনে হচ্ছে নিজেকে, এই সময় ওপাশ থেকে জবাব এল: 'হ্যালো?' সুরেলা, উষ্ণ, স্পষ্ট কণ্ঠস্বর।

উত্তেজনায় তোতলানো শুরু করলাম: 'মা–মারিয়ানি?'

'ফ্র্যাঙ্ক!' বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল মারিয়ানি। 'ওহ্, ডার্লিং! কোথায় তুমি? আমি তো ভাবতেই শুরু করেছিলাম কোনদিন আর ফিরবে না তুমি।'

ওর কথা কানে যেন মধু বর্ষণ করল আমার। জবাব দিলাম: 'আটলান্টিক সিটিতে রয়েছি আমি। এখানে চাকরি করছি। তুমি কেমন আছো জানার জন্যে ফোন করলাম।'

'আমি ভাল আছি। তুমি ভাল?'

'ভাল।'

'কবে ফিরছ?'

'আর তিন সপ্তাহ পরে। এখানকার চাকরি শেষ হয়ে গেলে।'

'আরও তাড়াতাড়ি আসতে পারবে না?' মারিয়ানি জিজ্ঞেস করল। 'তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। অনেক কিছু ঘটে গেছে...' বাক্যটা শেষ করল না ও।

'আসতে তো চাই,' বললাম: 'তবে কথা দিতে পারছি না। যার কাছে চাকরি নিয়েছি তাকে বলেছি মৌসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাব না আমি।' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করলাম: 'ওখানে সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?'

আমি কী জানতে চেয়েছি বুঝতে পারল ও। 'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। ডার্লিং, আমি বরং তোমার কাছে চলে আসি, কি বলো? কয়েকটা দিন তোমার সঙ্গে কাটাতে পারব। আর অপেক্ষা করতে পারছি না।'

'কী বলব বুঝতে পারছি না,' দ্বিধান্বিত স্বরে জবাব দিলাম। 'বিকেল তিনটে থেকে রাত একটা পর্যন্ত কাজ করি আমি। একসঙ্গে থাকার বেশি সময় পাব না।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা জরুরি। গত কয়েক মাস কঠোর পরিশ্রম করেছি আমি। অনেক কথা ভেবেছি।'

'ও, তুমিও ভেবেছ?' হেসে বললাম। 'গত কয়েকটা সপ্তা ধরে আমিও অনেক কিছু ভেবেছি।'

'তাহলেই বোঝো,' ও বলল। 'তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা কত জরুরি। আমার জানা দরকার আমার যেমন লাগছে তোমারও তেমন লাগছে কিনা। আমি আসছি। তুমি কোথায় উঠেছ?'

ঠিকানা বললাম।

'আজ রাতেই আমি চলে আসছি,' মারিয়ানি বলল। 'জিনিসপত্র গোছগাছ করতে সময় লাগবে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব।'

'আমি রাত একটা পর্যন্ত কাজ করি,' আবার ওকে মনে করিয়ে দিলাম। 'তুমি বরং ফাউন্টেইনে চলে এসো। ভিক্টোরিয়া হোটেলের একটা বোর্ডওয়োকে

দোকানটা।'

'আজ রাতেই আসছি ওখানে,' ও বলল।

'ও কে,' আমি বললাম। 'দেখা হবে। সো লং।'

'ডার্লিং, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

একটা মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলাম। কথাগুলো আমার কানের ভিতর যেন বাজনার মত রিনরিন করে বাজছে। 'মারিয়ানি,' আবেগ চাপা দিতে পারলাম না: 'মারিয়ানি!'

'হ্যাঁ, বলো, ফ্র্যাঙ্ক,' মোলায়েম স্বরে বলল ও: 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?'

'তুমি জানো আমি ভালবাসি,' জবাব দিলাম।

'জানি,' ফিসফিস করে বলল ও। 'আমার ঘরে যেদিন তোমাকে প্রথম দেখি, যখন তুমি আমাকে প্রথম চুমু খেয়েছ, তখন থেকেই বাসি। ব্যাপারটাকে ভাল বলা যাবে না, কারণ তখন জেরো ছিল। তবু সত্যি কথাটাকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই।' ফোনের ভিতরেই ওর দীর্ঘশ্বাস ভেসে এল। 'আজ রাতেই তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ডার্লিং, গুড-বাই।'

'গুড-বাই,' আমি বললাম। রিসিভার রেখে দিয়ে ফিরে এলাম সৈকতে।

রাত বারোটায় আমি যখন ফাউন্টেইন পরিষ্কারে হাত দিয়েছি, তখনও এসে পৌঁছল না ও। ভোরের দিকে আসবে ভেবে ওর কথা বিদেয় করে দিলাম মন থেকে। অন্যপ্রান্তে কাজ করছে আমার বস চার্লি। আমি কাজ করছি দরজার পাশে। সিরাপ পাম্পটা ধুতে ধুতে কথা বলছি। একজন খদ্দেরও নেই আর এখন।

কোন মেয়েকে নিয়ে কোথাও যাই না দেখে মাঝে মাঝেই আমাকে রসিকতা করে চার্লি। কেন যাই না সেটা জানাইনি ওকে।

চলতি সপ্তাহের পর ব্যবসা আর থাকবে না তেমন। এখানে দোকান বন্ধ করে দিয়ে মিয়ামি বিচে চলে যাবার কথা ভাবছে ও। গ্রীষ্মকালে ওখানকার ব্যবসা চালায় ওর পার্টনার।

পাম্প মোছা শেষ করে, গ-াসগুলো ধুয়ে মুছে সুন্দর করে তাকে সাজিয়ে রাখলাম। তারপর ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাড়ে বারোটা বাজে।

'তাড়াহুড়া আছে নাকি, ফ্র্যাঙ্ক?' হেসে জিজ্ঞেস করল ও। 'কোন ব্যাপার আছে?'

মাথা নাড়লাম।

একটা সময় দোকান বন্ধ করে দিলাম আমরা। দোকানের বাইরে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম মারিয়ানির আসার অপেক্ষায়। কিন্তু ও এল না। হাঁটতে হাঁটতে বোর্ডওয়োকের শেষ মাথায় চলে এলাম। একটা বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরালাম। প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে জায়গাটা, দু'চারজন লোক হাঁটতে বেরিয়েছে। সাগরের দিকে তাকালাম। একটা জাহাজ চোখে পড়ল। পানিতে ছড়িয়ে পড়েছে ওটার আলো। ফ্লোরিডায় যাচ্ছে বোধহয়। মারিয়ানির কথাগুলো এখন কথার কথা মনে হচ্ছে আমার। ও আসলে আসবে না।

আমার চোখ টিপে ধরল দুটো হাত। কানের কাছে ফিসফিসে কণ্ঠস্বর: 'বলো তো, কে?'

আমি জানি, কে। ইচ্ছে করেই ভুল বললাম: 'জেন?'

'না,' মারিয়ানি জবাব দিল।

'হেলেন? মেরি? এডনা?' হাসতে শুরু করলাম।

'যাও, আরেকবার অনুমানের সুযোগ দিচ্ছি,' মারিয়ানি বলল। 'এবার যদি বলতে না পারো, বাড়ি চলে যাব। আমার আসাটাই বোধহয় ঠিক হয়নি। প্রচুর মেয়েমানুষ নিয়ে তুমি এখানে ব্যস্ত হয়ে আছো।'

ওর হাতটা ধরে চোখ থেকে সরিয়ে তালুতে চুমু খেলাম। তারপর হাতটা আমার গালে ঘষলাম। ঘুরে, টান দিয়ে ওকে বসিয়ে নিলাম আমার পাশে। 'মারিয়ানি, আমি ভাবছিলাম, তুমি বুঝি আর এলেই না!'

হাসল ও। ওর সুন্দর দাঁত আর লালচে চুল ঝলমল করে উঠল চাঁদের আলোয়। 'তোমার খোঁজ পাওয়ার পর একটা সেকেন্ডও আর বসে থাকতে পারিনি আমি, ডার্লিং।'

চুমু খেলাম ওকে। অবিশ্বাস্য এক ভাল লাগা। চাঁদ, তারা, সব কিছু যেন আমাকে ঘিরে পাক খেতে থাকল। মনে হলো বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি, মেঘের মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। অদ্ভুত এক আবেগে কথা হারিয়ে ফেললাম যেন, গলার ভিতর থেকে স্বর বেরোতে চাইছে না।

ওর চোখের দিকে তাকালাম। চোখে জল টলমল করছে।

'ফোনে যা বলেছিলাম সেটা সত্যি কিনা দেখলে তো?' ফিসফিস করে বলল ও। 'তোমার অনুভূতি আর আমার অনুভূতি মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেও এ থেকে পালাতে পারবে না তুমি। তোমার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে আমাকে জেরো। অনেকবার নাকি পালিয়েছ তুমি। আমি ভেবেছি আবার তুমি এ কাজ করবে, আমার কাছ থেকেও পালাবে। কিন্তু এখন আমি জানি। আমার কাছ থেকে পালাতে পারবে না তুমি।'

'মারিয়ানি, আমি তোমাকে ভালবাসি। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমি পেয়েছি, সেটা তুমি। তুমি আমার সব, সব। মারিয়ানি, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

বেঞ্চ থেকে উঠে বোর্ডওয়োক ধরে হাঁটতে লাগলাম আমরা। সৈকতের বালিতে নেমে এসে কথার ফুলঝুরি ছোটালাম। হাঁটছি আর কথা বলছি, কথা বলছি আর হাঁটছি। কখনও পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরছি, কখনও পাশাপাশি হাঁটার সময় হাতে হাত ঠেকে যাচ্ছে। বার বার ফিরে তাকাচ্ছি দুজন দুজনের চোখের দিকে।

তারপর চাঁদটা যখন পশ্চিমে হেলে পড়ল, আমি তখন আমার ঘরের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে, সাগরের দিকে চোখ, ঠোঁটে সিগারেট। ফিরে এলাম বিছানায়। সেরাতে ওর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক হলো আমার। মনে হলো, এই প্রথম কোন

মেয়েকে কিছু দিয়েছি, শুধু নিইনি।

ভোরবেলা হঠাৎ করেই ঘুম ভেঙে গেল আমার। পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছে মারিয়ানি। বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগলাম, এই সৌন্দর্য এখন আমার, ওর ভালবাসার মালিক আমি। ঘুম ভেঙে গেল ওরও। আধো ঘুমের মধ্যেই আমার গলা জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল: 'আমাকে কখনও ফেলে যেয়ো না, ফ্র্যাঙ্ক। কখনও না!'

'না, যাব না, মারিয়ানি,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিলাম। ওই মুহূর্তে মনে হলো, কোনদিনই ওকে ছেড়ে যেতে পারব না আমি।

নয়

পরদিন সকালে সাঁতার কাটতে গেলাম আমরা। নতুন একটা বাদিং সুট পরেছে মারিয়ানি, দারুণ দেখাচ্ছে ওকে। ওর সৌন্দর্য এমনই, যে কোন পোশাকে সুন্দর লাগে ওকে, এমনকী স্বল্প পোশাকেও। চমৎকার ছিপছিপে ফিগার ওর, লম্বা, সুগঠিত পা। চলনে হরিণীর চঞ্চলতা। ওকে পেয়ে আমি গর্বিত। এমন কোন পুরুষ মানুষ নেই, যে ওর দিকে তাকাচ্ছে না, তাতে আনন্দটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে আমার।

ও যে সুন্দরী, সেটা জানে ও। সাদা বাদিং সুটে যে পুরুষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারে, তা-ও জানে। বার বার ওকে সুন্দর বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেললাম, তাতেও যেন প্রাণ ভরল ন. আমার।

সাঁতার কাটার পর সৈকতের বালিতে শুয়ে পড়লাম আমরা। কথা বললাম, প্রচুর হাসলাম। নিজেকে বড় সুখি মনে হচ্ছে। অদ্ভুত এক অনুভূতি, যা আগে কখনও পাইনি। মনের আনন্দে ভোগ করতে থাকলাম সেই সুখ।

দুপুরে হট ডগ কিনে আনলাম আমি। বালিতেই খেতে বসলাম দুজনে। খেতে খেতে নিউ ইয়র্কের কথা জিজ্ঞেস করলাম ওকে। সেই পুরানো শহরই আছে, ও জানাল। প্রচুর ব্যস্ততার মধ্যে সময় কেটেছে ওর। আমি যখন ফোন করেছি, একেবারে ঠিক সময়ে করেছি, তখন ওর অবসর, কিছুই নাকি করার ছিল না। এখানে আসতে পেরে সে খুশি, আমাকে পেয়ে আরও খুশি। বলল, ভীষণ ভাল লাগছে।

খাওয়া শেষ করে ওর একটা হাত হাতে তুলে নিলাম। আবার পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম দুজনে। জিজ্ঞেস করলাম, জেরোর শেষকৃত্যে গিয়েছিল কিনা ও।

আস্তে করে জবাব দিল ও: 'না।'

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

শান্তস্বরে, অকপটে মনের কথাগুলো বলে গেল ও: 'কারণ আমি একটা ভীতু। মৃত্যুর পর ওর দেহটা কেমন হয়েছিল দেখার সাহস হয়নি। ও চলে গেছে, আর আমি বেঁচে থেকে জীবনকে উপভোগ করছি, এটা ভাবতেও ভাল লাগেনি। তোমাকে যেমন ভালবাসি, ওকেও ভালবাসতাম, আমি জানি কাকে বেশি ভালবাসি। তোমাকে ভালবেসেছি এক কারণে, ওকে অন্য কারণে। তোমরা দুজনে দুই জগতের বাসিন্দা, অথচ কেমন কাছাকাছি। তোমার জন্যেই আমি আসলে ওকে দেখতে যেতে পারিনি।'

'সাংঘাতিক লোক ছিল ও,' আমি বললাম। 'ওর এ ভাবে চলে যাওয়াটা খুব দুঃখজনক। ওর মত মানুষ সহজে জন্মায় না।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল মারিয়ানি। 'সত্যি বলছ, ফ্র্যাঙ্ক? ও চলে যাওয়াতে তুমি কি একটুও খুশি হওনি?–তোমার মনের গভীর কোণে খুশির ছোঁয়া...আমি বলতে চাইছি ও থাকলে তো তুমি আমাকে...'

কথাটা এভাবে ভেবে দেখিনি কখনও। হয়তো ঠিকই বলেছে ও। জেরো মরে যাওয়াতেই শহর থেকে বেরোনোর আগে মারিয়ানির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি। কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লাম। বালিতে টানটান হয়ে পড়ে আছে ও, চিত হয়ে, লাল চুল রোদে যেন জ্বলছে, ওর সুগঠিত বুক বাদিং সুটের ভিতর ফুলে রয়েছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে ওকে পেতে চাইলাম।

মারিয়ানির প্রশ্নের জবাবে ধীরে ধীরে বললাম: 'না, ওর মৃত্যু আমি দুঃস্বপ্নেও কামনা করিনি। তারমানে এই নয় তোমাকে পেতে চাইনি আমি। পরিস্থিতি আমাদের কাছাকাছি আসাটা সহজ করে দিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জেরো বেঁচে থাকলেও হয়তো এমন কিছু একটা করে বসতাম আমরা।'

আমার দিকে আড়চোখে তাকাল মারিয়ানি। 'মনে হয় না। কারণ যে ভাবে তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছিলে কাছাকাছি আসাটা সহজ হতো না।' হাত দিয়ে বাতাসে যেন থাবা মারল ও। 'তবে একটা কথা ঠিক, কিছু কিছু মানুষ একজন আরেকজনের জন্যে তৈরি হয়। এই যেমন তুমি আর আমি। তোমার সঙ্গে আমার দৈহিক ও মানসিক মিল এত বেশি, মনে হয় যেন এক মণ্ড থেকে কেটে নিয়ে বানানো। আমরা বুনো, আমরা স্বার্থপর, আমরা পচা। তোমার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে, কোন মেয়েই সেটা এড়াতে পারে না।'

ওর মন্তব্যে হেসে উঠলাম। 'আসলেই তাই। দুই হাতে ঠেলে সরিয়েও কুল করতে পারি না।'

ওর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম।

'বাহ্, বেশ সুখেই আছো দেখছি,' বলে উঠল একটা কণ্ঠ। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি আমার বস চার্লি। সাগর থেকে উঠে এসেছে। টপ টপ করে পানি পড়ছে গা থেকে। হেসে বললাম: 'হাই, চার্লি।'

'হাই, ফ্র্যাঙ্ক,' আমাদের পাশে বসে পড়ল ও।

ও মাঝখানে ঢুকে পড়াতে আমার ভাল লাগল না, তবে কিছু করার নেই। মারিয়ানির সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলাম।

'মারিয়ানি, ও চার্লি,' আমি বললাম।

দুজনে দুজনকে হ্যালো বলল। মারিয়ানি বুদ্ধিমতী। যেই জানল চার্লি আমার বস, অমনি ওর কাজ শুরু করে দিল।

'মৌসুম শেষে কাজকর্ম যদি কমেই গিয়ে থাকে, ফ্র্যাঙ্কের চাকরি করার আর দরকারটা কী? ও এখন কাজটা ছেড়ে দিলেই পারে,' মারিয়ানি বলল। 'নিউ ইয়র্কে ফেরার আগে বরং কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিক ও।'

আমার দিকে আড়চোখে তাকাল চার্লি। 'সেটা ফ্র্যাঙ্কের ব্যাপার। ও যদি ছেড়ে দিতে চায়, দেবে, তবে সোমবারের পর।'

মারিয়ানির দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকালাম। এত দ্রুত চার্লিকে রাজি করিয়ে ফেলতে পারবে ও, কল্পনাই করিনি।

'ঠিক আছে, এ নিয়ে পরে কথা বলব,' চার্লিকে বলে উঠে দাঁড়ালাম। 'চলো, ডার্লিং, হোটেলে যেতে হবে। পোশাক পরে ঠিক সময়ে কাজে না গেলে আবার বস মন খারাপ করবে।'

হাত ধরে মারিয়ানিকে টেনে তুললাম। চার্লিও উঠে দাঁড়াল। হাসছে। 'দেখা হবে,' বলে হাঁটতে শুরু করল সে।

হোটেলে ফিরে শাওয়ার সেরে বেরিয়ে দেখি কাপড় পরে ফেলেছে মারিয়ানি। ড্রেসারের আয়নার সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। আমার কোমরে তোয়ালে জড়ানো। ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। 'কী ব্যাপার? চার্লির ওখান থেকে আমাকে বের করে নিয়ে আসার চিন্তাটা মাথায় ঢুকল কেন বলো তো?'

ও হেসে জবাব দিল: 'বলেছিলাম না, আমরা স্বার্থপর। তুমি তো কাজে ব্যস্ত থাকবে, ওই সময়টা আমি কী করব? এত সুন্দর আবহাওয়ায় তোমাকে কাজে যেতে দিতে ইচ্ছে করছে না আমার। তারচেয়ে চলো, কোনখান থেকে ঘুরে আসি। চার্লিকে তো বলেই দিয়েছি সারা মৌসুম ধরে অনেক কাজ করেছ তুমি, এখন বিশ্রাম দরকার।'

'তুমি একটা ইয়ে!' হেসে উঠলাম। 'তবে একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ। কাজ যদি না করি, খাবার পাব না। আমার তো আর খাওয়ানোর মত ধনী বাবা-মা নেই।'

'খাওয়া নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' হেসে বলল মারিয়ানি। 'আমার ব্যাগে অনেক টাকা আছে। চার্লির চাকরিটা ছেড়ে দাও না কেন তুমি? এখানকার এই আঁস্তাকুড় থেকে বেরিয়ে কোনও ভাল হোটেলে চলে যেতে পারি। এই যেমন ধরো, টাওয়ার-এ। আরামে থাকত পারব।'

হালকা রসিকতার সুরে বললাম: 'তাই!'

'হ্যাঁ, তাই!' আমার কাছে এসে দাঁড়াল ও। 'ডার্লিং, তোমার জন্যে অনেক কিছু করতে চাই আমি। তোমার কাপড়চোপড়–ওগুলো বদলাতে হবে; জঘন্য হয়ে গেছে। তোমার যা ফিগার, ভাল পোশাকে তোমাকে খুব মানাবে। কীভাবে খাবার খেতে হয়, তা-ও তুমি জানো না, বুনো জানোয়ারের মত গপ্‌গপ্‌ গিলতে থাকো। তোমাকে খানিকটা সভ্য বানানো দরকার। আমি খুঁতখুঁতে মেয়ে; আর আমি তোমার জন্যে পাগল।'

'ও, তুমি তাহলে আমাকে সভ্য বানানোর জন্যে খেপে উঠেছ!' আমি বললাম। 'খুব খারাপ। তোমার ইচ্ছেটা কী বলো তো, ম্যাডাম?'

হেসে একটানে আমার কোমর থেকে তোয়ালেটা খুলে ফেলে দিল মারিয়ানি। আমার দুই বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল: 'ইচ্ছেটা অনুমান করে নাও।'

সন্ধ্যার মুখে যখন দোকানের ভিড় কমে এল, চার্লি আমাকে জিজ্ঞেস করল, মেয়েটা কে।

'আমার প্রেমিকা,' জবাব দিলাম। 'শহর থেকে এসেছে, আমার সঙ্গে কয়েকদিন কাটানোর জন্যে।'

শিস দিয়ে উঠল ও। 'এমনিতে তো ভালই মনে হচ্ছে। কিন্তু ওরকম সুন্দরী একটা

মেয়ের পাল-ায় পড়লে মাথাটা বিগড়ে যেতে বাধ্য। মগজে গোলমাল কি শুরু হয়ে গেল তোমার? নাকি অসুস্থ বোধ করছ?'

জবাব দিলাম না।

'ওই মেয়েটার কথামত সত্যি চাকরি ছেড়ে দেবে নাকি তুমি?' চার্লি জিজ্ঞেস করল।

'জানি না,' দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে জবাব দিলাম। 'এখনও কিছু ঠিক করিনি।' তবে কী করব, বুঝতেই পারছি। একবার যখন মারিয়ানি আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলেছে, না ছেড়ে পারব না। কারণ একেবারে সময়মত চাকরি ছাড়ার ভাবনাটা আমার মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে মারিয়ানি।

তারপর যা ঘটার তাই ঘটল–সোমবার রাতেই চাকরিটা ছেড়ে দিলাম আমি।

দশ

আটলান্টিক সিটিতে তিন সপ্তাহ কাটালাম দুজনে। টাওয়ার হোটেলের তেরো তলায় তিন কামরার একটা সুট বুক করলাম। তাতে সাগরের দিকে মুখ করা বারান্দা আছে। রুম সার্ভিস ঘরে খাবার দিয়ে যায়। আরও নানারকম কাজ করে দেয়। প্রচুর টাকা খরচ হয় তাতে। নগদ টাকায় পাওনা মিটিয়ে দেয় মারিয়ানি, কত দেয়, আমি দেখি না। অফুরন্ত টাকার ভাণ্ডার রয়েছে যেন ওর কাছে।

বোর্ডওয়োকে সারি দিয়ে থাকা অসংখ্য সুভনির শপ থেকে এগারো ডলার দিয়ে একটা রুপালি ব্রেসলেট কিনলাম আমি। তাতে খোদাই করে লেখালাম: আমার মারিয়ানিকে, ভালবাসা, ফ্র্যাঙ্ক। ভোর রাত তিনটেয় জিনিসটা ওর হাতে দিলাম। বারান্দায় বসা তখন আমরা। সাগর থেকে ফুরফুরে বাতাস আসছে। পাতলা কাপড়ের খুব সামান্য পোশাক মারিয়ানির পরনে, আর আমার পরনে শুধু পাজামা; সিগারেট টানছি। উপহারটা ওকে দেয়ার জন্য এ রকমেরই কোনও একটা মোহনীয় সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম আমি। উঠে ঘরে গিয়ে নিয়ে এলাম ওটা।

দেয়ার সময় কেমন যেন লাগল আমার। আজব এক অনুভূতি। এর আগে কাউকে কখনও উপহার দিইনি। কীভাবে দিতে হয়, দিয়ে কী বলতে হয়, জানি না। 'এটা তোমার জন্যে, মারিয়ানি,' বিব্রত ভঙ্গিতে ব্রেসলেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম।

অবাক মনে হলো ওকে। হাসিমুখে নিল জিনিসটা। 'ফ্র্যাঙ্ক, খুব সুন্দর,' বলে, খোদাই করা লেখাগুলো জোরে জোরে পড়ল: 'আমার মারিয়ানিকে, ভালবাসা, ফ্র্যাঙ্ক।' আমার দিকে মুখ তুলে হাসল ও। 'কথাটা খুব মিষ্টি–আমার মনে হয় আমাকেই প্রথম লিখলে।'

ওর কথার হালকা শে-ষটা কান এড়াল না আমার, আর তাতে আমি আহত বোধ করলাম। 'হ্যাঁ, তোমাকেই প্রথম। আগে কখনও কাউকে এভাবে বলিওনি, লিখিওনি।'

আমি যে রেগে গেছি ঠিকই বুঝল ও। তাড়াতাড়ি বলল: 'ডার্লিং, আমি কিছু ভেবে বলিনি, বিশ্বাস করো। তোমাকে দুঃখ দিতে চাইনি। সরি। তোমার এই জিনিসটা আমার এত পছন্দ হয়েছে, সব সময় হাতে পরে থাকব। দাও, পরিয়ে দাও।' আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল ও।

ব্রেসলেটটা ওর কব্জিতে বেঁধে দিলাম। ওর কড়ে আঙুলে একটা আঙটি, তাতে হীরা ও দুটো চুনি পাথর বসানো। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠল ওগুলো। তার পাশে আমার সস্তা ব্রেসলেটটা কেমন হাস্যকর দেখাল। আফসোস হলো আমার, জিনিসটা কিনেছিলাম বলে। দুটো জিনিস আমাদের মাঝের পার্থক্যটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। শহরে ফিরে–নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম–আমি অনেক টাকা রোজগার করব, যাতে এমন হাস্যকর সস্তা জিনিস আর ওকে না কিনে দিতে হয়।

সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখে নিউ ইয়র্ক ফিরে এলাম আমরা। ওর বাসাতেই উঠলাম। কয়েক দিন থাকার পর ঠিক করলাম কাজ খুঁজতে বেরোব। কাজ পাওয়া তখনও খুব কঠিন। প্রথম কয়েকটা দিন কোন কাজই জোগাড় করতে পারলাম না।

ইতিমধ্যে ও ব্যস্ত রইল তার নিজের কাজ নিয়ে। অনেক কাজ ওর, খাটতেও পারে ভীষণ। আর যখন কাজ করে দুনিয়ার কোনদিকেই ওর নজর থাকে না। আমিও যাতে বিরক্ত করতে না পারি সেজন্য আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে প্রায় তাড়িয়ে খেদায় আমাকে বাসা থেকে। সিনেমায় কিংবা অন্য কোনখানে গিয়ে কাটিয়ে আসতে বলে। প্রথমে ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন নতুন মনে হলো। তবে 'রানী' কোন ভুল করতে পারে না, ভাবলাম। ওর ছবি আঁকা দেখতে আমার ভাল লাগে; এত নিবিষ্ট মনে আর একাগ্রতা নিয়ে কাজ করে। এ সব সময়ে আমি কিছু বললে খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়, কখনও দেয়ই না, যেন আমার কথা ওর কানেই ঢোকেনি।

কোনও একটা দিন যদি ভাল কাটে, ছবি আঁকা ভাল হয়, খুশিতে রাতে অস্থির হয়ে ওঠে ও। প্রচুর রসিকতা করে, শ্যাম্পেন খায়, আমিও ভাল কোন খাবার রান্না করে খাওয়াই ওকে। বেশির ভাগ রান্না আমিই করি, বাবুর্চি হিসেবে খুবই খারাপ ও, এ কথাটা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছে আমাকে। মাঝে মাঝে ওর বন্ধুরা দেখা করতে আসে–ওরই মত শিল্পী কেউ, কেউ বা লেখক, কবি কিংবা অন্য কিছু–ওদের অনেকেই বুদ্ধিজীবী, নিজেদের আলাদা জগৎ আছে। ওদের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় খুব ভদ্রভাবে আমি কী করি জানতে চায়। যখন বোঝে আমি ওদের দলের কেউ নই, আবার ভদ্রভাবেই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমাকে এড়িয়ে ওদের নিজস্ব আলোচনায় মেতে ওঠে। যতক্ষণ ড্রিংকের প্রয়োজন না হয় আমার দিকে আর নজর দেয় না। প্রয়োজন হলে আমার খোঁজ পড়ে, এমন ভঙ্গিতে ডাকে, যেন আমি বাড়ির চাকর।

কিন্তু আমি মারিয়ানির প্রেমে উন্মাদ, খেপা প্রেমিক। তাই রানী কোন ভুল করতে পারে না ভেবে নিজেকে প্রবোধ দিই। রানী আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যায়, জিনিসপত্র কিনে দেয়, ইতিমধ্যেই তিনশো ডলারের সুট, কোট, শার্ট কিনে দিয়েছে। বিলাসবহুল দামী অন্তর্বাস পরি আমি এখন। সিল্কের পাজামা পরি। প্রথম প্রথম কাজ জোগাড়ের চেষ্টা করেছি, একটা কাজ পেয়ে গিয়ে যখন উত্তেজিত হয়ে বাসায় ফিরেছি, নির্লিপ্ত কণ্ঠে মারিয়ানি জানতে চেয়েছে: 'বেতন কত?'

'সপ্তাহে ঊনিশ ডলার,' বলেছি আমি। ভেবেছি টাকার অঙ্ক শুনে খুশি হবে মারিয়ানি।

'মাত্র ঊনিশ!' নাটকীয় ভঙ্গিতে বাতাসে হাত নাচিয়ে প্রায় চিৎকার করে বলে ও। 'এই টাকা দিয়ে কী হবে? তোমার সিগারেটের দামও তো হবে না।'

'কিন্তু ওটা তো চাকরি,' একগুঁয়ে কণ্ঠে বোঝানোর চেষ্টা করি। 'একেবারে কিছু না করার চেয়ে তো এটা ভাল।'

'করাটা আরও খারাপ!' জোরাল প্রতিবাদ জানায় ও। 'তোমার যা বুদ্ধিমত্তা, যা ক্ষমতা, এই কাজ তোমাকে মানায় না, এটা করা তোমার জন্যে অপমানজনক। এরচেয়ে

অনেক বেশি মূল্য হওয়া উচিত তোমার। তা ছাড়া, ডার্লিং, তোমার তো কোন প্রয়োজন নেই, কেন করবে এই কাজ? তুমি চাইলে সপ্তাহে এর দ্বিগুণ তোমাকে দেব আমি।'

মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল আমার। 'কিন্তু সারাক্ষণ এ ভাবে বসে থাকাটাই বা কেমন। তা ছাড়া সব সময় তোমার কাছে টাকা চাইতেও ভাল লাগে না।'

'খারাপ লাগার তো কিছু নেই, ডার্লিং,' কাছে এসে চুম খেল আমাকে ও। 'আমার যদি টাকা না থাকত, তোমার থাকত, তোমার কাছ থেকে নিতে আমার একটুও খারাপ লাগত না।'

'কিন্তু সেটা তো আলাদা কথা,' আমি বললাম।

'না, আলাদা নয়,' ও বলল। 'তুমি আমার অতি আপন। আমার টাকা তোমারও টাকা। সমান ভাগ।'

এরপর আর কথা চলে না, বিশেষ করে ও যখন মিষ্টি ব্যবহার করে। তারপর থেকে আমার কাজ খোঁজা বন্ধ হয়ে গেল। সহজ জীবন কাটতে লাগল আমার, আর সহজ জীবনই আমার ভাল লাগে। নিজেকে বোঝাই, যাক না এ ভাবে কিছুদিন, আজ হোক কাল হোক ভাল চাকরি পেয়ে যাবই, তখন আর আমার বসে থাকা লাগবে না।

মাসখানেক পরে ছোট যে টেবিলটায় সিগারেট রাখি আমি, একটা সিগারেট নেয়ার জন্য সেটার কাছে গেলাম–এই টেবিলেই জেরোর ছবিটা রাখা ছিল–দেখি ছবিটা নেই। ওটার জায়গায় আমার একটা ছবি। তাকিয়ে রইলাম। ঠিকই আছে মনে হলো। ছবি সম্পর্কে আমার তেমন কোন ধারণা নেই। সে-কারণেই বোধহয় আমার মনে হতে থাকল, ওই ছবি আমার নয়, চেহারার সঙ্গে মিল নেই। তা ছাড়া ছবিটা ওখানে রাখাটাও ঠিক কাজ হয়নি।

'কী, ডার্লিং, পছন্দ হয়েছে?' আমার পিছন থেকে শোনা গেল মারিয়ানির কণ্ঠ।

ঘুরে দাঁড়ালাম ওর দিকে। 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে।'

'তোমার জন্যে–একটা উপহার; তুমি যা তাই এঁকেছি: তুমি খুব চমৎকার মানুষ, আমাকে সুখি করেছ।' এগিয়ে এসে আমাকে চুমু খেল ও।

'থ্যাংকস,' আমি বললাম।

'আমাকে ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই,' ও বলল। 'আমি নিজের ভাল লাগার জন্যেই এঁকেছি এটা। এমনভাবে এঁকেছি, যাতে শেষ হবার আগে তুমি কিছু বুঝতে না পারো। তোমার একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বসে থাকার সময় এঁকেছি।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'তুমি মনে হচ্ছে খুশি হওনি?'

'জেরোর ছবিটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ওহ্, ওটা!' ঘুরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মারিয়ানি। 'ছবির দালাল ছবিটা দেখে খুব পছন্দ করেছে, বলেছে, ভাল দামে বিক্রি হবে। ওকে বিক্রি করতে দিয়ে দিয়েছি।'

'ফিরিয়ে আনো,' আমি বললাম। 'ওটা আমার দরকার।'

আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল ও। 'কেন?'

'ওটা আমার দরকার। কেন চাই, তা বলতে পারব না, কারণ আমি নিজেও জানি না।'

রেগে যাচ্ছে মারিয়ানি। 'কারণ না বললে আমিও ফেরত আনব না,' রাগতস্বরে বলল ও। 'ওটা কেন ফেরত চাচ্ছ কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

আমার ছবিটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম। 'ছবিটা খুব ভাল আঁকা হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এর বেশি কিছু না–মন খুশি করা একটা ছবি। এ ছবির কোন ভারত্ব নেই, কিছু বলতে পারে না। নিশ্চয় আমার মধ্যে এমন কোনও বৈশিষ্ট নেই যা ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা যায়। কিন্তু জেরোর ছিল। আর সেটাই তুমি ছবিতে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলে। আর সেই অসামান্য ছবিটার জায়গায় আমার অতি সাদামাঠা ছবিটা রেখেছ। এ ভাবে কোন কিছুকে কবর দেয়া যায় না। আর তুমি দিতে চাইলেও আমি দিতে দেব না। ওই ছবিটা আমার চাই।'

ঝটকা দিয়ে আচমকা উঠে দাঁড়াল মারিয়ানি। ভারি দম নেয়ার কারণে জোরে জোরে ওঠানামা করছে ওর বুক। ওর প্রতিক্রিয়া দেখেই বুঝতে পারলাম প্রচণ্ড রাগিয়ে দিয়েছি। 'না, আমি ওটা ফেরত আনতে পারব না,' চিৎকার করে উঠল ও। 'তুমি আমাকে বলার কে? আদেশ দেয়া তোমাকে সাজে না।'

টেবিল থেকে আমার ছবিটা তুলে নিলাম। তারপর ধীরে ধীরে ছিঁড়তে আরম্ভ করলাম। 'বোকা বউদের মত চেঁচিয়ো না,' শান্তকণ্ঠে বললাম ওকে, যদিও ভিতরে ভিতরে টগবগ করে ফুটছি।

ছবিটা ছিঁড়তে দেখে আমার কাছে এসে দাঁড়াল ও; আমার মুখে ঘুসি মারতে লাগল, খামচাতে খামচাতে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল। 'গাধা কোথাকার! আমি তোমাকে যত্ন করি, তোমার কথা শুনি বলে ভেবেছ আমার মালিক হয়ে গেছ তুমি। যে নর্দমা থেকে তোমাকে তুলে এনেছি সেখানে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে।'

হঠাৎ কী যেন বিস্ফোরিত হলো আমার ভিতরে। ঠাস করে চড় মারলাম ওর গালে। কাউচের ওপর প্রায় উল্টে গিয়ে পড়ল সে, তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বরফের মত শীতল কণ্ঠে বললাম: 'জেরোর ছবিটা ফেরত আনবে, নইলে এমন পেটান পেটাব, আস্ত রাখব না বলে দিলাম।'

হঠাৎ ওর চেহারার ভঙ্গি বদলে গেল; নরম হয়ে এল। 'সেটাও তুমি পারবে আমি জানি!' খসখসে কণ্ঠে বলল ও।

'হ্যাঁ, পারব,' কঠিন কণ্ঠে বললাম। 'কাজেই জেরোর ছবিটা ফেরত আনো।'

দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে আমাকে নিজের পাশে বসাল ও। 'তুমি আমার প্রেম, আমার ভালবাসা, শক্তিমান দুষ্টু ডার্লিং, অবশ্যই তোমার ছবি তুমি ফেরত পাবে। তুমি যা চাও আমি তাই দেব তোমাকে।'

আমাকে চুমু খেল ও। যেন জ্বলন্ত আগুনের মত ঠোঁটজোড়া আমার পৃথিবীটাকে উলট-পালট করে দিল। তবে পরদিন সকালেই আবার আগের জায়গায় দেখতে পেলাম জেরোর ছবিটা।

এগারো

ঘরের কোণে মস্ত ইজি চেয়ারটায় বসে মারিয়ানির দেয়া পাইপ টানতে টানতে মনস্থির করে ফেললাম আমি। পাইপটা হাতে নিয়ে বিতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলাম ওটার দিকে। ওটার বাটি থেকে খানিকটা তিক্ত রস মুখে ঢুকে গেছে আমার। এই জঘন্য জিনিসটা যে কেন টেনে চলেছি আমি বুঝতে পারি না। আমার পছন্দ নয় এই জিনিস। কখনই ছিল না। কিন্তু মারিয়ানি বলেছে: 'ডার্লিং, পাইপ টানো না কেন তুমি?'

আমি জবাব দিয়েছি: 'আমি জানি না। কখনও টেনে দেখিনি।'

'পাইপের মধ্যে একটা পুরুষালী ব্যাপার আছে,' ও হেসে বলেছে। 'শুধু পুরুষ মানুষকেই মানায়। কখনও কোন মেয়ে পাইপ টানে না। তুমি চাও?'

'না,' জবাব দিয়েছি: 'আমার পাইপ লাগবে না। ক্যামেল সিগারেটেই আমার চলবে।'

কিন্তু পরদিনই গিয়ে একটা নয়, চার-চারটে পাইপ আর ওগুলোর সরঞ্জাম কিনে নিয়ে এল মারিয়ানি। দামি সুগন্ধী তামাকও কিনে আনল। আর সেগুলো আমার হাতে দেয়ার আগে নাটকীয়তা শুরু করল। পাইপে তামাক না ভরা পর্যন্ত আমাকে রেহাই দিল না।

'দাও, ধরিয়ে দিই,' ওর মাথাটা সামান্য কাত করা, হাতে এক বাক্স দিয়াশলাই।

কাঠি জ্বেলে তামাকের ওপর ধরল ও, আমি টানতে থাকলাম। পিছিয়ে গিয়ে আমাকে দেখতে লাগল ও। পাইপের তামাকের স্বাদ খুব তেতো। ভাল লাগার কোনই সম্ভাবনা নেই। আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করল। কিন্তু চার-চারটে পাইপ ভাঙার অসম্ভব ইচ্ছেটা পূরণ করা আমার সাধ্যের বাইরে, ভয়ঙ্কর রেগে যাবে তাতে মারিয়ানি। বাধ্য হয়ে বিস্বাদ তামাকের ধোঁয়া টেনে ফকফক করে ছাড়তে লাগলাম।

আচমকা মেঝেতে বসে পড়ে আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল ও। 'সাংঘাতিক লাগছে তোমাকে,' গভীর ভালবাসার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মারিয়ানি, চেহারায় কেমন ছেলেমানুষী ভঙ্গি। 'এই পাইপ জিনিসটা তোমার মত পুরুষদের জন্যেই বানানো হয়েছে।'

এত কথার পর ওই পাইপ টানা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না আমার। জিনিসটা আমার কাছে জঘন্য লাগছে, আমাকে অসুস্থ করে ফেলছে, বুঝতে দিলাম না ওকে। যতই টানলাম, ততই বিরক্ত হলাম; বহুবার পাইপের কটু স্বাদ দূর করার জন্য সিগারেট টানতে হয়েছে আমাকে।

হাতের পাইপটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, যেন আমার অসহায়ত্বের একটা প্রতীক ওটা–আমি যে জিনিসে পরিণত হয়েছি তার চিহ্ন। এই যে আমি, তরুণ, শক্তিমান, স্বাস্থ্যবান একটা পুরুষ প্রবল আকুতি থাকা সত্ত্বেও আমার ইচ্ছের কাজগুলো আমি করতে পারছি না। কাজ করার জন্য যে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি, ঠিক তা নয়, তবে নিজেকে একটা অকর্মা মনে হচ্ছে। মারিয়ানির বাড়িতে অলস বসে থাকা, ওর ফাইফরমাশ খাটা, ওর সঙ্গে প্রেম করা ছাড়া আর যেন কিছু করার নেই আমার। এ ভাবে অলস সময় পার করতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার।

অবচেতনভাবেই আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল টেবিলে রাখা জেরোর ছবিটার ওপর। সামান্য কাত হয়ে থাকা ল্যাম্পের আলো গিয়ে পড়েছে ঠিক ছবির ওপর, বাকি টেবিলটা আবছা অন্ধকারে ঢাকা। ওর ব্যক্তিত্বভরা চেহারাটা যেন অদ্ভুতভাবে টানতে শুরু করল আমাকে। চোখ আধবোজা করে ছবিটার দিকে তাকিয়ে যেন ওর কথা শুনতে পেলাম: 'আমার কিছু জরুরি কাজ পড়ে আছে। ওই কাজগুলো করা কোনদিনই সম্ভব হবে না যদি এখানকার সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়ি। পৃথিবী তোমাকে কিছু দিতে চায়, সেটা নেয়ার জন্যে তৈরি করতে হবে তোমাকে।'

ও যেন বলছে: 'কীসের খোঁজ করছ তুমি, ফ্র্যাঙ্ক? কীসের ভয়ে নিজেকে আগলে রেখেছ? কী চাও তুমি? সেটা পাওয়ার জন্যে কী করছ?'

ও যেন আরও বলছে: 'শুধু কাজ করেই একজন পুরুষ তার পৌরুষ প্রমাণ করে, কাজ তাকে জ্যান্ত করে, পুরুষ মানুষের মত বাঁচিয়ে রাখে–'

মারিয়ানির কথায় চমকে গিয়ে বাস্তবে ফিরে এলাম। 'কী ভাবছ, ফ্র্যাঙ্ক?'

আধো হাসি মুখে টেনে এনে, জেরোর ছবিটা দেখিয়ে জবাব দিলাম: 'ওর কথা।'

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ছবিটার দিকে তাকাল মারিয়ানি। 'আমিও তাই ভেবেছি। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও যেন তোমার সঙ্গে কথা বলছে।'

'হয়তো সত্যিই বলেছে,' আমি বললাম: 'আমাকে কিছু সৎ পরামর্শ দিয়েছে।'

পাইপ রেখে একটা সিগারেট ধরালাম। ওটা যখন পুড়ছে, একটা সিদ্ধান্তে এলাম আমি। কখনও আর পাইপ টানব না আমি। আর সেটার কথা ভাবতে গিয়েই আরেকটা চিন্তা মাথায় এল আমার। বললাম: 'মারিয়ানি।'

চেয়ার থেকে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এল ও। আমার পায়ের কাছে মেঝেতে বসল। আমার পা জড়িয়ে ধরে দেহটা চেপে ধরল পায়ের সঙ্গে। 'বলো, ডার্লিং।'

'আমার একটা কাজ দরকার।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ও। 'এ কথাটাই কি ভাবছিলে এতক্ষণ ধরে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম।

'কিন্তু, ডার্লিং,' ও বলল: 'ও সব ছোটখাট কাজে নিজেকে ক্ষয় করার তো কোন প্রয়োজন নেই তোমার। তুমি কি সুখী না এখানে? কোন জিনিসের কি অভাব আছে

তোমার?'

'আছে,' জবাব দিলাম: 'নিজেকে অকর্মা মনে হয় আমার–চারিদিকে কত কী ঘটে যাচ্ছে, সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন আমি। আগে কখনও এ রকম লাগেনি।'

'চারিদিকে যা ঘটে ঘটুক না, তাতে তোমার কী? ওগুলোতে ভাল কিছু তো নেই। এখানে অনেক আরামে আছো: শুধু আমরা দুজনে, আমাদের ছোট্ট পৃথিবী, বিরক্ত করার কেউ নেই, অন্যের সমস্যা যন্ত্রণা তৈরি করছে না আমাদের। তুমি আমাকে ভালবাস না?'

ওর দিকে তাকালাম। আমার হাঁটুতে থুতনি রেখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'নিশ্চয় ভালবাসি আমি তোমাকে,' আমি বললাম। 'কিন্তু তার সঙ্গে আমার সমস্যার কোন সম্পর্ক নেই। আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমার জন্যে পাগল, তোমার সঙ্গে থেকে আমি সুখী; কিন্তু তাতেই সবকিছু পূরণ হয়ে যাচ্ছে না।' আমার মনে যা চলছে, যা ভাবছি সেটা ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এ ভাবে: 'ধরো, তোমাকে তোমার ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে বলা হলো, কেমন লাগবে তোমার?'

'ওটার কথা আলাদা,' ও জবাব দিল। 'ওটা শিল্প। ওটাতে মনোনিবেশ করে অন্যরকম সুখ আছে। ছবি আঁকা শুধু কাজ নয়।'

'শুধু কাজ নয়, কিন্তু কাজ তো,' আমি বললাম: 'আর ওটা ছাড়া তোমার খালি খালি লাগবে। আমি যা করতে চাই, সেটা শিল্প নয় ঠিক, কিন্তু তোমার ছবি আঁকার মতই আমার মনের খোরাক, তোমার কাজ যেমন তোমাকে খুশি রাখে, আমার কাজও আমাকে খুশি রাখে।'

উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল ও। 'তুমিও জেরোর মতই কথা বলছ,' মারিয়ানির কণ্ঠের ধারটা আমি বুঝতে পারলাম।

ওর এই মন্তব্যে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম: 'জেরোর মত মানে?'

আমার কথার জবাব না দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল মারিয়ানি। তারপর বলল: 'কতবার আমি ওকে অনুরোধ করেছি, প্রায় পায়ে ধরেছি, ওসব ঝামেলায় না জড়াতে। এখানে আমার সঙ্গে আরামে থাকতে। তোমাকে এখন যেভাবে বোঝাচ্ছি, ওকেও বুঝিয়েছি। শোনেনি। ও ওর আদর্শ আঁকড়ে রইল। এখন ও কোথায়? নিজেকেও ধ্বংস করল, আমার সুখও কেড়ে নিল।'

উঠে দাঁড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরলাম। 'কেঁদো না। আমি আমাকে ধ্বংস করব না, তোমার সুখও কেড়ে নেব না। আমি আসলে আমাকে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখতে চাই। এখন যে অবস্থায় আছি, তাতে শুধু আমার খোসাটাই আছে। রাস্তায় বেরিয়ে যখন সবাইকে কাজে ব্যস্ত দেখি, নিজের বেকারত্বের কথা ভেবে এক ধরনের কষ্ট হতে থাকে। শুধু সিনেমা দেখে আর বসে বসে সময় কাটিয়ে কি ভাল লাগে বলো। আমি কিছু করতে চাই, নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাই।'

কান্না থামাল ও। 'তাহলে বাড়িতে বসেই কিছু করো না কেন? জেরো যা করত সেটা করতে পারো। লেখার চেষ্টা করতে পারো। তোমার বুদ্ধি আছে, যা বলতে

চাও বলতে পারো, লিখতে না পারার তো কিছু দেখি না।'

মারিয়ানির কথা শুনে চেষ্টা করেও হাসি ঠেকাতে পারলাম না। আমি–লিখব! 'না,' হেসে বললাম: 'আমি তা পারব না। আমার সম্পর্কে তোমার যে এত উঁচু ধারণা, শুনে খুশি হলাম। কিন্তু আমি তো জানি আমি কী। আমার আসলে একটা চাকরিই খোঁজা উচিত।'

*

তবে কাজ পাওয়া এত সহজ নয়। ঠাণ্ডাও পড়তে শুরু করেছে। সারাদিন খোঁজাখুঁজি করে ক্লান্ত হয়ে, মেজাজ খারাপ করে ঘরে ফিরি, ব্যর্থতার কারণে।

আর কাজ থামিয়ে–সেটা ছবি আঁকাই হোক, কিংবা ঘরের অন্য কোন কাজ–আমার কাছে এসে দাঁড়ায় মারিয়ানি। জিজ্ঞেস করে: 'কিছু হলো?'

মাথা নেড়ে জবাব দিই: 'না।'

'কেন অকারণে ঘুরে বেড়িয়ে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ?' ও আমাকে বলে। 'এ সব বন্ধ করো। আরামে থাকো।'

জবাব দিই না। তবে ধীরে ধীরে আমিও আশা ছেড়ে দিতে শুরু করেছি। মাসখানেক পর চাকরি খোঁজা বাদ দিয়ে আবার ঘরে বসে রইলাম।

মারিয়ানি তাতে খুব খুশি, তবে আমার মন তেতো হয়ে গেল। অতি সাধারণ একটা চাকরিও জোগাড় করতে পারলাম না। বড় চেয়ারটায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরোর ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকি, ওটাও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে; ভাবি নিজের ব্যর্থতার কথা।

একদিন ওরকম করে তাকিয়ে আছি, মারিয়ানি তার কাজ করছে, এ সময় নিজের ভিতর থেকে কে যেন কথা বলে উঠল: 'তুমি গেছ। তুমি আর কোনদিন কিছু করতে পারবে না। এ ভাবে অন্যের কাছ থেকে হাত পেতে নিয়েই চলতে হবে তোমাকে।'

এতই বাস্তব মনে হলো কণ্ঠস্বরটা, চিৎকার করে জবাব দিলাম: 'না, আমি চলব না!' ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান করে দিল যেন সে-শব্দ।

হাতের ব্রাশ টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে ভীষণ রাগে চেঁচিয়ে উঠল মারিয়ানি: 'তোমাকে না কতবার বলেছি, আমি যখন কাজ করি কোন শব্দ করবে না!'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম। ও যে ঘরে রয়েছে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। বললাম: 'সরি।'

'সরি!' মুখ ভেঙচে বলল মারিয়ানি। 'ও বলে কিনা, সরি! আরে গাধা, তুমি কি জানো তুমি কি করেছ! তুমি আমার ছবির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ। আর আমি ওটা শেষ করতে পারব না।'

হঠাৎ করেই আমিও রেগে গেলাম। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল যেন আমার ভিতরটা। 'না, সরি নই–সরি নই আমি, দুঃখ প্রকাশ করে ভুল করেছি। নিজের ক্ষমতার বাইরে কাজ করতে চেয়েছ, পারনি, নিজের দুর্বলতা ঢাকতে দোষটা

চাপাচ্ছ এখন আমার ঘাড়ে।'

'নিজের দুর্বলতা!' আরও জোরে চিৎকার করে উঠল ও। 'তারমানে আমি অযোগ্য! আমি অযোগ্য এটা তুমি বলার কে?' টেবিল থেকে একটা ছোট ছুরি তুলে নিয়ে আমার দিকে এগোল সে।

শীতল হাসি হাসলাম। ব্যঙ্গ করে বললাম: 'তুমি ছুরি মারবে আমাকে? সাধ্য আছে?'

থমকে দাঁড়াল ও। হাতের ছুরিটার দিকে তাকাল একবার। তারপর আমার দিকে। মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল ছুরিটা। লজ্জা আর রাগ একসঙ্গে খেলা করছে ওর চেহারায়। মনে হচ্ছে যেন চাঁদের মুখে মেঘ ছুটে বেড়াচ্ছে। 'শয়তান, পাজি,' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'অকর্মা কোথাকার!'

টের পাচ্ছি আমার মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে। রাগে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে হাত-পা। ওই মুহূর্তে ওকে খুন করতে পারতাম আমি। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রয়েছি আমরা। সেকেন্ডের পর সেকেন্ড পেরিয়ে যাচ্ছে। কপালের একটা শিরা দপ্‌দপ্‌ করে লাফাচ্ছে। আপনাআপনি মুঠো হয়ে এল হাত।

তারপর হঠাৎ খুলে গেল মুঠি। ঘামে ভেজা হাতের তালু। কাঁপছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে হুক থেকে একটানে হ্যাটটা নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। দরজার ভিতর দিয়ে শোনা যাচ্ছে মারিয়ানির ডাক: 'ফ্র্যাঙ্ক, ফ্র্যাঙ্ক, ফিরে এসো!'

ফিরেও তাকালাম না। বারান্দা দিয়ে এগোনোর সময় ওর ভীত চিৎকার কানে এল: 'কোথায় যাচ্ছ তুমি? জলদি ফিরে এসো!' আমাকে হারানোর ভয়ে কাঁপছে ওর কণ্ঠ।

আমি জানি ফিরে আমি আসব, আসতে হবে, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য ওকে মানসিক কষ্ট দেয়ার, ওকে ভোগানোর একটা বিকৃত ইচ্ছা চেপে রইল যেন আমার মনে।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম, মাতাল হয়ে, আমার জীবনে এই প্রথম মাতাল হলাম। তবে কোন কিছু না বোঝার মত ততটা হইনি। ভিতরে ঢোকার আগে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পাতলাম। কোন শব্দ শুনলাম না। চাবি ঢোকালাম দরজার তালায়।

টলতে টলতে টেবিলের কাছে গিয়ে জেরোর ছবিটা তুলে নিলাম। 'জেরো, মাই ফ্রেন্ড,' জড়িত গলায় বলতে থাকলাম: 'মাই ফ্রেন্ড, আমি তোমাকে মিস করছি।' তারপর ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম মাতালের কান্না। ধপ করে বসে পড়তে গেলাম আমার চেয়ারে, কিন্তু চেয়ারে না বসে পড়লাম মাটিতে, জেরোর ছবিটা হাতেই ধরা রয়েছে। ওটা চোখের সামনে এনে হু-হু করে কাঁদতে থাকলাম। 'মাই ফ্রেন্ড, আমাকে বলো আমি কী করব। আমি তো নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।'

বেডরুমের দরজা খুলে গেল। মারিয়ানি এসে দাঁড়াল আমার সামনে, পরনে আটপৌরে ঢিলেঢালা পোশাক। 'মারিয়ানি,' ছবিটা ওর দিকে তুলে ধরে চেঁচিয়ে

উঠলাম: 'ও আমার সঙ্গে কথা বলে না।'

একটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করল মারিয়ানি। তারপর আমার হাত থেকে ছবিটা নিয়ে টেবিলে রেখে দিল। হাত ধরে আমাকে টেনে তুলে বেডরুমে নিয়ে এল। কাপড় খুলে দিল। আমার জুতো যখন খুলছে ও, বিছানায় নেতিয়ে পড়ে আছি আমি।

'ওহ্, ডার্লিং,' ফিসফিস করে বলল ও। আমার শার্ট খুলে নিয়ে পাজামা পরতে সাহায্য করল। 'কেন করলে এ কাজ? সব দোষ আমার–আমার কুত্তা মেজাজের!'

মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। এত সুন্দর কখনও লাগেনি ওকে। 'মারিয়ানি,' প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরলাম ওকে: 'আমি...আমি তোমাকে ভালবাসি।'

বারো

আসল ভাঙনটা শুরু হলো ওর এক বন্ধুর দেয়া থ্যাংকসগিভিং পার্টিতে। বুঝতে পারছি আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে মারিয়ানি। তবে এখন আর তাতে বিরক্ত হই না আমি। বরং ভালই লাগে। আমি ওকে ভালবাসি। ওর কথা বলার ধরণ, হাঁটার ভঙ্গি, সব ভাল লাগে। আমার গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে যখন নাচে, ভাল লাগে।

তবে বাসার বাইরে অন্য কোনখানে ওর পার্টিতে যাওয়াটা আমার পছন্দ হয় না। আমি আর ও যখন একা থাকি, সেটা এক কথা, কিন্তু অনেক মানুষের ভিড়ে আরেক। পার্টিতে নিজের সমকক্ষ শিল্পীদের মধ্যে মিশে যায় ও। আমি মিশতে পারি না। কারণ আর্ট আমার বিষয় নয়, আর্টের আমি কিচ্ছু বুঝি না। দূরে দূরে থাকি, ড্রিংক হাতে একা, পার্টি কখন শেষ হবে সেই অপেক্ষায়। প্রচণ্ড একঘেয়ে লাগে। যেন অনন্তকাল পরে পার্টি শেষ হয়। আমরা বাড়ি ফিরি।

দুজনেই চুপচাপ থাকি। ওয়াশিংটন স্কোয়ারের ভিতর দিয়ে যাই, যেখানে দোতলা বাসগুলো যাত্রীর জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। রাতের ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস যেন ছুরির মত কাটে আমাদের। বাড়ি ফেরার আগে দুজনের কেউই কোন কথা বলি না। ঘরে ঢোকার পর মারিয়ানি বলে: 'পার্টিটা খুব জমেছিল, তাই না?'

ঘোঁতঘোঁত করে জবাব দিই: 'অ্যাঁ? হ্যাঁ!'

মারিয়ানি আর কিছু বলে না। ও জানে ওর পার্টি নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। মুখের ওপর সেটা স্বীকার করি না।

সেদিনকার পার্টিটাও নতুন কিছু হলো না। মারিয়ানি সমঝদারদের সঙ্গে কথা বলছে, আমি দাঁড়িয়ে আছি দূরের দেয়ালের কাছে। গড়িয়ে চলেছে সময়। রাত দশটায় আরও লোক এল। জমে উঠল ওদের পার্টি। আর আমি নিঃসঙ্গ থাকতে থাকতে বিরক্ত। এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে হেঁটে বাড়ি চলে যাওয়ার কথা ভাবলাম। হাতের ড্রিংকের গ-াসটা নামিয়ে রেখে মারিয়ানির দিকে এগোলাম ওকে বলার জন্য। আমার হাত চেপে ধরল কেউ। কে ধরছে দেখার জন্য ফিরে তাকালাম।

একটা মেয়ে, মাঝে মাঝে মারিয়ানির ছবি আঁকায় মডেলের কাজ করে। হাসিমুখে আমাকে জিজ্ঞেস করল: 'চিনতে পেরেছ?'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়,' জবাব দিলাম। কথা বলার মত একজন মানুষ পেয়ে খুশি হলাম। 'কেমন আছো?'

'আর থাকা,' বিরক্তকণ্ঠে জবাব দিল ও। 'দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে এই পার্টি থেকে।'

হেসে উঠলাম। এক ধরনের স্বস্তিও বোধ করলাম। যাক, আমার মতই বিরক্ত হয় এমন আরেকজনের দেখা পাওয়া গেছে। জিজ্ঞেস করলাম: 'তাহলে এলে কেন?'

'আসতে হলো,' বেশি কথার মধ্যে গেল না ও। 'আমার ব্যবসা আছে

এখানে–বিক্রি করার লোক খুঁজতে আসি,' নিজের দেহটা দেখিয়ে কী বিক্রি করতে চায় বুঝিয়ে দিল ও।

'ওহ্, বুঝলাম,' আমি বললাম।

'নাচবে?' জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা ঝাঁকালাম। একসঙ্গে এককোণে এগিয়ে গেলাম দুজনে, যেখানে রেডিওতে মিউজিক বাজছে। ভাল নাচে ও। পার্টির কয়েকজন উৎসাহ নিয়ে তাকাতে লাগল আমাদের দিকে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম মারিয়ানিও ওর শিল্পী বন্ধুদের সহ কথা থামিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

'ভাল জোড়া তো,' একজনকে বলতে শুনলাম। 'নাচটা চালিয়ে যেতে বলো ওদের।'

সরে গেলাম, যাতে মারিয়ানি কী বলে সেটা শুনতে না হয়। 'কেন করছ এটা?' সোনালি চুল মডেল মেয়েটা জিজ্ঞেস করল।

'কী করছি?' জিজ্ঞেস করলাম, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে।

'এই পার্টিতে কেন আসো?' মেয়েটা বলল। 'তোমাকে দেখে ডাঙায় তোলা মাছের মত লাগছে।'

কাঁধ ঝাঁকালাম। 'এরচেয়ে ভাল আর কিছু করার নেই আমার, তাই আসি।'

'হুঁ,' আমার দুঃখটা যেন বুঝতে পেরে কাঁধের ওপর দিয়ে মারিয়ানির দিকে তাকাল। ওর ধারণা: 'বস'-এর আদেশে চলতে বাধ্য হচ্ছি, আর মারিয়ানি আমার বস।

হঠাৎ করেই নাচের ওপরও বিরক্ত হয়ে গেলাম। রেগে গেলাম নিজের ওপর। বললাম: 'একটা ড্রিংক হলে কেমন হয়?'

দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পার্টির অন্যদের দেখছি আমরা। মারিয়ানি আমাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল–আমি তাকাতেই চট করে চোখ সরিয়ে নিল।

ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেও বেশিক্ষণ ভাল লাগল না। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম: 'একটু খোলা জায়গায় ঘুরে এলে কেমন হয়?'

মাথা ঝাঁকাল ও। আমাদের কোট পরে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। পার্কের ভিতর দিয়ে নীরবে এগোলাম দুজনে। বেরিয়ে এসে থামলাম। বাসে ওঠার জন্য ছোটাছুটি করছে লোকে। আমরা দুজনে নীরব। মেয়েটার হাত আমার হাতে।

আবার ফিরে চললাম আমরা। পার্টি চলছে যে বাড়িটায়, সেটার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। 'আমি আর ভিতরে যাব না,' বললাম। এখান থেকে বেরোনোর পর এটাই আমার প্রথম কথা।

আমার দিকে তাকাল ও। 'আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু যেতে হবে, উপায় নেই। একজন আমাকে কথা দিয়েছে আগামীকাল একটা কাজ জোগাড় করে দেবে।'

আমি জানি, আমি যদি ওকে এখন ভিতরে না গিয়ে আমার সঙ্গে যেতে বলি, রাজি হয়ে যাবে।

আমার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ও। তারপর হেসে পিছিয়ে গেল এক পা। 'খুব খেয়ালি লোক তুমি।'

জবাব দিলাম না। ও বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। আমি বাসায় ফিরে এলাম। রাত একটায় বাড়ি ফিরল মারিয়ানি, আমি তখন চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়ছি। 'হ্যালো,' জিজ্ঞেস করলাম: 'পার্টি কেমন লাগল?'

'তুমি ওখানে থেকে গিয়ে দেখলে না কেন?' ঝাঁঝাল কণ্ঠে জবাব দিল ও।

মারিয়ানি রেগে রয়েছে দেখে আর কিছু বললাম না আমি। আজ রাতে আর ঝগড়া করার ইচ্ছে নেই।

বেডরুমে ঢুকে কয়েক মিনিট পর আবার বেরিয়ে এল ও। 'বেস কোথায়?' আমাকে জিজ্ঞেস করল।

বুঝলাম সেই মডেল মেয়েটার নাম বেস। মারিয়ানির দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসলাম। 'পার্টিতেই আছে হয়তো। ওকে দরজার কাছে রেখে বাড়ি ফিরে এসেছি আমি।'

'কিন্তু আমি তো ওকে পার্টিতে দেখিনি আর।'

'আমি ওকে রেখে আসার পর কী করেছে, সেটা তো আর জানি না।' আবার হাসলাম আমি। 'মাথা ঠাণ্ডা করো, মারিয়ানি। আমার মনে হয় তুমি জেলাস হয়ে পড়েছ।'

বলেই বুঝলাম ভুল করে ফেলেছি। রাগের চোটে ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবার জোগাড় হলো মারিয়ানির। 'জেলাস!' চেঁচিয়ে বলল: 'ওই দুই পয়সার কুত্তিটাকে নিয়ে জেলাস! আমার একটুও ভাল লাগেনি, ব্যস। আমি চেয়েছিলাম আমার সঙ্গে পার্টিতেই থাকো তুমি। পার্টির লোকেরা তোমার সম্পর্কে কি বলাবলি করছিল শুনতে চাও?'

আমার নিজেরও মেজাজ খারাপ হতে শুরু করল। 'বলুক, তাতে আমার কী। ওদের মুখ ঠেকাতে পারা যায় না। আর বলেই যদি আমাদের কী?'

'আমাদের কী মানে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমার খারাপ লাগে না? আমাদের সম্পর্কটা জানে ওরা। তুমি ওই কুত্তিটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলে ওরা তো হাসাহাসি করবেই।'

'তুমি তো শুধু তোমার নিজের কথা ভেবেই খালাস, আমার কথা ভেবেছ একটিবারও?' রাগটা আমারও বাড়ছে। 'পার্টিতে গিয়ে যে খুলে রাখা ওভারকোটের মত আমাকে আলাদা করে ফেলে রাখো সেটা কি আমার ভাল লাগার কথা? তাই বলছি, অকারণে চেঁচিয়ো না!' একটা সিগারেট ধরালাম। 'ভুলে যাও!'

'ওই সস্তা কুত্তিটা তোমাকে দেখামাত্র তোমার সঙ্গে লেপ্টে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল।'

'আমার কাছে তো ভাল মেয়ে বলেই মনে হলো ওকে,' জবাব দিলাম। 'আমি তো খারাপ কিছু দেখলাম না। যাকগে, তুমি কী করতে চেয়েছিলে?'

'কী করতে চেয়েছিলাম?' বেডরুমের দরজার কাছে চলে গেল মারিয়ানি। 'ওটাকে

এখানে দেখলে ওর হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলতাম আমি।'

হাসতে আরম্ভ করলাম। 'ও, এজন্যেই ঘরে ঢুকে আগে বেডরুমে উঁকি দিয়েছিলে? আমাকে কি এতটা হাঁদা মনে হয় তোমার, যদি আসতে ইচ্ছে করতও, ওকে নিয়ে এখানে চলে আসব?'

আমার কাছে এসে চেয়ারের সামনে দাঁড়াল মারিয়ানি। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল: 'শোনো, একটা কথা মনে রেখো, তুমি আমার। তুমি, তোমার যা কিছু আছে, সব আমার, শুধু আমার। অনেক কিছু তোমাকে দিয়েছি আমি। দিয়েছি যেমন, ইচ্ছে করলে এক নিমেষে আবার কেড়েও নিতে পারি সেগুলো। যেখান থেকে তোমাকে তুলে এনেছি সেখানে ছুঁড়ে ফেলতে পারি। আমার সঙ্গে কোথাও যাওয়ার সময় কথাগুলো মনে রেখো। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, বিরক্ত লাগুক বা ভাল লাগুক, পছন্দ হোক বা না হোক। আমি যখন তোমাকে যেতে বলব, শুধু তখন যাবে।'

মাথার ভিতরে আগুন জ্বলতে লাগল আমার। বহুকষ্টে সামলে রাখলাম নিজেকে। ও ঠিকই বলেছে। আমার নিজের কিছুই নেই। এমনকী আমার পরনে যে পোশাকটা আছে, পকেটে টাকাগুলো আছে, সব কিছুই ওর দেয়া। ভোঁতাস্বরে বললাম: 'বেশ, তুমি যদি চাও, তাই হবে।'

আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও। প্রচণ্ড হতাশ। ও ভেবেছিল ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠব আমি, কিন্তু কিছুই করলাম না। 'হ্যাঁ, আমি তা-ই চাই।' কথাটা বলার সময় কণ্ঠের অস্থিরতা চাপা দিতে পারল না ও।

চেয়ার থেকে উঠে বেডরুমে চলে এলাম। কাপড় খুলে বিছানায় উঠে পড়লাম। ঘুমাতে দেরি হলো না। ঘুমটা যখন ভেঙে গেল, ক'টা বাজে জানি না। মারিয়ানি বলল: 'ফ্র্যাঙ্ক, তুমি জেগে আছো?'

'আছি,' হঠাৎ করেই চোখ থেকে ঘুম একেবারে দূর হয়ে গেল আমার।

'আমার কাছে এসো, ডার্লিং,' ফিসফিস করে বলল ও।

'আসছি, মালকিন,' জবাব দিয়ে উঠে গিয়ে ওর বিছানার পাশে বসলাম।

'ওখানে না, ডার্লিং,' ফিসফিস করেই বলল ও। ওর চোখের জ্বলজ্বলে দৃষ্টি আবছা অন্ধকারেও চোখে পড়ল আমার। 'এসো, আমার পাশে শোও। আমাকে চুমু খাও।'

ওর পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। দুই হাতে টেনে নিলাম ওকে। নরম, উষ্ণ ওর দেহটা। ওকে স্পর্শ করা মাত্র মনে হলো বিদ্যুৎ বয়ে গেল আমার দেহে। আমাকে দেয়া ওর সমস্ত টাকা উসুল করে দিলাম সে-রাতে।

*

আমি ওকে ভালবাসি। আমি জানি, সব সময় বাসব। ও আমাকে যত কটু কথাই বলুক না কেন। কিন্তু আমার মগজের মধ্যে সারাটাক্ষণ কে যেন কুটুর কুটুর করে কাটতেই থাকল আর ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলল আমার অক্ষমতা নিয়ে।

'ও যখন লাফাতে বলবে তোমাকে, লাফাবে,' মগজের ভিতরের কণ্ঠটা বলছে আমাকে: 'ও সুতো ধরে টানলে পুতুলের মত নাচতে থাকবে। হেহ্! হেহ্! হেহ্! তোমার

নিজের অস্তিত্বকে কোনদিন আর খুঁজে পাবে না। কখনও না! কখনও না! কখনও না!'

কাকভোরের কালচে-ধূসর আলো জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। অকাতরে ঘুমাচ্ছে মারিয়ানি। বালিশে রাখা ওর মাথার ওপর লাল চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে এমনভাবে, মনে হয় আগুন জ্বলছে। ওর মুখে আধোফোটা সন্তুষ্টির হাসি। শান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে ও।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হলো, আমি ওকে ভালবাসি, ঠিকই, তবে কী যেন একটা হারিয়ে গেছে, আর খুঁজে পাব না সেটা, যত চেষ্টাই করি না কেন। আর আমিও হারিয়ে যাব ওর জীবন থেকে–আজ হোক বা কাল হোক–কোন সন্দেহ নেই তাতে।

তেরো

ক্রিসমাস ও নববর্ষের ছুটি শুরু হলো। বাচ্চাদের স্কুল ছুটি। বড়রা এক অদ্ভুত আনন্দে মাতোয়ারা। চারিদিকে উত্তেজনা। কিন্তু আমার কাছে জীবনটা আরও বেশি একঘেয়ে।

বেশিরভাগ সময় জানালার কাছে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকি। মানুষের ছোটাছুটি আর কর্মব্যস্ততা দেখি। রাস্তায় বরফ জমেছে। বেলচা আর অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে সে-বরফ সরাতে গলদঘর্ম হয় কর্মীরা। বিভিন্ন পেশার লোকেরা ওই বরফের তোয়াক্কা না করে সারদিনের কাজকর্ম চালিয়ে যায়। দেখি, আর মর্মাহত হই, আমার গলার মাঝখানটা টিপে ধরে কে যেন আমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে চায়। বার বার মনে হয়, কেন বসে আছি? কেন মিশে যেতে পারছি না কর্মচঞ্চল ওই মানুষগুলোর মাঝে?

নিউ ইয়ার'স ইভের দিনে সবাই যখন আনন্দিত, আমি হয়ে রইলাম মনমরা। আমার এই মনমরা হয়ে থাকার কারণ বুঝতে পারছি না। ক্রিসমাস ট্রি'র মত জ্বলে ওঠার চেষ্টা করছি। মদ খেয়ে নিজেকে খুশি করতে চেয়েও লাভ হচ্ছে না, আরও যেন তলিয়ে যাচ্ছি। মারিয়ানি ও তার বন্ধুদের সঙ্গে একটা নাইটক্লাবে রয়েছি। সব সময়কার মতই একলা আমি। মনে হচ্ছে, আমার জীবনের সবকিছু আমি হারিয়ে বসে আছি। আমি ভীত। ভবিষ্যতের দিনগুলো যেন আমার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে।

আমার দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মারিয়ানি: 'কী হয়েছে তোমার, ডার্লিং? মজা পাচ্ছ না?'

জবাবে হেসে উঠলাম। আমার ভাবভঙ্গি দেখে মারিয়ানি ভাবল, আমি মাতাল হয়ে গেছি। ওকে কাছে টেনে চুমু খেলাম। মিষ্টি, উষ্ণ এক ধরনের অনুভূতির সঙ্গে শক্তি যেন ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। মনমরা ভাবটা কেটে গেল। মনে হলো, ভয় কীসের আমার? আমি এখনও তরুণ, গায়ে অফুরন্ত শক্তি। আবার ওকে চুমু খেলাম, ওর ঘাড়ে, কাঁধে। আমাকেও চুমু খেল মারিয়ানি।

'ফ্র্যাঙ্ক,' ফিসফিস করে বলল ও: 'এখানে না। এখানে না, ফ্র্যাঙ্ক।' আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে হাসলাম। আমার সঙ্গে সে-ও হাসল। দুজনে একসঙ্গে হাসতে লাগলাম। হাসতে হাসতে দম ফুরিয়ে এল। পরস্পরের চোখের দিকে তাকালাম আমরা।

ওর চোখের দৃষ্টিতে গর্ব ও অহঙ্কার। আমাকে দেখে যেন বলছে: 'তুমি আমার। আমার। আমি তোমার মালিক।' আমার হাত চেপে ধরল ও। ওর দেহের বিদ্যুৎ যেন আমার দেহেও প্রবাহিত হলো। ওর আবেগ ঢুকে যাচ্ছে আমার ভিতরে। দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম গর্বিত ভঙ্গিতে।

আলো কমে এল। বেজে উঠল নাচের বাজনা। দুজনে দুজনকে ধরে নাচতে আরম্ভ

করলাম আমরা। পরস্পরের দেহের উষ্ণতা অনুভব করছি। চুমু খেলাম একে অন্যকে।

'আমি তোমাকে ভালবাসি, ডার্লিং,' আমার ঠোঁটের কাছে বিড়বিড় করল ওর ঠোঁট। 'হ্যাপি নিউ ইয়ার।'

'আমিও তোমাকে ভালবাসি,' নিজেকে বলতে শুনলাম। 'হ্যাপি নিউ ইয়ার!' ওর গালে চুমু খেলাম। নোনতা লাগল। ওর চোখের পানিতে ভেজা গাল। বুঝলাম, ও কেঁদেছে। আমার মনের ভাবনাগুলো পড়ে ফেলেছে। অত নির্বোধ নয় ও, আমি কী ভাবছি, ভালমতই জানে।

আবার আমাকে চুমু খেল ও। আমার দেহে ওর জড়িয়ে ধরা বাহুর চাপ বাড়ল। 'তুমি যেয়ো না, ডার্লিং। পি-জ, তুমি চলে যেয়ো না।'

'কিন্তু আমাকে যে যেতে হবে,' ফিসফিস করে জবাব দিলাম। 'যেতেই হবে। কোনমতেই রুখতে পারছি না নিজেকে।'

আলো জ্বলল আবার। টেবিলে বসে পরস্পরের দিকে তাকালাম দুজনে। ওর মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। চোখ বড় বড়। পানিতে ভরা। আমারও গলার কাছে কী যেন আটকে আটকে আসছে। কিছু বলতে পারলাম না। শুধু দুজনে দুজনের হাত শক্ত করে ধরে বসে রইলাম।

কয়েক মিনিট পর পার্টি থেকে বেরিয়ে নীরবে হেঁটে বাড়ি ফিরে চললাম দুজনে। পরিষ্কার, ঝকঝকে, উজ্জ্বল রাত। কোটি তারা মিটমিট করছে আকাশে। বাতাস নতুন আর তাজা, সব কিছুই যেন নতুন–সেটা ১৯৩৪ সাল। চুপচাপ বাসায় পৌঁছলাম আমরা। আমার কোট খুলে চেয়ারের ওপর ছুঁড়ে ফেললাম। আলমারি থেকে আমার সুটকেসটা বের করে বিছানায় রেখে খুললাম।

নীরবে আমার জিনিসপত্রগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছে মারিয়ানি: শার্ট, প্যান্ট, জুতো, মোজা, টাই, পাজামা, সুট। ঠেসে ঠেসে ভরছি আমি সেগুলো।

জিনিসগুলো ভরা হয়ে গেলে সোজা হয়ে তাকালাম ওর দিকে। কম্পিত গলায় বললাম: 'এবার তো যেতে হয়।'

আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। 'না, ফ্র্যাঙ্ক, না! তুমি যেয়ো না! তোমাকে আমার দরকার!' ও কাঁদছে–ঝরঝর করে কাঁদছে।

শক্ত করে ধরে রাখলাম ওকে। একটা মুহূর্ত কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। তারপর বললাম: 'এ-ই ভাল হলো, ডার্লিং, অনেক ভাল হলো। বিশ্বাস করো।' ফিসফিস করে বলতে গিয়ে দেখি আমার গলাও কাঁপছে। 'যতই দিন যাবে একে অন্যকে ঘৃণা করতে থাকব আমরা। তিক্ততা বাড়ার আগেই আলাদা হয়ে যাওয়া ভাল।'

'কিন্তু, ডার্লিং, তুমি আমার পৃথিবী, আমার জীবন, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে কী করে?' আমাকে চুমু খেল ও। 'তা ছাড়া তুমিই বা কী করবে? তোমার কোন কাজ নেই–কিচ্ছু না। তুমি বাঁচবে কী করে? আবার ওই সস্তা কাজগুলোতে ফিরে যাবে তুমি ভাবতেই পারছি না আমি। আমার এখানে তুমি নিরাপদ। তোমাকে আমি দেখতে পারব, বিপদে-আপদে রক্ষা করতে পারব। তোমাকে অনেক কিছু দিতে পারব–যা তুমি

চাও।'

বইতে পড়া একটা কথা বিড়বিড় করলাম: 'নিজের আত্মাকে বিকিয়ে দিয়ে গোটা দুনিয়া পেয়েও কিছু পাওয়া হয় না পুরুষ মানুষের।'

অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আমার ঠোঁটে জোরে কামড়ে দিল ও। আলো নেভানোর জন্য সুইচের দিকে হাতটা বাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল: 'আমাকে অনেক অনেক আদর করে গুড-বাই জানাও, ডার্লিং।'

যতটা সম্ভব মিষ্টি করে ওকে গুড-বাই জানালাম আমি। সময় যেন আমাকে ঘিরে পাক খেয়ে ঘুরছে। প্রবল স্রোতের মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। মনটাকে দুর্বল করে ফেলতে চাইছে। কিন্তু শক্ত করলাম নিজেকে। সুটকেসটা তুলে নিলাম।

'এক মিনিট,' মারিয়ানি বলল। জেরোর ছবিটা তুলে এনে দিল আমাকে। 'ওকে তোমার সঙ্গে করে নিয়ে যাও। তোমার মধ্যে ওর স্বভাবের অনেক কিছু রয়েছে। তোমার মধ্যে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে আগে যা দেখিনি। জীবনে অনেক বড় হবে তুমি। অনেক কিছু করতে পারবে।'

সুটকেস হাতে দরজার দিকে এগোলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এল মারিয়ানি। আবার চুমু খেল। দরজার বাইরে পা রাখলাম। আস্তে করে পাল-টা লাগিয়ে দিল ও। ভিতর থেকে ওর ফোঁপানির শব্দ কানে এল। বারান্দা ধরে এগিয়ে চললাম। বেরিয়ে এলাম বাড়িটার বাইরে।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। এখনও মিটমিট করছে তারাগুলো। পুবের আকাশে আলোর আভাস। ভোর হতে দেরি নেই। উজ্জ্বল আরেকটা দিন আসছে। সম্ভাবনাময় নতুন দিন। আগামী কাল কী হবে জানি না।

আগামীর ভাবনা আগামীর হাতেই ছেড়ে দিয়ে মারিয়ানির স্মৃতি বুকে নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে চললাম আমি।